স্যর
ডন ব্র্যাডম্যান
বিদায় ক্রিকেট

Farewell To Cricket

ভাষান্তর : মনোজিৎ লাহিড়ী

পরিবেশক : কথা ও কাহিনী
১৩, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Farewell To Cricket

By Don Bradman

প্রচ্ছদ ও শিরোনামা

অরুণকুমার ঠাকুর

প্রথম প্রকাশ : ৬ জুন, ১৯৫৩

প্রকাশিকা : আরতি চক্রবর্তী, পত্রপুট, ২/৩এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

জাতীয় মূকবধির ক্রীড়ায় পুরস্কৃত

শ্রীমান সত্যজিৎকে—

॥ ব্র্যাডম্যান ঃ উনিশশো তিরিশে ॥

বৈমানিক শর্টরিজ আর ডন ব্র্যাডম্যান : এডিলেড থেকে মেলবোর্ন (১৯৩০) যাত্রার পূর্বমুহূর্তে॥

লেখকের মতে একটি সঠিক প্রচণ্ডগতি ড্রাইভেব পবেব মুহূর্ত ঃ ব্র্যাডম্যানের বিশ্ব বেকর্ড
সৃষ্টিকারী অপরাজিত চারশো বাহান্ন রাণেব একটি দৃশ্য ॥

॥ লেখকের পেছনের পায়ে ভর দিয়ে 'কাট' মারার এক অনন্য ভঙ্গী ॥
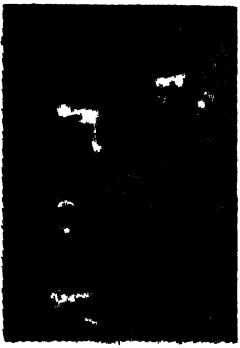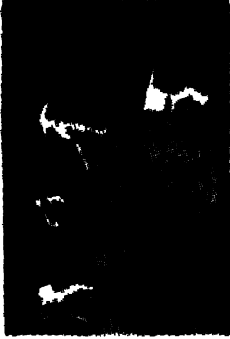
১৯৩২-এ মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে ব্র্যাডম্যানের শূন্য রানে বাওয়েসের বলে আউট হওয়ার পূর্ণাঙ্গ শ্লথগতি চলচ্চিত্র ॥

• ১৯৩৪-এর ওভাল : বাওয়েসের বলে আউট হচ্ছেন উডফুল ॥
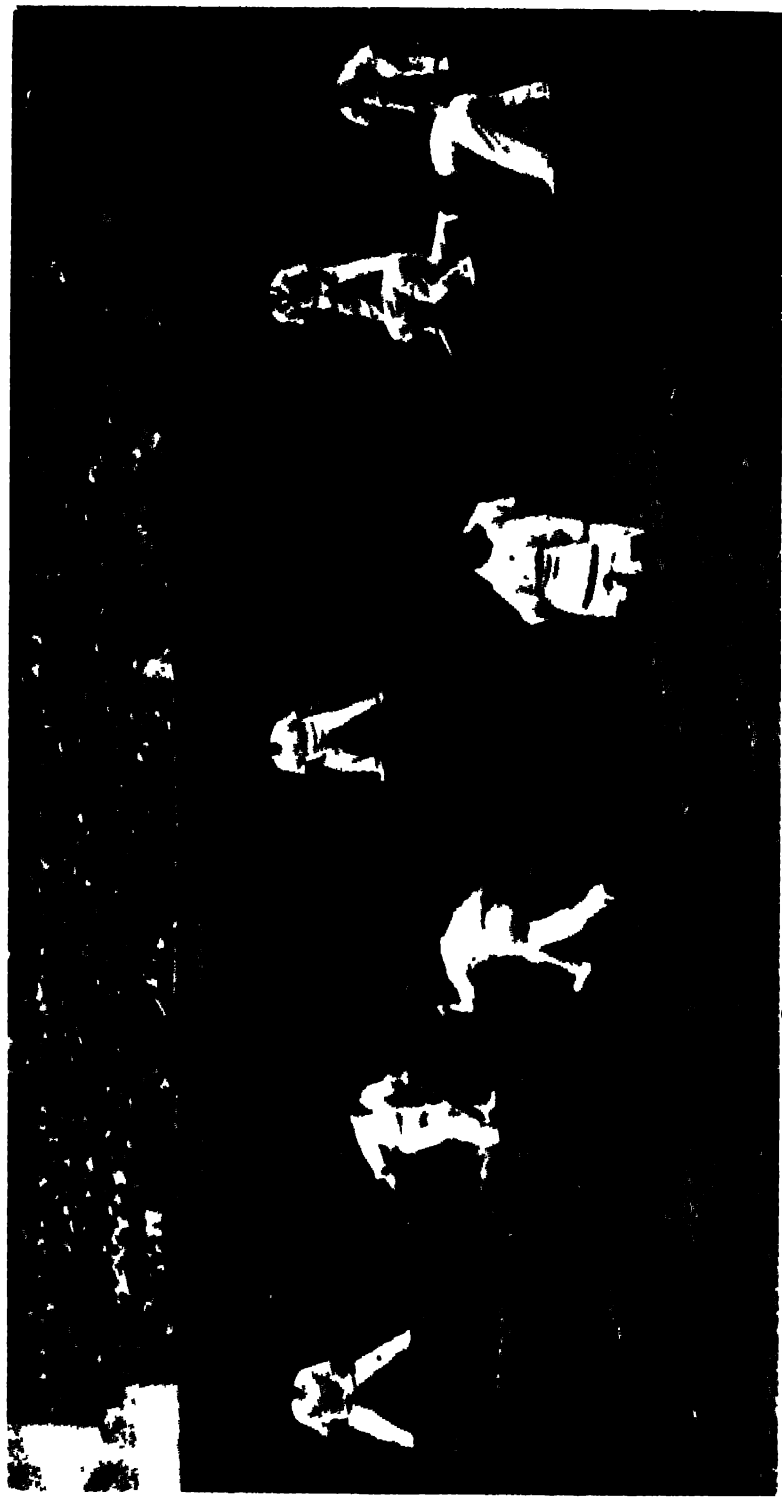
১৯৩৪-এর ওভাল : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ক্লার্কের বডি লাইন ফিল্ডিং ॥
ব্রাউন, অ্যালেনের হাতে ক্যাচ আউট হচ্ছেন ॥

শুরুতে

নিউ সাউথ ওয়েলসের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার নাম প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরোয় উনিশশো একুশে। খবরটা এই রকম : "লাফানো বল"। বাউরালে (নিউ সাউথ ওয়েলস্) ছোটদের একটা ক্রিকেট খেলা দেখলাম সম্প্রতি। ডন ব্র্যাডম্যান (তাড়ু ব্যাট) বেড়া পার করে একটা বল পেটালো। বলটা একটা আধলা ইঁটে ধাক্কা খেয়ে বেড়ার ওপর কিছুক্ষণ নাচলো, তারপর বেড়ার খোঁটা ধরে সোজা বাউণ্ডারী। জন।"

ঘটনাটা নির্ভেজাল সত্যি ; কিন্তু মজার ব্যাপার, কুড়ি বছর পরে আমার ছেলের নামও জন। জন এখন স্কুলে।

গোড়া থেকেই বাউরালের সঙ্গে আমার নামটা যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো, আমাকে সবাই 'বাউরালের ছোকরা' বলে জানতো।

নিউ সাউথ ওয়েলসের কুটামাণ্ড্রা বলে একটা জায়গায় আমার জন্ম। শহর থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে জায়গাটা। জন্ম-তারিখ উনিশশো আটের সাতাশে অগাস্ট। পুরনো চিঠিপত্র ঘাঁটতে গিয়ে রাস্তার নামটা চোখে পড়লো—'অ্যাডাম স্ট্রীট'।

পরিবারে সবার ছোট আমি। দাদা ভিক্টর আমার চেয়ে চার বছরের বড়। তার ওপর দিদিরা—আইলেট, লিলি আর মে।

বাউরালে আমরা যখন আসি তখন আমার বয়স তিন বছরও না। এইখানেই আমার কৈশোর কেটেছে।

সিডনি থেকে আশি মাইল দক্ষিণে মনোরম কৃষিপ্রধান এই মফস্বল শহরটি স্বাস্থ্যোদ্ধারকারীদের প্রিয় জায়গা। সমুদ্রতট থেকে দুশো ফুট ওপরে শহর।

পড়াশোনার হাতেখড়ি বাউরালের ইণ্টারমিডিয়েট হাইস্কুলে। লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধে সেখানে অন্য-পাঁচটা বিদ্যালয়ের মতো হলেও, খেলাধূলার বিশেষ সুযোগ ছিলো না।

আমাদের প্রধান শিক্ষক মিঃ এ. জে. লি. ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, এবং আমাদের সঙ্গে খেলায় আনন্দ পেতেন। খেলার জন্যে আলাদা কোনো শিক্ষক ছিলেন না। পাড়ার সমবয়সী ছেলে না থাকাতে সপ্তাহ-শেষের বা ছুটির দিনগুলোতে অসুবিধে হতো। তাই অনুশীলনের ব্যাপারটা সারতে হতো একটা বল দিয়েই। বলে লাথি মারার অভ্যেস করে ফুটবলের সাধ মেটাতে হতো। গ্যারেজের দরজাটা প্রতিপক্ষ করে চলতো টেনিস খেলা। নিজের তৈরী নিয়মে ক্রিকেটের পালা চলতো।

আমাদের বাড়ির পেছন দিকে ইঁটের তৈরী গোলাকৃতি একটা আটশো গ্যালন জলের ট্যাঙ্ক ছিলো। ওই ট্যাঙ্ক থেকে আমাদের বাড়ির কাপড় কাচার ঘরটার দূরত্ব আট ফুটের মতো। ট্যাঙ্কের নীচের দিকটা সিমেন্ট-বাঁধানো। দরজাগুলো বন্ধ থাকতো। তিন দিক দিয়ে ঘেরা জায়গাটা, মাথার ওপরে ছাদ। বৃষ্টির দিনে ওইখানেই চলতো খেলা। একটা ছোট ক্রিকেট স্টাম্প দিয়ে ব্যাটের কাজ চালাতাম। ইঁটের স্ট্যাণ্ডটায় একটা গল্‌ফ্‌ বল ছুঁড়ে দিতাম আর সেটা ফিরে আসতে সেটাই মারতাম। বলটা অবশ্য প্রচণ্ড বেগে ফিরে আসতো এবং সেটাকে ওই একটা গোল স্টাম্প দিয়ে পেটানো নেহাত সহজ কাজ ছিলো না।

খেলাটিকে জমাটি করার জন্যে আমি একাই কল্পনায় দুটো দল তৈরি করতাম খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের নামে, এবং পর্যায়ক্রমে টেলার, গ্রেগরী, কলিন্‌স্‌ প্রমুখদের হয়ে ব্যাট করতাম। অনেক 'গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট' খেলার ইতি করে বাড়ি ফিরতে হয়েছে মার ধমকানিতে।

জায়গাটার খোলা দিকটা 'অন' দিক করতাম, ফলে 'অফে'র বল ধরার জন্যে ছোটাছুটি করতে হতো না।

আর একটা মজার খেলা খেলতাম। পাড়ার মাঠের সীমানার দশ-পনেরো গজ দূর থেকে একটা গল্‌ফ্‌ বলকে রেলিংয়ের দিকে ছুঁড়ে মারতাম, উদ্দেশ্য বলটাকে বিভিন্ন উচ্চতায় এবং কোণ থেকে ফিরে পাওয়া—এইটা ছিলো আমার বলের 'ক্যাচ' লোফার অনুশীলন। নির্ভুলভাবে ছোঁড়ার ব্যাপারে এটা যথেষ্ট সাহায্য করতো, কারণ 'নির্ধারিত জায়গাটি' ফসকে যাওয়া মানেই বল কুড়িয়ে আনতে দৌড়তে হতো, সময়ও যেতো অনেক।

আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা বেড়ার গেটে দাঁড়িয়ে বড় বিদ্যালয়ের ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখতাম। ওদের আহ্বানে কখনো-সখনো ব্যাট ধরার মওকাও মিলতো। বড়দের মাঠে ক্রিকেটের 'পিচ' ছিলো না, ধুলোয় ভরা মাঠেই চলতো অনুশীলন—যে মাঠের সঙ্গে তুলনা চলে নটিংহ্যামের মাঠের। বিদ্যালয়ের থামে উইকেট আঁকা হতো। খড়ির দাগে স্টাম্পের উচ্চতাও চিহ্নিত হতো এবং দাগের ওপরে না নীচে বল লাগলো এ নিয়ে তুমুল বাক্-বিতণ্ডাও চলতো। 'গাম' গাছের কাঠ থেকে ব্যাটগুলো তৈরী হতো—দেখতে অনেকটা 'বেস' বলের ব্যাটের মতো। 'প্যাড' কখনোই পরা হতো না।

এগারো বছর বয়সে আমি প্রথম 'ম্যাচ' খেলি। খেলা হয়েছিলো বাউরালের গ্লোব পার্কে। মাঠটায় ফুটবলই খেলা হতো। ধুলোভরা হলেও এর চেয়ে 'মসৃণ' মাঠ সে অঞ্চলে ছিলো না।

মাঠটা খারাপ হলেও ডব্লিউ. জি.র মতে অস্ট্রেলীয় পিচের চেয়ে ভালো। অস্ট্রেলীয় পিচ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : 'পিচে এতো ধুলো যে বল করার সঙ্গে সঙ্গে তা ধুলোতেই জমে যেতো। [উদ্ধৃতি : পাওয়েল-ক্যানিন্‌জ ক্যাপেল্‌য়ের 'দ্য গ্রেসেস্'।]

তাহলে ওদের বোলাররা বোধ হয় বল ছুড়ে মারতো।

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে পরবর্তীকালে ওইখানেই জন্ম হবে একটা সুন্দর ক্রিকেট মাঠের—যার নাম 'ব্র্যাডম্যান ওভাল'। যাই হোক ওই খেলায় আমরা টসে জিতে ব্যাট করতে নামলাম। প্রতিপক্ষের একজন ন্যাটা বোলার তার প্রথম বলেই একটা উইকেট নিলো, দ্বিতীয় বলে আর একটা, তিন নম্বরে আমি—যীশুকে স্মরণ করে নামলাম ওর হ্যাটট্রিকের মাথায়। প্রথম বলটা কি করে হটিয়ে ছিলাম তা আজও আমার কাছে রহস্য—কিন্তু সামলে ছিলাম। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ রান করেছিলাম সে খেলায়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাঝে মাঝে দল গঠন করা হতো এলোমেলো বাছাই করে। এর মধ্যে দুটোতে অংশ গ্রহণ করেছিলাম, প্রথম খেলাটা হলো প্রতিবেশী মিটাগং স্কুলের সঙ্গে। বাঁধানো পিচের মাঠ—দড়ির

ম্যাটিং করা। আমাদের দলের সর্বমোট একশো ছাপান্ন রানের মধ্যে আমার ছিলো একশো পনেরো।

বারো বছর বয়সে প্রথম সেঞ্চুরী।

গর্ব হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু তা অচিরেই মিলিয়ে গেলো যখন পরদিন আমাদের প্রধান শিক্ষক খেলার মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড় করালেন আমাদের—'শুনলাম তোমাদের মধ্যে একটি ছেলে গতকাল মিটাগংয়ের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করেছে, কিন্তু ব্যাটটা মাঠে ফেলে আসার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।'

এ ধরনের ঘটনা অবশ্য আমার জীবনে আর ঘটেনি।

পরের খেলাতেও আমরা জিতেছিলাম। এবং তাতে আমার অবদান বাহাত্তর রানে নট আউট।

স্কুল-জীবনে বাইরের দলের সঙ্গে খেলে রানসংখ্যা দাঁড়ালো দুশো চুয়াল্লিশ। আউট একবারও হইনি।

খেলাধূলার আধুনিক সুযোগ-সুবিধে না থাকলেও সময়টা আমার ভালোই কেটেছিলো। ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য খেলাতেও আনন্দ পেয়েছি, টেনিস খেলেছি স্কুলের হয়ে, রাগবি ফুটবল খেলেছি। আমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে একশো দুশো গজ, সিকি আর আধ মাইল দৌড় প্রতি-যোগিতায়ও জিতেছি।

বিক্ষিপ্ত মনে হলেও অনুশীলনের এটাই ছিলো আমার পটভূমিকা। সপ্তাহান্তে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতাম শিকার অভিযানে। কাছা-কাছি একটা নালাতে মাছ ধরতাম। সাঁতারের ব্যাপারটি কিন্তু সুখপ্রদ হয়নি, কারণ দু-দুবার ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছি, তাতেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল আমার।

অঙ্ক ভালবাসতাম, তারপরেই বিজ্ঞান। কিন্তু স্কুলের একটি ছাত্র নিয়ম-বিরুদ্ধ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

গতানুগতিকতায় কেটে গেলো ছেলেবেলার দিনগুলো।

সবরকম খেলাই ভালবাসতাম, সবার ওপরে ক্রিকেট। বাউরালের হয়ে খেলার আনন্দ আমার জীবনের এক পরম সম্পদ। দলের অধিনায়ক ছিলেন আমার মামা। আশপাশের বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে দলগুলোর সঙ্গে প্রতি শনিবার খেলা হতো পর্যায়ক্রমে। রবারের তৈরী শক্ত চাকার গাড়িতে চড়ে কেরোসিন কাঠের বাক্সে বসে খেলতে যেতাম। গাড়ি থেকে নামার পর শারীরিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আজ সেই সব তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লে বড় খারাপ লাগে। সেই সব খেলায় রান গোনাই ছিলো আমার কাজ। শেষ মুহূর্তে একাদশ খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি হয়তো বরাত খুলে দিতো, নইলে দশজনে খেলতে হতো আমাদের, কারণ তখন আমরা হয়তো মস্ ভেলে, বাড়ি থেকে ছ' মাইল দূরে।

তা এইরকম একটা খেলায় আটটা উইকেট পড়ার পর আমি ব্যাট করার সুযোগ পেলাম। তখনো ফুলপ্যান্ট পরিনি—ব্যাটটা প্রায় মাথা-সমান। খেলাশেষে সেদিন আমি নট আউট, রানের সংখ্যা সাঁইত্রিশ। তেরো বছর বয়সে সেই আমার প্রথম খেলা বড়দের সঙ্গে। পরের শনিবারে, খেলার দ্বিতীয় পর্বে আমাকে প্রথম ব্যাট করতে নামানো হলো—না, সেদিনও আউট হইনি, উনচল্লিশ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলাম।

বড় ব্যাট নিয়ে খেলতে অসুবিধে হচ্ছে দেখে আমাদের দলের মিঃ সিড কিউপিট আমাকে তাঁর একটা পুরনো ব্যাট দাতব্য করলেন। ব্যাটটার একটা জায়গায় ফাটা ছিলো। বাবা ওটার নীচের দিক থেকে ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেললেন। ব্যাটটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা নিয়ে আমার অসীম গর্ব ছিলো।

এর পরের খেলা থেকে আমাকে আবার রান গোনার চাকরিতে ফিরে যেতে হলো। কারণ দলের খেলোয়াড়রা সবাই হঠাৎ নিয়মিত হয়ে পড়লেন।

কিছুদিন পরের একটা ঘটনায় আমার উৎসাহে জোয়ার এলো।

ক্রিকেট খেলা আমার খেলার তালিকায় পয়লা নম্বরে চলে এলো। আমার বাবা ক্রিকেটের একজন বড় সমঝদার ছিলেন। উনি হঠাৎ ঠিক করলেন সিডনিতে ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্ট দেখতে যাবেন। উনিশশো একুশের পঁচিশে ফেব্রুয়ারী থেকে পয়লা মার্চ পর্যন্ত খেলা চলবে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বাবা আমাকে তাঁর সঙ্গে নিতে রাজি হলেন।

সিডনির ক্রিকেট মাঠকে কেন্দ্র করে আমার অনেক স্বপ্ন ছিলো, এবার তা বাস্তবে রূপ নিলো। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্যও সেই প্রথম।

ভাবতেও ভালো লাগে যে, ওই মাঠে অনুষ্ঠিত পরের খেলাতে আর আমি গ্যালারীতে বসে ছিলাম না—সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। আজও আমার ধারণা সিডনির মাঠ পৃথিবীর সব সেরা, আর সে ধারণা পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটেনি।

আগের খেলার কথা বলি—সে খেলায় ম্যাকার্টনিকে তাঁর পুরো ফর্মে দেখেছিলাম। একশো সত্তর রান করেছিলেন উনি। তাঁর লেগের 'কাজ' আজও আমার মনের চোখে উজ্জ্বল। ম্যাকার্টনির বিদ্যুৎগতিতে সপাটে ব্যাট চালানো, ভুলতে পারি না।

আমার গুরু তখন জনি টেলার—আমার কৈশোরের হিরো। পরিচয় হয়নি, তবে প্যাটসি হেনড্রেনের হাতে তাঁর ক্যাচ তুলে দেওয়ার ব্যাপারটা আমাকে বেদনা দিয়েছে।

আরও কতকগুলো ঘটনা মনে গেঁথে আছে—যেন গতকাল ঘটেছে। আর্মস্ট্রংয়ের প্রথম বলে ক্যাচ তুলে দেওয়া; উলির সুন্দর মারের ভঙ্গি; টেড ম্যাকডোনাল্ডের সাবলীল ছন্দোময় মার আর জনি টেলারের পার্কিনকে ক্যাচে আউট করা। প্রথম দুদিনের খেলাই শুধু দেখা হলো, কারণ বাবার ফেরার তাড়া ছিলো, কিন্তু, তবু—ওই দুটো দিনের স্মৃতি আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে।

'এ মাঠে না খেলতে পারা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারবো না,' আমার এই উক্তিতে বাবা নিশ্চয়ই কৌতুকের খোরাক পেয়েছিলেন।

পরের কয়েক বছর অবশ্য বাবা এ মাঠে খেলা দেখেছেন, কিপাক্স-ওল্ডফিল্ডের প্রদর্শনী খেলাতেও উপস্থিত ছিলেন।

স্কুল ছাড়ার পর চাকরি নিলাম। কোম্পানির নাম ডেভিস অ্যাণ্ড ওয়েস্টব্রুক। সেই সময়ে টেনিসও খেলেছি প্রচুর। আমার এক মামার টেনিস কোর্ট ছিলো, ফলে একটা গ্রীষ্মের পুরো মরসুমই টেনিস খেলা চললো। পরের বছর টেনিসের মরসুম শেষ হবার আগেই আমি ক্রিকেটের মাঠে।

এবার আর আমার প্রথম ইনিংসে স্কোরারকে বেগ পেতে হয়নি, কারণ শূন্যহাতে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাই প্রথম বলেই। পরের ইনিংসেও বিশেষ সুবিধে হলো না।

পরের খেলা সেমিফাইনালের। প্রতিপক্ষ উইঞ্জেলো দল। খেলায় আমরা হেরে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের দলে আমার রানসংখ্যাই সর্বাধিক—ছেষট্টি।

ক্রিকেটের মরসুম সেবারের মতো শেষ হলেও, পরের বছরের জন্য মানসিক প্রস্তুতি চললো আমার।

এর পর থেকে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনো খেলার অনুপ্রবেশ ঘটেনি আমার জীবনে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা

উনিশশো পঁচিশের গ্রীষ্ম থেকে আমি বাউরাল-ক্রিকেট দলের নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলাম। সবে সতেরোয় পা দিয়েছি তখন। দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের বয়স চল্লিশের কোঠায়। উইঞ্জেলো দলের সঙ্গে খেলা পড়লো। ওরা মস্ ভেলকে হারিয়েছিলো আগের বার—কৃতিত্ব ও'রিলীর, ওদের চৌকস বোলার। ও'রিলীর খেলা তখনো দেখিনি আমি, কিন্তু ওর এলেমের বার্তা বাউরালে পৌঁছে গেছে। প্রতি শনিবার খেলা চলতে থাকলো—দু-পক্ষের মাঠে পালটা-পালটি করে।

উইঞ্জেলোর সঙ্গে প্রথম দিনের খেলা পড়লো বাউরালের মাঠে—আমার নামে যে মাঠের নাম আজ।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন—আমার রানসংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চললো। সেদিন খেলার শেষে দুশো চৌত্রিশ রান সংগ্রহ করেছিলাম, বলা বাহুল্য আউট না হয়েই—শেষের পঞ্চাশ রানে চারটে ছক্কা আর ছটা চার মেরে।

পরের শনিবার ও'রিলী তার প্রথম বলেই আমাকে খতম করলো। ওর 'লেগ-ব্রেকে'র আশ্চর্য ক্ষমতা আমাকে অভিভূত করেছিলো।

আমার খেলার খুব প্রচার হলো, কিন্তু সিডনির মাঠে খেলার সুযোগ এলো মস্ ভেলের সঙ্গে ফাইনাল খেলার পর। ওদের মাঠেই খেলা হয়েছিলো যথারীতি শনিবারগুলোতেই। সময় বাঁধা ছিলো—বেলা দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা। খুব হৈচৈ পড়েছিলো ওই খেলায়, কারণ দু-পক্ষই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী। দলের অধিনায়ক আমার মামা জর্জ হোয়াটম্যান টসে জিতে আমাকেই প্রথম মাঠে পাঠালেন ব্যাট করতে। সঙ্গে জুটি মিঃ প্রায়োর। দিব্যি চালালাম দুজনে। প্রায়োর গেলেন বাহান্নতে, আমার তখন আশি।

পরের শনিবারের শেষে বাউরালের রান দাঁড়ালো চারশো পঁচাত্তর—মাত্র একটি উইকেট হারিয়ে। এর মধ্যে আমার রান দুশো উনআশি আর মামা একশো উনিশ। দুজনেই খেলছি তখনো। আমার আগের আশি রান বাদ দিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টায় তিনশো রান করেছিলাম দুজনে।

এর পরের শনিবারে দিনের শেষে আমাদের ন উইকেটে মোট রান হলো ছশো বাহাত্তর। আমার আর এক মামা ডিক হোয়াটম্যান ব্যাট করতে পারলেন না, খেলার কিছু আগে গোড়ালিতে চোট লেগেছিলো। ওঁর নাম আগেই ঘোষণা করা হয় বলে বদলী নামানো যায়নি। আমার ভাই ভিক মাত্র একটা রান নিতে পেরেছিলো।

বাউরালের এই ঐতিহাসিক খেলার বিস্তৃত বিবরণ জানার আগ্রহ অনেকের থাকতে পারে ভেবে পুরো স্কোর তুলে দিলাম :

ডন ব্র্যাডম্যান ক প্রিগ ব রাইডার	৩০০
ও. প্রায়োর ব এস. টিকনার	৫২

জি হোয়াটম্যান ব এস. টিকনার	২২৭
এস. কিউপিট রান আউট	৪
ভি. ব্র্যাডম্যান ব এন্‌স্‌লে	১
ই. ওয়েইন ব টিকনার	৩৬
জি. এস. বেন্সলে ব টিকনার	১
ও. নপ ব টিকনার	১১
এন. মিল্ডেন্ন ক কাউলে ব সোডেন	৫
এ. স্টিফেন্স নট আউট	৭
অতিরিক্ত	২৮
মোট :	৬৭২

প্রিগের ক্যাচে আউট হই আমি, ছেলেটি ভালো ন্যাটা ব্যাটসম্যান ছিলো। উনিশশো উনপঞ্চাশে সিডনিতে কিপাক্স-ওল্ডফিল্ডের প্রদর্শনী খেলা চলার সময় আমার হোটেলে দেখা করতে এসেছিলো প্রিগ। অতদিনের ব্যবধানেও তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি। পুরনো স্মৃতির রোমন্থনে অনেক সময় কাটিয়েছিলাম সেদিন।

আগের কথায় ফিরে আসি—মস ভেলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো একশো চৌত্রিশে, দ্বিতীয়টা নামলো দুশোতে। বাউরাল খেলা জিতলো এক ইনিংস আর তিনশো আটত্রিশ রানে। তিনশো রান করার কৃতিত্ব ছাড়াও উনচল্লিশ রানে চারটে উইকেট নিয়েছিলাম সেদিন।

পাঁচটা শনিবার খেলার পর শেষ হলো ম্যাচ। 'সিডনি-সান' লিখলো : "অবশেষে! হ্যাঁ—শেষ হয়েছে! বেরিমা জেলা ক্রিকেটের খেলা শেষ হয়েছে। জেলা ক্রিকেটের ইতিহাসে সহজতম জয়—কিন্তু এ জন্যে পাঁচটি সপ্তাহ লেগেছে তাদের পুরনো শত্রু ঘায়েল করতে।" এ খেলায় শত রান পূর্ণ করতে পারলে আমার মা আমাকে একটা নতুন ব্যাট কিনে দেবেন বলেছিলেন। আমি সবিনয়ে তিনটে ব্যাট দাবী করলাম, তিনশো রানের জন্যে। দাবী ধোপে টিকলো না। যাই হোক, উইলিয়াম সাইকস্ কোম্পানী থেকে এলো আমার নতুন ব্যাট। উল্লেখযোগ্য—

পরবর্তী সময়ে ওই কোম্পানীর ব্যাটে আমার নাম খোদাই করা থাকতো।

খেলা শেষ হতে দেরি হওয়ায় ব্যাপারটা জেলার বাইরেও সাড়া তুলেছিলো। সিডনির এক কৌতুক-চিত্রশিল্পী এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকে বসলেন, টিকা : 'তরুণ ডন উইকেটের এপার-ওপার করছে খরগোশের মতো। পরে সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হচ্ছে, বার্ধক্যে পৌঁছচ্ছে, দাড়ি মাটি ছুঁয়েছে।'

আমার ওই খেলার তিনশো রান শুধু জেলা রেকর্ডই ছাড়ালো না, মরসুমের মোট রান দাঁড়ালো এক হাজার তিনশো আঠারোয়, গড় রান একশো একের বেশি, ইনিংসে। একান্নটা উইকেট—গড় সাত দশমিক আট। ছাব্বিশটা ক্যাচ ধরেছিলাম।

তখনকার বড় খেলা ছিলো 'কান্ট্রি উইক'। আশায় আশায় আছি। সালটা উনিশশো পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। তার কিছু আগে থেকেই অবশ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্রিকেট সংস্থা উদীয়মান বোলারের খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন। সিডনির দু' নম্বর মাঠে তাদের ডাকা হলো অনুশীলনে। উনিশশো ছাব্বিশের পাঁচই অক্টোবর সংস্থার সম্পাদক আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। চিঠিটা বাউরালের সম্পাদকের দপ্তরে এলো, কারণ প্রেরক আমার ঠিকানা জানতেন না। চিঠির বক্তব্য ছিলো : "রাজ্যের নির্বাচক-মণ্ডলী আপনার গত মরসুমের ক্রিকেট রেকর্ড সম্পর্কে অবগত আছেন এবং আপনাকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে ইচ্ছুক। এ জন্যে আপনাকে আগামী এগারোই তারিখে সিডনির ক্রিকেট মাঠে আহ্বান করা হচ্ছে। অনুশীলন শুরু হবে বেলা চারটেয়। আশা করি এ চিঠি যথোপযুক্ত মর্যাদা পাবে এবং আপনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন।"

বলা বাহুল্য আমার সমস্ত খরচই সংস্থা বহন করেন। বাবা আমার অনুশীলনে সঙ্গী হলেন।

আঠারো বছরের এক ছোকরাকে রূপকথার নায়কদের সামনে হাজির করা হলো।

কাগজওলারা আমার অনুকূলেই রায় দিলেন : "গতকালের অনুশীলন-পর্ব বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে। যদিও বোলার বাছাই করা

জন্যেই এই পর্বের আয়োজন—একজন ব্যাটসম্যানের পরিচিতিও ঘটেছে এ দিন।”

প্রবন্ধে আমার ব্যাটিং সম্পর্কেও বক্তব্য ছিলো। তাঁদের মতে আমার ‘ব্যাটিং মোটামুটি নিখুঁত যদিও আরো মার্জনার অপেক্ষা রাখে। পায়ের কাজ কিছুটা এলোমেলো।’

অনুশীলনের শেষে ওঁরা আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি সিডনির কোনো প্রথম শ্রেণীর সংস্থার হয়ে খেলতে ইচ্ছুক কিনা।

আমি সম্মতি দিলে আমার সেণ্ট জর্জের হয়ে খেলবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলো। প্রতি শনিবার খেলতে হবে। এর মধ্যে ওই সংস্থা কিন্তু আমাকে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনে যোগ দেবার জন্যে ডাকলেন—উদ্দেশ্য : ওই নির্বাচনী থেকেই কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে দল গঠন করা।

সিডনির এক নম্বর মাঠে খেলা শুরু হলো। প্রথম ইনিংসে সাঁইত্রিশ রানে নট-আউট রইলাম। এই ফলাফলে নির্বাচকমণ্ডলী কিন্তু খুশী হলেন না। গোলবার্নে পরের অনুশীলনের পাসপোর্ট মিললো অবশ্য। সাদার্ন কান্ট্রি উইকের এই খেলায় বাষট্টিতে অপরাজিত ছিলাম। চারটে উইকেটও নিয়েছিলাম।

খেলার তালিকায় ক্রিকেট পয়লা নম্বরে এলেও টেনিস পুরোদমে চলছিলো তখনো। ‘কান্ট্রি উইকে’র হয়ে টেনিস খেলার সুযোগ এলো। আমার অফিসের কর্তা মিঃ পারসি ওয়েস্টব্রুকের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। উনি আমাকে খেলাধুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন। সাধারণতঃ কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জানালেন—‘কান্ট্রি উইকে’ আমার যোগদানে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, তবে যে-কোনো একটা খেলাকেই বেছে নিতে হবে আমাকে।

আমি ক্রিকেট বেছে নিলাম।

‘কান্ট্রি উইকে’র খেলাগুলোয় বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রতি জেলা থেকেই খেলোয়াড় বাছাই করা হতো এবং পরস্পরের মধ্যে খেলা হতো তাদের। [illegible] খেলা হতো। সপ্তাহ-শেষের

খেলাটা হতো শহরের কোনো দলের সঙ্গে মফস্বলের বাছাই একাদশের। এ ব্যবস্থা খেলোয়াড়দের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো। এই সময়টাই আমার সবচেয়ে ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে।

আমার সর্বাধিক রান উঠেছিলো ছেচল্লিশ। সর্বনিম্ন একুশ। কিছু উইকেটও নিয়েছি। 'কান্ট্রি'র বেশ কিছু খেলোয়াড় পরে রাজ্য একাদশের হয়ে খেলেছে। অব সিলার (খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়) এবং এরিক উইসেলের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমাকে আউট করতে এরিকের ক্যাচ লোফার তুলনা বিরল। এমনি এক শনিবার আমি সেণ্ট জর্জের নির্বাচিত একাদশের হয়ে খেলতে নামলাম—পিটারস্যামের বিরুদ্ধে। পিটারস্যামের হয়ে খেলছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্যাম এভারেট আর টমি এণ্ডরুজ। কিন্তু মার দেওয়া ব্যাট দিয়ে কয়েকটা বিপজ্জনক মুহূর্ত তরে গিয়ে একশো দশ রানে রান আউট হয়ে গেলাম। পরের সোমবারে জায়গা হলো শহরের বিরুদ্ধে খেলবার জন্যে মফস্বলের বাছাই দলে। চার্লি ম্যাকার্টনির মতো আশ্চর্য ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে খেলবার এই সুযোগে রোমাঞ্চিত হলাম। ম্যাকার্টনির অনেকগুলো বলের পেছনে আমাকে ছুটতে হয়েছে, কিন্তু তবু তাঁর একশো ছাব্বিশ রান আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

আমাদের ইনিংসে প্রথম স্লিপে খেলার মুহূর্তে ক্যাচ তুলে দিলাম। স্কোর-বোর্ড এবং কাগজওলাদের বিচারে আমার রানসংখ্যা আটানব্বই হলেও সরকারী ঘোষণায় আমার রানসংখ্যা একশো বলা হয়েছিলো। ক্রিকেটে খেলায় উৎসাহ বাড়লো, উন্নতিও হতে লাগলো খেলার। পরের খেলাটিতে নিউ সাউথ ওয়েলসের একাদশে স্থান পেলাম। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলা—সিডনির মাঠেই। তারিখটা সাতাশ সালের নববর্ষের দিন।

সাতচল্লিশ রানে আমাদের তিনটে উইকেট পড়লো। কিন্তু ডাডলে সেডন্ (পরবর্তীকালে নিউ সাউথ ওয়েলসের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম) আর আমি একশো পাঁচে তুললাম রানের সংখ্যা। তেতাল্লিশ রানে (নিউ সাউথ ওয়েলসের শীর্ষ স্কোর) এবলিংয়ের একটা বল আমার স্টাম্প উড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয় ইনিংসে আট রান নেবার পর 'লেগে' একটা বাউণ্ডারী মারার মুহূর্তে আমার পা পিছলে গিয়ে লেগ স্টাম্পে লাগলো, একটা 'বেল' পড়লো। আম্পায়ার জর্জ বরউইক আমাকে আউট বলে ঘোষণা করলেন। এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছিলাম।

এই খেলায় ও'রিলী নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে খেলেছিলেন।

পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখলাম যে নিউ সাউথ ওয়েলসের শেফিল্ড শীল্ড দলে আমার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ক্রীড়াসমালোচকরা রাজ্য নির্বাচক-মণ্ডলীর তীব্র সমালোচনা করেন।

আজ আমি নিজে নির্বাচকমণ্ডলীর একজন—সমালোচনা এখন আমাকেই শুনতে হচ্ছে।

যাক, মরসুমের বাকি দিনগুলো আমি সেন্ট জর্জের হয়ে খেলে গেলাম। কিন্তু পরিশ্রম হতো, কারণ বাউরাল থেকে প্রতি শনিবার সকালে সিডনি ছুটতে হতো। ভোর পাঁচটায় উঠে স্টেশনে দৌড়তে হতো ছটার ট্রেন ধরার জন্যে।

নটার মধ্যে শহরে পৌঁছতাম। তারপর খেলাশেষে আবার ফেরা—মাঝরাতের আগে কোনোদিন শুতে যাইনি সেসব দিনে। এ সব অসুবিধে ছাড়া সপ্তাহের শেষে অনুশীলনও বন্ধ থাকতো, তবু সেই মরসুমে আমি দুশো উননব্বই রান করেছি—গড়ে আটচল্লিশ রানেরও বেশি।

বাউরালের হয়ে জেলাভিত্তিক খেলাগুলোতে খেলার আর একটা সুযোগ এলো। ফাইনালে মস্ ভেলের বিরুদ্ধে খেলা পড়লো। এদের সঙ্গে খেলে আগের বার পিটিয়ে তিনশো করেছি। এবার কিন্তু তেমন সুবিধে হলো না।

মস্ ভেল টসে জিতে ব্যাট শুরু করলো। আমি আটান্ন রান করে থেকে গেলাম দিনের শেষে।

পরের শনিবার বাউরাল ব্যাট করতে নামলো। রান উঠলো চারশো আশিতে। আমার অবদান তিনশো কুড়ি, আউট না হয়ে। [illegible] একটা পাঞ্জা আর তেতাল্লিশটা চার মেরেছিলাম।

কিন্তু সংস্থা কানুন পালটালো : এসব খেলায় প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়রা আর খেলতে পারবে না।

একটা মধুময় মরসুমের শেষ হলো এ ভাবে। খেলার সূত্রে মোলাকাত হলো অ্যালান কিপাক্স আর চার্লি কেলেওয়েের মতো দিকপাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে। ওঁদের খেলার সঙ্গে নিজের খেলা মেলাতে চেষ্টা করলাম, অনেক বাকি এখনো।

একটা জিনিস কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না—আমার 'গ্রিপ'। অধিকাংশ খেলোয়াড়দের সঙ্গে 'গ্রিপ' মিলছে না কংক্রীট পিচে। বল টানতে অসুবিধে হচ্ছিলো না, 'অনে' অনেক বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছিলো নিজেকে, গোলমাল শুধু থেকে গেলো 'মিড-অফে' আর 'পয়েন্টে'।

নানা গবেষণা চালালাম। শেষে ঠিক করলাম—'গ্রিপ' পালটানো চলবে না। এ ব্যাপারটা আমার ক্রিকেট-জীবনে অনেক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই তার নিজস্ব ধারা অনুসরণের সুযোগ দেওয়া উচিত। অবশ্যই যদি তা ত্রুটিপূর্ণ না হয়। স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই কেউ ভুল খেলছে, এটা মানা যায় না।

আগামী মরসুমের অপেক্ষায় দিন গুনছি—আরও অনেক শেখবার আছে।

শেফিল্ড শীল্ড ক্রিকেট

উনিশশো সাতাশ-আটাশের মরসুমেও আমার যাওয়া-আসা চলতে লাগলো, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে খেলার ব্যাপারটা পাকা করা দরকার। উত্তরাঞ্চল ক্রিকেট সংস্থা থেকে তাদের হয়ে খেলার আমন্ত্রণ পেলাম, কিন্তু সেণ্ট জর্জের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখন অত্যন্ত ভালো, তাই ওদের সঙ্গেই থেকে গেলাম।

প্যাডিংটনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম খেলা পড়লো। আমাদের মোট রান হলো দুশো আটান্ন, আমার ভাগ একশো তিরিশ, আউট হই-নি। আমার এই কৃতিত্বের চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যা, সেটা হচ্ছে ম্যাক

গ্রেগরীর মতো খেলোয়াড়ের বিপক্ষ দলে খেলার সুযোগ পাওয়া। সারা বিশ্বের ক্রিকেট-প্রেমিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি আজও অম্লান।

এতো কাণ্ড করেও কিন্তু সেবার কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নিউ সাউথ ওয়েলসের দলে জায়গা করে নিতে পারলাম না। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া আর ভিক্টোরিয়া সফরের সুযোগ মিললো না।

কিন্তু, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র! জ্যাক গ্রেগরী আর এইচ. এস. লাভ নিউ সাউথ ওয়েলস্ দল থেকে বাদ পড়লেন। অ্যালবার্ট স্কেন্স আর আমি তালিকাভুক্ত হলাম।

বিরাট সুযোগই বলবো এটাকে, কারণ অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানেই ঘটলো ব্যাপারটা। দলের হয়ে খেলার আনন্দ ছাড়াও এডিলেড আর মেলবোর্ন ঘুরতে পারবো এই অনির্বচনীয় সুখের রোমন্থন চললো কয়েকদিন ধরে। যে ছেলে কোনোদিন রাজ্যের বাইরে পা দেয়নি তার কাছে এটা আশাতীত প্রাপ্তি!

ট্রেনে ব্রোকেন হিল হয়ে আমাদের যেতে হলো, এ অভিজ্ঞতাও নতুন। যাত্রা শুভ হলো না, কারণ গরমে ঘুমোতে পারি নে, তার ওপর ভোরে ফ্যানের হাওয়ায় চোখে ঠাণ্ডা লেগে গেলো। আর্কি জ্যাকসনের হাঁটুতে ফোঁড়া দেখা দিলো, ফলে সিলভার সিটিতে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মাধ্যক্ষ ডঃ ম্যাকঅ্যাডাম (যিনি পরে ম্যাক্‌কোয়ারী স্ট্রীটের এক পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান) ফতোয়া জারি করলেন: আর্কি এবং আমার বাইরে বেরোনো চলবে না। অন্যদের সঙ্গে শহর দেখতে বেরোতে পারলাম না। ব্রোকেন হিল শহরটি নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সীসে খনিগুলো রয়েছে এখানে। তবে সেখানকার মাটি ক্রিকেট খেলার অনুপযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে। গত দুটো বছরে একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি—মাঠের যেদিকে চোখ যায় ঘাসের চিহ্নমাত্র নেই। গাঢ় লালচে মাটি—জায়গায় জায়গায় দু ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ। পিচটা কংক্রিটের এবং যে বল করছে তাকেও দৌড়ে আসতে হচ্ছে কংক্রিটের ওপর দিয়েই। এ দৃশ্যও নতুন।

স্পাইকওলা ক্রিকেট জুতো সম্পূর্ণ অচল এ মাঠে, কাজেই আমাদের

অনেককেই কেডস পরে খেলতে হলো। আমার সঙ্গে তাও না থাকায়, সাধারণ বুট দিয়ে কাজ সারতে হলো। নানান অসুবিধে সত্ত্বেও খেলাটা জমেছিলো। খেলার শেষে স্মরণিকা হিসেবে বলটা পেয়ে গেলাম আমি। বলটা আজও আছে আমার কাছে।

এডিলেডে পৌঁছলাম আমরা। আমার নাম বারো নম্বরে, কিন্তু ভাগ্য এবারও প্রসন্ন—আর্কি জ্যাকসনের ফোঁড়া সারলো না। আবহাওয়া অত্যন্ত গরম, ফলে আমাদের অধিনায়ক অ্যালান কিপাক্সকে দু-দুবার ব্যাট ছেড়ে বসে যেতে হলো, সর্দিগর্মি হয়ে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ শুরু করলো তাদের ফাস্ট বোলার জ্যাক স্কটকে দিয়ে। স্কট পরে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার হন। তারপর এসে শুরু করলেন পি. কে. লি; ইনি পরে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন। শেষে এলেন একমেবাদ্বিতীয়ম—গ্রিমেট।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের প্রথম ইনিংসেই একশো আঠারো রান করে আনন্দে ডগমগ হয়েছি। একই দিনে আরেকটা মাঠে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চারশো সাঁইত্রিশ করলেন পনস্‌ফোর্ড। আমি অতিক্রম না করা পর্যন্ত এটাই বিশ্ব রেকর্ড ছিলো। যে-কোনো ঋতুতে খেলার পক্ষে এডিলেডের মাঠ আদর্শ। ওই মাঠেই আমার প্রথম শ্রেণীর খেলার হাতে-খড়ি, আর শেষ খেলাও খেলেছি ওখানেই; উনিশশো উনপঞ্চাশের চৌঠা থেকে আটই মার্চ। খেলাটা হয়েছিল আর্থার রিচার্ডসনের সাহায্যার্থে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্ল্যারি গ্রিমেট নিজ মূর্তি ধারণ করলো—সাতান্ন রানে আটটা উইকেট ফেলে দিলো। আমাদের দেড়শো রানের মধ্যে আমি করলাম তেত্রিশ।

গ্রিমেটের 'লেগ-ব্রেকে'র বল অনবদ্য!

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে জিতলো।

গ্রিমেটের সঙ্গে পরে আলাপ হয়েছে। টেবিলের ওপর যেভাবে ওকে একটা বল 'স্পিন' করতে দেখেছি তা বোধ হয় একমাত্র ওর দ্বারাই সম্ভব। সে তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ 'লেগ-ব্রেক' বোলারের স্বীকৃতি পেয়েছে। আমিও তাই স্বীকার করি আজ পর্যন্ত। আর্থার মেইলিও স্পিন করতো

কিন্তু অধিকাংশই 'নো বল' হতো। গ্রিমেট কখনো খারাপ বল করেছে বলে মনে পড়ে না।

ভিক্টোরিয়াতে দুটো ইনিংসে যথাক্রমে একত্রিশ আর পাঁচ রান করলাম। মনটা দমে গেলো। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে পনস্‌ফোর্ড আর উডফুলের মতো দিক্‌পাল ব্যাটসম্যানদের খেলা অবাক চোখে দেখেছি। কনিষ্ঠ খেলোয়াড়দের কাছে এ দেখার দাম অনেক।

এর কিছুদিন পরে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেললাম। প্রথম বলেই শূন্য রানে আউট হয়ে যাই। আমি যখন মাঠে নামি অ্যালান কিপাক্স ব্যাট করছেন—বল দিচ্ছেন স্লো বোলার গফ। কিপাক্স প্রথম বলটা আলতোভাবে ঠেলে দিলেন মিড-অনে, একটা রান হলো। ব্যাপারটা আমার কাছে এতো সোজা মনে হলো যে আমিও ঠিক করলাম ওই ভাবেই খেলবো। আমার বোঝা উচিত ছিলো কিপাক্স অনেকদিন খেলছেন তাই সামলাতে পেরেছিলেন। আমার বেলায় বলটা কিন্তু দ্রুতই এলো এবং কোনো-কিছু বোঝবার আগেই মাঝের স্টাম্প পড়ে গেলো।

সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বল আসার আগে সেটা কিভাবে মারবো তা নিয়ে আর ভাববো না।

কিপাক্স এক অনন্য ইনিংস খেললেন সেদিন। তিনশো পনেরোতেও নট আউট। লোকে যদিও সেদিন ভিক্টর ট্রাম্পারের খেলাই বেশি উপভোগ করেছিলেন, তবু কিপাক্সের ব্যাটিং ভোলার নয়। ওই ইনিংসেই কিন্তু একটা মজার ঘটনা ঘটলো। একটা 'নো বল' ঠ্যাঙাতে গিয়ে বলটা স্টাম্পে ঠেকে 'বেল' উড়িয়ে দিলো। উইকেট-রক্ষক ও'কোনর 'রান-আউট' চাইলেন, কিপাক্স তখন উইকেটের বাইরে। আম্পায়ারের 'নট-আউট' ঘোষণায় সেদিন তুমুল তর্কের ঝড় উঠেছিলো।

আমাদের পরের আন্তরাজ্য খেলাটি ছিলো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে, সিডনির মাঠেই। ম্যাক্‌কের বলে আউট হলাম, ক্যাচও ধরলেন উনিই। নতুন বল—ফুল টসের; অনে খেলার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বোলারের কাছেই ফিরে গেলো বল।

মরস্থম শেষ করলাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিয়াত্তর করে, আর ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একশো চৌত্রিশ করে—আউট না হয়ে। সাধারণ খেলাধুলোর চাইতে কিন্তু এই সব আন্তরাজ্য খেলাগুলোতে পরিশ্রম হতো অনেক বেশি। ঝানু বোলারদের পাল্লায় পড়ে ব্যাটিংয়ের ধারাই পালটাতে হলো।

যদিও এ মরস্থমে সার্থকতার শীর্ষ ছুঁতে পেরেছি, তবু নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার জন্যে উসখুস করতে লাগলাম। নির্বাচকমণ্ডলী নামের তালিকা ঘোষণা করলেন যথাসময়ে—আমার নাম নেই। অতিরিক্তদের তালিকায় পড়েছি। জ্যাকসন বা রাইডারকে অতিক্রম করে দলভুক্ত হবার আশা দুঃস্বপ্নেরই সামিল। ওঁরা অনুপস্থিত না হওয়ায় খেলতে পারিনি।

নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে না খেলতে পারার ক্ষোভ আমার স্মৃতিতে চির-জাগরূক।

প্রথম শ্রেণীর খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলো। এর কিছুদিন পর ভিক্ রিচার্ডসনের নেতৃত্বে একটা দল এলো বাউরালে, সেণ্ট জর্জের দল থেকে বাছাই ছেলেদের নিয়ে। উদ্দেশ্য : লুজবি পার্কে নতুন মাঠের পত্তন করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিলো, সংবর্ধনার আয়োজনও। আমার জুটলো সোনার চেনওয়ালা একটা ঘড়ি।

পরবর্তী সময়ে বাউরালের অধিনায়ক মিঃ অ্যালফ স্টিফেন্স আমার খেলার ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ জুগিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডেও গেছেন আমার খেলা দেখতে একাধিকবার।

কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলাতেও অভিজ্ঞতা বেড়েছে। আর্থার মেইলির দল বোহেমিয়ান্সদের হয়ে পার্ক্ স্থয়ের খেলা, কাউরা, কুটামাণ্ড্রা আর ক্যানবেরার খেলাগুলো দেখেও অনেক শিখেছি।

আমার জন্মস্থান কুটামাণ্ড্রার একটা খেলায় এক রান করে আউট হয়ে যাই। ওইখানে ওটাই আমার প্রথম ও শেষ খেলা। কানোইউণ্ড্রাতে শূন্যের বিনিময়ে উইকেট হারানোর বিপর্যয় আজও আমার মনকে পীড়া দেয়। আউট করেছিলো রেক্স নরম্যান।

একটা কথাই মনে গাঁথা হয়ে গেলো, ক্রিকেটে উন্নতি করতে বা

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হলে সিডনিতে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে, নিয়মিত অনুশীলনের প্রয়োজনে তো বটেই। তাছাড়া বাউরাল থেকে সিডনি যাওয়া-আসার ব্যাপারটাও খুব কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছিলো।

টেস্ট ক্রিকেট

আটাশ-উনত্রিশের মরসুমটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কারণ ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে আসছে। অস্ট্রেলীয় দলে তরুণ তুর্কী দরকার।

আমার কর্তা মিঃ ওসেটব্রুক সিডনিতে ব্যবসার প্রসার করবেন ঠিক করলেন এবং আমাকে সেখানকার সেক্রেটারীর পদটি দিতে চাইলেন। কোনোদিকে তাকালাম না—সিডনিতে পাকাপাকি ঘাঁটি করা দরকার। তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। বাউরালে মিঃ জি. এইচ. পিয়ার্স নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। উনি সিডনির এক বীমা কোম্পানীর হয়ে বাইরে বাইরে কাজ করতেন। আমাকে তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ব্যবস্থায় শুধু আমি না, আমার অভিভাবকেরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

সিডনির মাটিতে পা দিয়েই চুটিয়ে অনুশীলন শুরু করে দিলাম। মরসুমের প্রথম খেলা পড়লো মেলবোর্নে। অস্ট্রেলীয় দলের অধিনায়কত্ব করলেন বিল উডফুল—প্রতিপক্ষ ভিক রিচার্ডসনের বাছাই দলের সঙ্গে। আমি বাছাই দলের হয়ে খেলেছিলাম। প্রথম ইনিংসে চোদ্দ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ করেছিলাম মাত্র।

প্রথম ইনিংসে অবশ্য আমাদের দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ছিলো একত্রিশ। গ্রেসেরও প্রথম খেলা সেটা, উনি করলেন যথাক্রমে এক ও তিন রান।

কাগজওলারা লিখলো : দলের দুটো ইনিংসে যেখানে কুড়িটা উইকেট পড়েছে একটা রানও না করে, সেখানে বারো বছর বয়সের এই ছোকরার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বলা বাহুল্য, গ্রিমেট আর অক্সেনহ্যাম সেদিন মারাত্মক

বল করেছিলেন। আমার হতাশা বেশিদিন রইলো না, পরের সপ্তাহেই নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে একশো একত্রিশ এবং দ্বিতীয়টায় আউট না হয়ে একশো তেত্রিশ করেছিলাম।

এ খেলা আমাকে এম. সি. সি.র বিরুদ্ধে খেলার প্রেরণা জুগিয়েছিলো—টেট্, হ্যামণ্ড, 'টিক' ফ্রিম্যান এবং লারউডের মতো বরণীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে পারবো ভেবে। প্রথম ইনিংসে হলো সাতাশি আর পরের ইনিংসে একশো বত্রিশ—এবারও আউট হইনি।

সিডনির মাঠেই আবার খেলা হলো নিউ সাউথ ওয়েলসের, এম. সি. সি.র সঙ্গে। এবার মুখোমুখি হলাম জর্জ গিয়ারী আর জ্যাক ওয়াইটের। প্রতি রানের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়েছে এ খেলাতে।

প্রথম ইনিংসে আউট না হয়ে আটান্ন রান তুলতে সময় লেগেছিলো তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট। 'ফ্যাটা' ওয়াইটের ধীরগতি মাপা বলগুলোর কথা আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে আঠারো রানে বসে গেলাম। পরের অন্য কয়েকটা খেলার সাফল্য অবশ্য অস্ট্রেলীয় একাদশে খেলবার সুযোগ করে দিলো।

যে রাতে নামগুলো ঘোষণা করা হবে, সে রাতটা আমার উৎকণ্ঠার মধ্যেই কাটলো—শুতে যেতে পারছি না। তারপর একসময়ে একে একে নাম বলা শুরু হলো, আমার নামটা প্রথমেই এলো, শব্দানুক্রমিক ঘোষণার ফলে।

আমার প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌঁছলাম।

ব্রিসবেনের মাঠে খেলা হলো। ইংল্যাণ্ড আমাদের ধসিয়ে দিলো, ছশো পঁচাত্তর রানে জিতে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে চরম পরাজয়। অবশ্য এই বড় খেলার হাতেখড়িতে অনেক শেখার ছিলো। এই বিপুল সংখ্যক রান তোলার কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁদের খেলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি। তাই আঠারো রানে প্রথম ইনিংসে আউট হওয়ায় কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়নি।

'আঠালো' উইকেটে সেই আমার প্রথম খেলা।
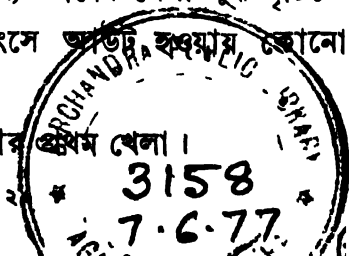
চার্লি কেলেওয়ের টোমেইন বিষক্রিয়া হওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে পারলেন না, এবং বাকি জীবনের দিনগুলোতে কোনোদিনই না।

আর একটা তিক্ত স্মৃতি আজও আমার মনে ভাস্বর—খেলার পর জ্যাক গ্রেগরী হাঁটুতে চোট নিয়ে সাজবদলের ঘরে এলেন। তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখে জল, 'আমার শেষ খেলা খেলে এলাম।'

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের একটা বড় খুঁটি খসে গেলো।

লারউডের মতো জোরে বল দিতে পারতেন না গ্রেগরী, কিন্তু পাঠকেরা জেনে বিস্মিত হবেন যে শেফিল্ড টেস্টে আটত্রিশটা উইকেট নিয়েছিলেন গ্রেগরী। 'স্পিনে'র কাজ চমকপ্রদ—যেখানে গ্রেগরী সেখানেই অগণিত দর্শক।

প্রবীণ খেলোয়াড়ই পছন্দ করতেন নির্বাচকমণ্ডলী, ফলে বর্ষীয়ান খেলোয়াড়দের ভিড় হলো দলে—জ্যাক রাইডারের বয়স তখন উনচল্লিশ, গ্রিমেট ছত্রিশ, ব্ল্যাকি ছেচল্লিশে পড়েছেন, আইরনমঙারের একচল্লিশ চলছে।

মরসুমে আমার রেকর্ড ছশো রান (গড় : ইনিংসে পঁচাশি) হলেও আমি বারো নম্বরেই থেকে গেলাম। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে নামতে হলো—পন্সফোর্ডের হাড় ভেঙে যাওয়ায়।

এবারও অস্ট্রেলিয়ার শোচনীয় হার হলো।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পরের খেলায় নামবার আগে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলা হলো মেলবোর্নে। এ খেলায় আমার রানসংখ্যা উল্লেখযোগ্য না হলেও, দশম উইকেটে কিপাক্স আর হুকারের তিনশো সাত স্মরণীয়, কারণ ন' উইকেটে আমাদের রান ছিলো একশো তেরো। এই জুটি ভিক্টোরিয়াকে পাঁচ ঘণ্টা ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিপাক্স আউট না হয়ে দুশো ষাট করলেন, আর হুকার গেলেন বাষট্টিতে।

তৃতীয় টেস্টে আবার দলে ফিরে এলাম। দুটো ইনিংসে যথাক্রমে উনআশি আর একশো বারো রান হলো। 'আঠালো' উইকেটে ইংরেজরা কি করেন দেখার সুযোগ হলো এই খেলায়। ওই জঘন্য মাঠেই হবস্ করলেন উনপঞ্চাশ আর সাটক্লিফ একশো পঁয়ত্রিশ।

'আঠালো' মাঠেই সাটক্লিফের ওই অনন্য খেলা আমি ভুলবো না। হ্যামণ্ড আর লেল্যাণ্ডের কথাও মনে পড়ে কিন্তু 'লাফানো' বা 'ঘুরতি' বল ছেড়ে দেবার চমক, একমাত্র ওঁর পক্ষেই সম্ভব।

পন্সফোর্ড অসুস্থ হওয়ায় উডফুলের সঙ্গে ইনিংস শুরু করার লোকের অভাব হলো। পরের ছুটো টেস্টে রিচার্ডসনকে দিয়ে চেষ্টা করা হলো কিন্তু চারটে ইনিংসে তাঁর রান উঠলো পঁয়ত্রিশ।

কাগজওলারা আমার পরোক্ষ ওকালতি করলো; নতুন খেলোয়াড় দিয়ে ব্যাট শুরু করার সুযোগ দেবার কথা লিখে। বরাত খুললো আবার —নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলায় আমাকে প্রথম ব্যাট করতে দেওয়া হলো। বিপক্ষের বোলার টিম. ওয়াল কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টের জবাব হাতে হাতেই দিলো—ছুটো ইনিংসে মোট সাত রানেই বসিয়ে দিলো আমাকে। আর্কি জ্যাকসন একশো বাষট্টি আর নব্বই করে চতুর্থ টেস্টে রিচার্ডসনের জায়গাটি দখল করলো। কি খেলাই খেললো জ্যাকসন! তার উনিশ রানের মাথায় আধ ঘণ্টার মধ্যে বসে গেলো উডফুল, হেনড্রী আর কিপাক্স, তাদের মোট রানও উনিশ।

জ্যাকসন বিন্দুমাত্র দমলো না। চুটিয়ে ব্যাট করে ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নিলো।

বিরতির পর আমি নামলাম জ্যাকসনের সঙ্গে। ওর রান তখন ছিয়ানব্বই কি সাতানব্বই। আমি ওর চেয়ে বোধ হয় বছর খানেকের বড়ই ছিলাম বয়সে। জ্ঞান দেবার লোভ সামলাতে পারিনি, বলেছিলাম, 'সময় নিয়ে খেলো, সেঞ্চুরী হবে।'

আমার কথা ওর কানে ঢুকেছিলো বলে মনে হয় না, কারণ লারউডের পরের বলটা সপাটে মারলো সদস্যদের স্ট্যাণ্ডে। কনিষ্ঠতম খেলোয়াড হয়েও একশো চৌষট্টি করে টেস্ট রেকর্ড করলো জ্যাকসন।

ওর রানসংখ্যা নিয়ে যত না মাথা ঘামালো মানুষ, অনেক বেশি ভাবলো ওর মারের ভঙ্গি দেখে।

ইংরেজরাও গলা মেলালো এ প্রশস্তিতে, কারণ হেরে গিয়েও খেলার তারিফ করতে ওরা ভোলে না।

কিন্তু কে জানতো চার বছর পরে ওই তরুণ প্রতিভার শেষ যাত্রায় আমাকে অংশ নিতে হবে! রাজরোগের শিকার হয়েছিলো জ্যাকসন।

অন্যদিকে হ্যামণ্ড তার পয়লা ইনিংসে নট আউট থেকে একশো উনিশ আর পরেরটায় একশো সত্তর করে আমাদের জেতার আশায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলো। হ্যামণ্ড অনেকদিন ধরেই খেলছিলেন এবং দাপটেই, তবু মনে হয়েছে তখনো তিনি তাঁর ফর্মার শীর্ষে। খেলার শেষটুকুতে বেশ উত্তেজনা ছিলো। ইংল্যাণ্ড মাত্র বারো রানে জিতলো। জয় যখন প্রায় আমাদের হাতের মুঠোয়, সেই মুহূর্তে চুল-চেরা বিচারে আউট হয়ে গেলাম। ছক্কার বাউণ্ডারী করার মারে ব্ল্যাকিও আউট হয়ে খেলা শেষ হলো।

ব্ল্যাকি কাপড় ছাড়ার ঘরে ঢুকতে একজন মজা করে বললো, 'বলটা মারার সময় কি মনে হলো ?'

ব্ল্যাকি তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় উত্তর দিয়েছিলো, 'ছক্কা মারতে পারলে কি রকম উচ্ছ্বাসের বন্যা বইবে সবার মধ্যে, তাই ভাবছিলাম।'

পর পর চারটে টেস্টে হেরে গেলেও, অস্ট্রেলীয় দলে তরুণ খেলোয়াড়দের প্রাধান্য মাথাচাড়া দিচ্ছিলো।

চতুর্থ টেস্টের আগে সিডনির মাঠে এক খেলায় তিনশো চল্লিশ রান করেছিলাম, অপরাজিত থেকে। এই রানের সংখ্যা তখন শেফিল্ড শীল্ড ক্রিকেটে নিউ সাউথ ওয়েলসের কোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ রান বলে চিহ্নিত, সিডনির মাঠে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেও। মেলবোর্নের মাঠে শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া শিকে ছিঁড়লো প্রথম জিতে। জ্যাকসন, ফেয়ার-ফ্যাক্স, হর্নিব্রুক আর আমার মতো তরুণ রক্তই সে জয়ের দাবীদার।

উনিশ শো তিরিশে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দল আস্তে আস্তে পূর্ণ দলের মর্যাদা পেলো। আমার রান ছিলো একশো সাতাশ আর সাঁইত্রিশ, আউট হইনি।

অস্ট্রেলীয় দলে আমার জায়গা পাকা হয়ে গেলো।

আমাদের নতুন ফাস্ট বোলার টিম ওয়াল দারুণ খেললো, বিশেষ করে

দ্বিতীয় ইনিংসে—ছেষট্টি রানে পাঁচটা উইকেট পড়লো তার হাতে। অ্যালান ফেয়ারফ্যাক্সও নেমেই পঁয়ষট্টি করলো, সেও পাকা হলো।

আমাদের অধিনায়ক জ্যাক রাইডারের সঙ্গে জুটি হবার সুযোগও হলো, আমরা তখন জিতছি।

তখন জানতাম না যে জ্যাক রাইডারের সেটাই শেষ খেলা। তিরিশ সালে সে অস্ট্রেলীয় নির্বাচকমণ্ডলীতে যুক্ত হলো। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পরের টেস্টে বাদ পড়লো সে। আমার প্রথম টেস্টের অধিনায়ক রাইডার, ওর স্নেহ আমার স্মৃতিতে অম্লান।

পরে নির্বাচকমণ্ডলীতে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা।

এ মরসুম আমার কাছে চিরস্মরণীয়, কারণ দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুবারে পঁয়ত্রিশ আর একশো পঁচাত্তর যুক্ত হয়ে মোট রান দাঁড়ালো ষোলোশো নব্বই—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে তখনো সর্বোচ্চ গড়। তবে, যদি ভুল না করি, এ রেকর্ড অচিরাৎ ছাড়িয়ে যাবে কোনো তরুণ খেলোয়াড়।

একটি আন্তর্জাতিক রেকর্ড

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পরের খেলা হবার আগে ওখানকারই এক বেসরকারী দলের সঙ্গে খেলতে হলো। দলটি নিউজিল্যাণ্ড যাবার পথে আমাদের সঙ্গে খেললো। এ. এইচ. গিলিগ্যান অধিনায়কত্ব করছেন দলের, বিখ্যাত খেলোয়াড় দলীপ সিংজীও আছেন দলে। ফ্র্যাঙ্ক উলিও খেলবেন জানা গেলো। সিংজী তাঁর পূর্বদেশীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলেন চৌত্রিশ আর সাতচল্লিশ করে। উলি তখন পড়ন্ত, চল্লিশ পার হয়েছেন—তবু দুশো উনিশ করলেন।

এম. সি. সি.র বিরুদ্ধে নিউ সাউথ ওয়েলসের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা—আর্থার অলসোপের প্রথম শ্রেণীর খেলায় একশো সতেরো আর তেষট্টি, আউট হননি। ওঁর খেলা পরেও দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি ওঁর কভারের মার

দেখে। পরে অলসোপের খেলার জৌলুস কমলেও অস্ট্রেলীয় একাদশে খেলার প্রতিশ্রুতি ছিলোই। শেফিল্ড শীল্ডের খেলাগুলো ছাড়াও, সিডনির মাঠে টেস্টের নির্বাচনী খেলা হলো রাইডারের একাদশ বনাম উডফুলের একাদশ। অদ্ভুত উত্তেজনাকর খেলা। রাইডারের দল এক উইকেটে জিতলো—ওদের রান উঠলো হুশো তেষট্টি। আমার রান ছিলো একশো চব্বিশ, এই খেলায়, উডফুলের দলে খেলে।

'ফলো অনে' উডফুল আমাকেই প্রথম ব্যাট করতে পাঠালেন, হুটো ইনিংসের মধ্যে আর ব্যাট হাতছাড়া হলো না, কারণ দিনের শেষে হুশো পাঁচ করার পর নট আউট রইলাম—এবং পরের দিন হুশো পঁচিশে খতম হয়ে গেলাম। প্রথম খেলায় একটা আর দ্বিতীয়টায় ডবল সেঞ্চুরী হলো। এই খ্যাতি আমিই প্রথম পেলাম।

মরসুমটা মোটামুটি উল্লেখযোগ্য হলেও সেঞ্চুরী আর মাত্র একটাই হয়েছিলো—কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে। চারশো বাহান্ন রানে নট আউট ছিলাম। এটা প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক রেকর্ড, এবং আজও তা অম্লান।

শনিবার খেলা শুরু হওয়ায় সুবিধেও হয়েছিলো—দিনের শেষে উইকেট না হারিয়ে হুশো পাঁচ করেছিলাম। পুরো একটা দিনের বিশ্রাম জুটলো, সোমবার দিন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে শুরু করলাম।

শ'য়ে শ'য়ে চিঠি পেয়েছিলাম, তার ভেতরে প্রথমেই এক টেলিগ্রাম, বিল পন্সফোর্ডের (পূর্ববর্তী রেকর্ড সৃষ্টিকারী): 'তোমার অভূতপূর্ব সাফল্যে অভিনন্দন—এ সম্মান তোমার মতো খেলোয়াড়েরই প্রাপ্য।'

সবকিছু ভালোই চলছিলো সে সময়ে। 'পিচ'টা ভালো ছিলো, আবহাওয়াও অনুকূলে, গরমও নেই তেমন। ইনিংসের গোড়ার দিকে সেঞ্চুরী করার কথা মাথায় ছিলো না, কিন্তু রানসংখ্যা তিন শতক পেরোতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেলো। শেষে অ্যালান কিপাক্স যখন আট উইকেটে সাতশো একষট্টি রানে আমাদের খেলা শেষ করলেন তখন হুই সংখ্যায় এসে গেছি। তাড়ু মার মেরে খেলেছি সেদিন, আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই ছিলো না। নীচের তালিকা থেকে রান তোলার সময়ের হিসেবটা পাওয়া যাবে:

৫০ রান	৫৪ মিনিটে
১০০ „	১০৩ „
১৫০ „	১৪০ „
২০০ „	১৮৫ „
২৫০ „	২৩০ „
৩০০ „	২৮৮ „
৩৫০ „	৩৩৩ „
৪০০ „	৩৭৭ „
৪৫০ „	৪১৪ „
৪৫২ „	৪১৫ „

[দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে ১০৫ রান করেছিলাম, ১৪২ লাঞ্চ আর বিকেলের চায়ের মধ্যে ।]

পন্সফোর্ডের রেকর্ড ছিলো চারশো সাঁইত্রিশ রান ছশো একুশ মিনিটে। আড়াইশো আর তিনশো রানের মধ্যে সময়টাই বেশি লেগেছিলো আমার—আটান্ন মিনিট।

ইনিংসের শেষে একজন দর্শক বেড়া টপকে ঢুকে আমাকে কাঁধে করে বের করে নিয়ে গেলেন। দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলাম—আমার নীচে উনি। কুইন্সল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা প্রচুর পরিশ্রান্ত ছিলেন, তবু তাঁরাই আমাকে তুলে মাঠের বাইরে পৌঁছে দিয়েছেন।

খেলার ধারা পাল্টানোর জন্যে নানা উপদেশ আসতে লাগলো—মরিস টেট আর উলির অভিমত ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে গেলে আমার ব্যাটের মার আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। পারসি ফেণ্ডার আমার সমুদ্রপারের কৃতিত্ব সম্পর্কে সন্দেহও প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ অভিযোগ করলেন 'টানা' মারে ব্যাট নাকি বেশি ঘুরে যায়। আমার মনে হলো এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার। আমার তাড়ু মারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মার ছিলো 'লেগে'র শর্ট পিচ বল পেটানো। ফলে ব্যাট ঘোরাতেই হতো। ওই ধরনের মার নিখুঁত করার আর কোনো প্রক্রিয়া

আছে বলে আমার জানা নেই। এসব মারে ঝুঁকি অবশ্যই ছিলো, কিন্তু রান উঠতো দ্রুতগতিতে—আউটও হতাম কচিৎ। আমার ধারণা ক্রিকেট খেলাটা মূলতঃ ব্যাট আর বলের খেলা, আর সেইজন্যেই সব সময়ে আক্রমণাত্মক প্রথায় খেলা পছন্দ করতাম। এটা অবশ্য চলতো যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের বল সেটাকে অসম্ভব না করে তুলতো। ক্রিকেট খেলার প্রতিটি মুহূর্তই আমার ভালো লাগতো, সমবয়সী আর পাঁচটা ছেলের মতোই।

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার দলে জায়গা পাবো এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম—কিন্তু বেতারে নাম ঘোষণার মুহূর্তে বাড়িতে ছিলাম না, ভাইয়ের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলাম।

স্থানীয় একটা রঙ্গমঞ্চে পড়শীরা বিদায় অভিনন্দনের ব্যবস্থা করলেন—প্রবীণ-নবীন শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পর। অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন মিঃ ফ্রাঙ্ক কাশ, পরে অস্ট্রেলীয় কণ্ট্রোল বোর্ডের সদস্য হন। মিঃ কাশ ও তাঁর স্ত্রীর কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। সিডনিতে সেণ্ট জর্জ ডিস্ট্রিক্টে থাকতে হলো, ওদের হয়ে খেলার জন্যে। মিঃ কাশ তাঁর বাড়িতে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, চাকরি বা খেলার কোনো ব্যাঘাত না হয় সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি ছিলো ওঁদের। ওঁদের সাহায্য আর উপদেশ কোনোদিনই ভুলবো না। আমাদের কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা মন্দা হওয়াতে সিডনির এক খ্যাতনামা খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতার কাছে চাকরি নিলাম। হালকা মনে অস্ট্রেলীয় দলের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড সফরে যাত্রা করলাম। হাজার হাজার অস্ট্রেলীয় যুবকের কাছে যা স্বপ্ন আমার ক্ষেত্রে তা বাস্তব রূপ নিলো। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করা হলো, আর,—বিদেশ যাত্রার সম্মানও অর্জন করা হলো, একই সঙ্গে।

ইংল্যাণ্ডে প্রথম বার

ইংল্যাণ্ডে খেলবার জন্যে যে দল গঠন করা হলো, তাতে জনা চারেক পুরনো খেলোয়াড় ছিলেন—বাকি সবাই নতুন। কিছুটা অনভিজ্ঞও।

বুকে অদম্য আশা, কিছুটা ভয়ও নিয়ে চলেছি সফরে। জাহাজে এই প্রথম চড়ছি। জাহাজের নাম 'নাইরানা'। জাহাজে বমি হলো বারকয়েক —লোকে বললো ওটা নাকি 'সি-সিকনেস'—'জলের অসুখ'। সতীর্থদের রসিকতাও হজম হলো না। যাক, লন্সটন পৌঁছনো গেলো।

রাজকীয় সম্বর্ধনা জুটলো আমাদের টাসমানিয়া দ্বীপে। কয়েকটা প্রদর্শনী খেলার আয়োজনও হলো—তারই একটাতে স্ট্যান ম্যাক্‌কাবে তার প্রথম শত রান পূর্ণ করলো।

মনোরম দ্বীপ, তার অগ্রগতির সূচনা সেদিনই চোখে পড়েছে আমাদের।

অদ্ভুত জলের অসুখের শিকার হয়েছি পরেও কয়েকবার, কিন্তু তখন তা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ডে পৌঁছনোর আগে অনেক দেশ দেখা হলো—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), সুয়েজ, কায়রো, পোর্ট সৈয়দ, ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ঘুরে শেষে বিলেত।

অনেকেই স্বাগত জানাতে এসেছিলেন সেদিন, সকলের নামও মনে নেই। একজনের কথা মনে পড়ছে, তিনি লর্ড হ্যারিস।

এতোদিন ধরে যে নামগুলোর সঙ্গে বইয়ের পাতায় সংযোগ ছিলো আজ প্রাণভরে দেখলাম সে সব জায়গা। দেখলাম—লর্ডসের মাঠ—ক্রিকেটের সঙ্গে উচ্চারিত একটা অবিস্মরণীয় নাম। আর দেখলাম ওয়েম্বলে টাই ফাইনালের মাঠ। লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছিলো সেখানে—একাত্ম গলায় জাতীয় সঙ্গীত গাইছিলো।

এ সফরের বিস্তারিত সন্দেশ দিতে গেলে তাতেই একটা বই হয়ে যাবে, কাজেই যা ভুলতে পারিনি তাই শুধু বলবো। ওরস্টারের প্রথম খেলা —সে মাঠের পেছনে 'জেমে'র স্থাপত্য। খেলা শুরু হলো। প্রথম ইনিংসেই দুশো ছত্রিশ করলাম (ম্যাসির আঠারোশো বিরাশির রেকর্ড ছাড়ালো)। তারপর লিস্টারে হলো একশো পঁচাশি, অপরাজিত থেকে।

এই খেলাগুলোয় একটা তথ্য জানা গেলো—ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এক ধরনের মারই চলতে পারে। আবহাওয়ার তারতম্যে মাঠেরও পরিবর্তন

হচ্ছে। ঘাস বেশি থাকায় পিচের আনুকূল্য পাচ্ছে বোলাররা। বলের গতি শ্লথ হওয়ায় অফের মারে সুবিধে হচ্ছিলো। অবশ্য, মানুষটা ছোট্ট হওয়ায় আমি কিছু বেশি সুবিধে পেয়েছি। তৃতীয় খেলায় আমাদের ক্ল্যারি গ্রিমেট ভেলকি দেখালো—সাঁইত্রিশ রানে ইয়র্কশায়ারের দশটা উইকেট ফেলে দিয়ে। শেষের সাত রান মাত্র ষোলো রানের বিনিময়ে। ওই খেলাতেই আমি আটাত্তর করেছিলাম—ইংল্যাণ্ডের ভিজে মাঠে প্রথম নেমে। ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে খেলায় মুখোমুখি হতে হলো বিখ্যাত ফাস্ট বোলার টেড ম্যাকডোনাল্ডের। খুব অল্প সময়ই বুঝতে পেরেছি, কারণ ওর ধাত বোঝার আগেই মাঝের স্টাম্প পড়ে গিয়েছিলো। এখনো মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলারদের মধ্যে ওর নামটা সবার ওপরে থাকবে।

অস্ট্রেলিয়ার রোদ-ঝলমল আবহাওয়া থেকে ইংল্যাণ্ডের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এসে অস্বস্তি বাড়ছিলো। ব্যাট করতে নামার আগে গরম কোট আর ওভারকোট পরে আগুনের সামনে বসে থাকা, তারপর হাতে-পায়ে চোট লাগলে তো কথা নেই। কিছুদিন পরে অক্সফোর্ডের এক খেলায় আবহাওয়াবিদদের ঘোষণায় উষ্ণ বাত্যাপ্রবাহ ('লু') চলার সতর্কতা ছিলো, কিন্তু খেলতে নামার মুহূর্তে উলটোটাই হলো, আমাদের জনা সাতেক খেলোয়াড়কে সোয়েটার পরে নামতে দেখা গেলো।

বৃষ্টির জন্যে শুধু একদিনই খেলা হলো। আমাদের 'নরম' পিচে খেলতে হলো। সময়ের অনেক আগেই খেলা বন্ধ হলো, কিন্তু তারই মধ্যে পাঁচ উইকেটে তিনশো উনআশি রান হয়ে গেছে আমাদের। আমার রান ছিলো দুশো বাহান্ন; আউট হইনি। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এটাই আমার স্মরণীয় সেঞ্চুরী, কারণ দ্বিতীয় শতকের রানগুলো উঠেছিলো মাত্র আশি মিনিটে। এসবের সাফল্য মে মাসের মধ্যে হাজার রান তোলার সুযোগ এনে দিলো। এই সৌভাগ্য অস্ট্রেলিয়ার আর কোনো খেলোয়াড়ের হয়নি এর আগে। মাসের শেষ দিনটাতে খেলা পড়লো হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে। ওরা টসে জিতে খেলতে নামলে আমার মনে হলো হাজার রান

বোধ হয় এ সফরে আর করা গেলো না, কিন্তু গ্রিমেটকে ধন্যবাদ সে ওদের উইকেটের সংখ্যা দ্রুতগতিতে কমিয়ে আনতে লাগলো।

আমরা ব্যাট পেলে আর্কি জ্যাকসন আর আমি প্রথম জুটি নামলাম। বৃষ্টিতে আবার খেলা ভণ্ডুল হবার উপক্রম হলো, তবে তার মধ্যেই হাজার করে ফেলেছি আমি। হ্যাম্পশায়ারের অধিনায়ক অনেক আগেই খেলা বন্ধ করতে পারতেন, কিন্তু করেননি,—তাঁর এই উদারতাটুকু আমার মনে থাকবে।

পরে উনিশশো আটত্রিশে লর্ডসের মাঠে শেষ ব্যাটে আমিও অবশ্য বিল এডরিচকে হাজার রান পূর্ণ করার সুযোগ দিয়েছি।

কিন্তু, এ সবই টেস্টের প্রস্তুতিপর্ব বলা চলে।

ইংল্যাণ্ড তৃতীয় টেস্টে তিরানব্বই রানে জিতলো। চতুর্থ ইনিংসে তিনশো পঁয়ত্রিশ হলো আমাদের, আমার রান একশো একত্রিশ। এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেলাম বলে আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে মিডল-সেক্সের এক দুর্ধর্ষ বোলার আমাকে নামিয়ে দিলো। 'নো বল' ভেবে ব্যাট চালাইনি।

আবহাওয়া খারাপের দিকেই যেতে লাগলো। এর ওপর সাটক্লিফের পায়ে চোট। লারউড হলো অসুস্থ।

যাই হোক লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্ট কিন্তু ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। খেলার বহু পরেও এ নিয়ে রসিকমহলে অনেক বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

চারদিনের এই খেলায় ইংল্যাণ্ড ওদের প্রথম ইনিংসে চারশো পঁচিশ রান করেছিলো। দলীপ সিংজীর সেই প্রথম টেস্ট খেলা। তাঁর রান হলো একশো তিয়াত্তর। আমাদের জয়ের আশা সুদূরপরাহত মনে হলো। প্রথম জুটি নামলেন উডফুল আর পন্সফোর্ড, বেশ কিছুক্ষণ চালালেন তাঁরা। এর পরে নামলাম আমি—দুশো চুয়াল্ল করেছিলাম। বলগুলো ঠিক ঠিক মেরেছিলাম বলে মনে পড়ছে—এমনকি যে বলটা পার্সি চ্যাপম্যানের হাতে ক্যাচ তুলে দিই, সে মারটাও ঠিকই হয়েছিলো বলেই আমার অনুমান। দলের সকলেই মোটামুটি ভালো খেললো, এবং রানসংখ্যা

দাঁড়ালো ছ উইকেটে সাতশো উনত্রিশ। তারপর ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হলো। লর্ডসের রান লেখার বোর্ডে 'সাত' সংখ্যাটি না থাকায় কিছু অসুবিধে হয়েছিলো। ওরা এতোটা আশা করেনি।

ইংল্যাণ্ড জবাবে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনশো পঁচাত্তর করলো। আরও কম রানে ওদের নামিয়ে দেওয়া যেতো, রিচার্ডসন আর পন্সফোর্ড দুটো নিশ্চিত ক্যাচ ফেলে না দিলে। চ্যাপম্যান এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো চারটে ছক্কা আর বারোটা চার মেরে।

যাক, শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে জিতলাম আমরা। অস্ট্রেলিয়া দেখিয়ে দিলো দ্রুত রান তুলতে পারলে যে কোনো খেলাই জেতা যায়। লীডসের তৃতীয় টেস্টেও আমাদের রান বেশি ছিলো, কিন্তু খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এই খেলাও স্মরণীয় আমার কাছে, সন্দেহ নেই, কারণ এতে তিনশো চৌত্রিশ করেছিলাম। এই সংখ্যা টেস্টের ইতিহাসে অনেকদিন রেকর্ড হয়ে ছিলো। লেওনার্ড (লেন্) হাট্‌ন্ এটা ভাঙেন।

আমার খেলা ভালো হলেও আগের ইনিংসের মতো সন্তোষজনক হয়নি। তবে রান বেশ দ্রুতই উঠেছিলো এবং লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরী হয়েছিলো। এ খেলায় কিন্তু জ্যাকসন মাত্র এক রানে আউট হয়েছিলো।

মিঃ এ. ই. হোয়াইল বলে এক দাতা হঠাৎ একশো পাউণ্ডের একটা চেক পাঠিয়ে বসলেন, লিখলেন—গুণমুগ্ধ হয়ে পাঠাচ্ছেন। আমি ছাড়া আরও কয়েকজনও এই ক্রিকেট-প্রেমীর কাছ থেকে চেক পেয়েছিলো।

খারাপ আবহাওয়ায় ম্যানচেস্টারের চতুর্থ টেস্ট বন্ধ হয়ে গেলো—একপক্ষের মাত্র একটা ইনিংস শেষ হয়েছে তখন। তবু, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের স্লো বোলার ইয়ান পিবল্‌স্ আমার যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দারুণ বল করেছিলো সেদিন ছেলেটা। স্বীকার করতে বাধা নেই—সেদিন ওর বলের গতি ধরতে পারিনি। উডফুল তার একটা বল ছেড়ে দিতে সেটা মাঝের স্টাম্পের ওপর দিয়ে চলে যায়। আর কিপাক্সকে যে তিনটে বল করেছিলো সেগুলো তার প্যাডে লেগে প্রতিবারই এল. বি. ডব্লিউর আবেদন আসে।

পিবল্‌সের যে প্রতিশ্রুতি দেখেছি তা বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করেনি, কারণ পরে শুনেছিলাম ওর কাঁধের একটা ব্যথার জন্যে খেলা ছাড়তে হয়েছে তাকে।

ওভালে পঞ্চম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের ফারাকে জয়লাভ করলো এবং অমীমাংসিত দুটি খেলা ছাড়া দুই-এক খেলায় 'অ্যাসেস্‌' ফিরে পেলো।

আমাদের দল এখন মোটামুটি আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেছে, এবং গ্রিমেট যদিও প্রধান আক্রমণকারীর ভূমিকায়, সতীর্থদের সহযোগিতা অটুট ছিলো। শেষ টেস্টে হর্নিব্রুকের নিরানব্বই রানে সাতটা উইকেট নেওয়া নিঃসন্দেহে অনবদ্য 'স্পিন' বোলিংয়ের নিদর্শন।

ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হলো, ইংল্যাণ্ড পার্সি চ্যাপম্যানকে বসিয়ে বব উইয়াটকে অধিনায়কত্ব দিলো। অস্ট্রেলিয়া এ সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানালো, কারণ এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে তাদের এই পরিবর্তন দলের ওপর অনাস্থার ইঙ্গিত বলেই ধরে নিলাম।

প্রবীণ জ্যাক হব্‌স্‌ তাঁর চূড়ান্ত টেস্টে মাত্র ন রানে অ্যাল্যান ফেয়ার-ফ্যাক্সের বলে উইকেট হারানোতে দুঃখ পেয়েছিলাম। ওঁর কাছে আরও উন্নত মানের খেলা আশা করেছিলাম। কিন্তু, তখন কি জানতাম যে আমার পরের খেলায় রানের যে সংখ্যা তার সঙ্গে নয় যুক্ত হবে হব্‌স্‌য়ের খেলায়!

টেস্টের এই অধ্যায়ের পর গ্লস্টারের সঙ্গে খেলাটা খুবই উত্তেজনাকর হয়েছিলো। শেষ দিন পর্যন্ত চলেছিলো খেলা। খেলায় জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিলো একশো আঠারো রান, আর রান লেখার বোর্ডে উনষাট রানসংখ্যাটি লেখা হলে মনে হলো খেলা বুঝি শেষ হয়ে গেলো, কারণ দ্রুত উইকেট পড়তে শুরু করেছে। শেষ লোক যখন ব্যাট করতে নামলো তখন আর মাত্র দু রান দরকার।

উদ্বেগের অবসান হলো—রানসংখ্যা বরাবর হলো। তারপরের চোদ্দটা বলেও একটা রানও হলো না। হর্নিব্রুকের এল. বি. উব্লিউতে খেলা শেষ হলো—'টাই'য়ে। ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে সেই প্রথম ও শেষ 'টাই'।

সফর শেষ করতে আরও কয়েকটা খেলায় নামতে হয়েছিলো। শেষ খেলা পড়লো স্কারবরোর সঙ্গে আর এইখানেই দেখা পেলাম উইলফ্রেড্ রোডসের। রোডস আমার জন্মের আগে থেকে ক্রিকেট খেলে আসছিলেন।

সফরে আমার ব্যক্তিগত সাফল্য হয়েছিলো আশাতীত। টেস্টের খেলাগুলোয় রানের মোট হলো নশো চুয়াত্তর—এটাও রেকর্ড। এছাড়া সারা সফরের দু হাজার নশো ষাট যা আজও কোনো স্বদেশবাসী ভাঙতে পারেননি।

এসব ছাড়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা আমার কাছে অমূল্য।

এখন বুঝতে পারছি ইংলণ্ডের একটা মরসুম খেলোয়াড়ের কি পরিবর্তন আনতে পারে। মনে কোনো বিদ্বেষ না রেখেই বলতে পারি—খেলোয়াড়ের জীবন অপূর্ণ থেকে যায়, ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তনশীল উইকেটের সামনে যদি সে না দাঁড়াতে পারে কখনো।

তার ওপর আছেন হ্যামণ্ড, হব্‌স্ আর সাটক্লিফের মতো খুঁটিরা একদিকে, অন্যদিকে কিপাক্স, পন্সফোর্ড আর উডফুলের মতো দিকপালেরা। এঁদের সঙ্গে খেলার স্মৃতি আজীবন বহন করবো। জ্যাকসন অসুস্থ হওয়ায় তাঁর দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের মান ম্লান হয়েছে। আমাদের দল আশাতীত সাফল্য দেখিয়েছেন। উডফুলকে দলের অধিনায়ক নির্বাচনে নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কারণ উডফুল তাঁর সতীর্থদের প্রশ্নাতীত আনুগত্য পেয়েছেন।

আমাদের একমাত্র দুর্বলতা ছিলো গ্রিমেটের বোলিংয়ের ওপর সীমাহীন নির্ভরতা, কিন্তু তিনি তা নষ্ট হতে দেননি—প্রমাণ, একশো চুয়াল্লিশটা উইকেট সারা সফরে।

আমার প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরের পরিসমাপ্তি ঘটলো। ইংরেজদের ভদ্রতার তুলনা নেই, পরের সফরগুলোতে প্রমাণ মিলেছে। চোখ জুড়িয়ে দিয়েছে তাদের দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী—আজও মন থেকে দূর হয়নি তা। রাজা পঞ্চম জর্জ আর রাণী মেরীর সঙ্গে স্যাণ্ড্রিংহ্যামে সাক্ষাৎকারের

কথাও কি ভোলা যায়? ওভালে প্রিন্স অফ ওয়েলসের উপস্থিতি; রয়াল অ্যালবার্ট হলে হ্যারল্ড উইলিয়ামসের 'হায়াওয়ারা' গান! ইংল্যাণ্ডে বসে দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি রেডিওফোনে, তার শৈশবাবস্থায়—আর আজ? আকছার কথা হচ্ছে, পৃথিবী কি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে!

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা

ইংল্যাণ্ড সফরের কিছু তিক্ত স্মৃতিও জমা হয়ে আছে আমার মনের মণিকোঠায়। আমার একটা জীবনী প্রকাশিত হয়েছিলো সেই সময়ে। ওখানকার একটা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিলো সেটা। আমাদের কর্মাধ্যক্ষ কিন্তু এটা ভালো চোখে দেখলেন না, তাঁর মতে এটা নাকি আমার অস্ট্রেলীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডেব আইনে বিশ্বাসভঙ্গের দৃষ্টান্ত, খেলোয়াড় হিসেবে।

দুটো কারণে তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি, প্রথমতঃ—বোর্ড ক্ল্যারি গ্রিমেটকে একই ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন, আর, দ্বিতীয়তঃ আমার লেখার পরিষ্কার শর্ত দেওয়া ছিলো—বর্তমান সফরের তথ্য ছাড়া অন্য কোনো কিছু ছাপা চলবে না। অন্ততঃ আমরা অস্ট্রেলিয়া ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত।

হৈচৈ করার মতো কিছুই হয়নি, তবু তিলকে তাল করা হলো। একটা কাগজে খবর বেরোলো: "ডন অ্যালেকজাণ্ডার নেপোলিয়ান ব্র্যাডম্যান বোর্ডের কর্তাদের 'লেগে' মেরেছেন। তাঁদের এঁদো বস্তাপচা আইনকানুন-গুলো ময়লা কাগজের সামিল হয়েছে। ডন এই সফরে যা করার সাহস দেখিয়েছেন তা অন্য কারুর দ্বারা করা সম্ভব ছিলো না। কর্তারা হিক্কে তুলতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের কাছে খবর আছে যে পঞ্চম টেস্ট চলাকালীন ডন লণ্ডনের জনসভায় উপস্থিত থাকার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেও, ওদের অসহায় (!) কর্মাধ্যক্ষ কেলী সাহেবের নির্দেশে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।"

এই মিথ্যে প্রচারে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কারণ বইয়ের

ব্যাপারে ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে আমার লিখিত স্বীকৃতি ছিলো না। জল এতদূর গড়ালো যে সভাপতিকে জনসমক্ষে একটা বিবৃতিও দিতে হলো, তিনি জানালেন: "প্রকাশিত তথ্যগুলো আগাগোড়া অশোভন এবং দেখেশুনে মনে হচ্ছে কিছুসংখ্যক দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ ক্রিকেট জগতে একটা দ্বন্দ্ব আর অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় তৎপর।"

এখানেই কিন্তু ঘটনার ইতি হলো না,—জাহাজের বেতার মারফত নির্দেশ এলো, জাহাজ ছেড়ে প্লেন ধরতে হবে। নির্দেশ অমান্য করার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। প্লেনে এডিলেড থেকে মেলবোর্ন এলাম। পাইলট ছিলেন শর্টরিজ, সংক্ষেপে যাঁকে 'শর্টি' ডাকা হতো।

শর্টির জীবনও বিয়োগান্তক—কিছুদিন পরে সিডনি থেকে মেলবোর্নের পথে আরোহীসমেত তাঁর প্লেন নিখোঁজ হলো। ওঁদের খোঁজ আর পাওয়াই যায়নি! অস্ট্রেলিয়ার অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থায় এ ধরনের দুর্ঘটনা বিরল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—তাড়াতাড়ি তো ফেরা গেলো, সময়ের আগেই—অবাঞ্ছিত প্রচারের ঝোলা কাঁধে। এর মধ্যে আর একটা কেচ্ছা হলো—জেনারাল মোটরস্ থেকে আমাকে একটা গাড়ি উপহার দিয়ে বসলো, ফলে জল আরও ঘোলা হলো। অনেকেই ভাবলেন ফোকটে নাম করতে চাইছি। এতে মানসিক পীড়া বাড়লো। তার ওপর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া সফরের আমন্ত্রণ এসে গেছে।

শর্ত খেলাপের দায়ে নিয়ন্ত্রণ বোর্ড আমার ভাগের টাকা থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড কেটে নিলেন, মূল টাকার এক-তৃতীয়াংশ। ওঁরা বোঝাতে চাইলেন যে যেহেতু খেলাপের ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয় তাই এই লঘুদণ্ড।

শেফিল্ড শীল্ডে ছটা ইনিংস খেলেছিলাম, তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুশো পঁচাশি মিনিটে দুশো আটান্ন রান হয়েছে। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দুশো কুড়ি করেছিলাম, জুটি ছিলেন ওয়েভেল-বিল। দুজনে একশো পঁয়ত্রিশ মিনিটে দুশো চৌত্রিশ রান করেছিলাম। শেফিল্ড শীল্ডের পঞ্চম বিশ্ব রেকর্ড। খেলায় জিতেছিলাম আমরা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলায় আমার খেলা সব সময়ে এক ছিলো না,

সত্যি বলতে কি—গোটা অস্ট্রেলীয় দলের একই অবস্থা। ইংল্যাণ্ড সফরের পরই বোধ হয় সব প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের এই অবস্থা হয়। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার দল অনেক বেশি শক্তিশালী। তবু একটা ক্ষেত্রে ছাড়া 'আঠালো' উইকেটের শিকার হয়েছি সর্বত্র।

এই পর্যায়ের তৃতীয় খেলায় আমার রান উঠলো দুশো তেইশ আর চতুর্থটায় একশো বাহান্ন, শেষ খেলায় শূন্য। টেস্ট ক্রিকেটে এই প্রথম। এই খেলায় ফাস্ট বোলার গ্রিফিথের একটা বল, আস্তেই এসেছিলো সেটা—মারতে গেলাম 'লেগে'। বলটা মারতেই পারিনি সেদিন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সে খেলায় জিতলেও আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে তখনো অনেক দেরী তাদের।

ওদের সেরা ব্যাট ছিলো জর্জ হেডলে। ছোট্ট মানুষটা—যে কোনো অবস্থায় নিজস্ব ভঙ্গিতে খেলতে পারে এমন একজন খেলোয়াড়। তরুণ ব্যাট সিলিও প্রতিশ্রুতির আভাস দিলো, তবু খেলা আরও অনেক অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। এছাড়া কনস্ট্যাণ্টাইনও কিছু ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলো, তাও টেস্টের খেলাগুলোতে নয়। গড় ছিলো দশটা ইনিংসে বাহাত্তর রান। মোট কথা ওদের ব্যাটিং দুর্বল, ফিল্ডিংয়ের কথা না বলাই ভালো।

ভালো স্পিন বোলারের ঘাটতি থাকলেও গ্রিফিথ, ফ্র্যানসিস্ আর কনস্ট্যাণ্টাইনের মতো ফাস্ট বোলার ওদের টেস্ট ক্রিকেটের মান বজায় রেখেছিলো।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াতেও কনস্ট্যাণ্টাইন খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ডসম্যানের পর্যায়ে ফেলা যায় তাকে নির্দ্বিধায়। গ্রেগরীর স্লিপের কাজ হয়তো তার চেয়ে ভালো, পার্সি চ্যাপম্যান উইকেটের কোনো কোনো বিশেষ জায়গায় ওর চেয়ে পাকা কাজ করতেন, কিন্তু কনস্ট্যাণ্টাইনের ক্ষিপ্রতা আর পূর্বানুমানের ক্ষমতা যে কোনো পর্যায়ে বিপদ ডেকে আনতো। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের খেলায় তার নাম সবার ওপরে থাকতো কেন অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কারণ ওই সব খেলার নিষ্পত্তি হতো এক এক বেলাতেই। বল দেওয়ার প্রচণ্ডতায়

পনেরো মিনিটের মধ্যে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো এই খেলোয়াড়টি।

প্রথম শ্রেণীর মরসুমের শেষে সেবার অ্যালান কিপাক্সের অধিনায়কত্বে উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডে খেলতে গেলাম। এ ধরনের সফরগুলো মোটামুটি নিয়মিতই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো এবং ক্রিকেটের উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়কও হয়েছিলো।

সিডনি থেকে নৌকোয় করে টাউন্সভিল যাওয়ার পথে বিশ্বের অন্যতম দ্রষ্টব্য 'গ্রেট বেরিয়ার রিফ' হয়ে যেতে হলো। উত্তর কুইন্সল্যাণ্ডের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত, স্বচক্ষে উপলব্ধির বস্তু। চারদিকে উর্বর সবুজের বিস্তার, গাছের সীমাহীন সম্পদ, বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, তবু ঘন বসতি নেই কেন সেটাই বিস্ময়ের! টাউন্সভিলে কিছু ভালো খেলোয়াড়ের সন্ধান মিললো, কিন্তু তারা কোনো দলের বিপর্যয় ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হলো।

রকহ্যাম্পটনে যখন আমরা পৌঁছলাম, আমার রানের সমষ্টি তখন ছশো পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে, তেত্রিশটা উইকেটও নেওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু অঘটন ঘটলো—একজন ব্যাটসম্যানকে আউট করতে গিয়ে পায়ে চোট লাগলো। রকহ্যাম্পটনের হাসপাতালে আঠারো দিন পড়ে থাকতে হয়েছিলো। তারপর চোট পুরোপুরি সারতে আরও কয়েক সপ্তাহ লাগলো।

পা কমজোরীই থেকে গেলো, তারপর উনিশশো আটত্রিশের ওভালে চোট বাড়লো এবং শেষ খেলার আগে আরও একবার লাগলো।

ফলে সফরের অনেকগুলো ভালো খেলা প্রত্যক্ষ করা হলো না—যেমন গিমপিতে স্ট্যান ম্যাক্ক্যাবের একশো তিয়াত্তর—তার মধ্যে আঠারোটা ছক্কা।

যাই হোক এক ধরনের বিশ্রাম নেওয়া হলো জোর করেই—এমনিতে তো নিতাম না।

উনিশশো একত্রিশ-বত্রিশের মরসুম শুরু হবার আগে আর একটা ব্যাপারে আমার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হতে বসেছিলো, কারণটা অন্য পাঁচটা দেশের মতোই অস্ট্রেলিয়াতেও অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলো। বাণিজ্যের জগতে অনিশ্চয়তার ছায়া পড়লো। চাকরিতেও মন বসছিলো না, যেহেতু ক্রিকেটের সাফল্যের ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

কনস্ট্যান্টাইন ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলার জন্যে আমার নাম সুপারিশ করলেন—এবং একত্রিশ সালের অগাস্ট থেকে অ্যাক্রিংটন ক্লাবের হয়ে খেলার আমন্ত্রণ পেলাম। আমার বাইরে যাবার কোনো অভিপ্রায় নেই একথা সবাইকে জানিয়ে দিলাম। তবুও, গুঞ্জন উঠলো চারদিকে। আবারও কাগজের শিরোনাম হলাম—বাদানুবাদ চলতে লাগলো।

ফেডারাল পার্লামেন্টের এক সদস্য লিখলেন, 'প্রিয় বন্ধু, আপনাকে নিয়ে যে সমালোচনা হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। অস্ট্রেলিয়ার অনেক প্রবীণ আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বার্ধক্যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এমন কি খেলা দেখার জন্যেও ওঁদের পয়সা খরচ করতে হয়। এই অবস্থায় আমার এই সাতাত্তর বছরের সুদীর্ঘ জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তা থেকে বলতে পারি, আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই ভালো।'

আর একদিকে, ডঃ এভাট বলে এক ভদ্রলোক সুন্দর এক চিঠিতে জানালেন, 'তাঁর আশা আমি অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে কোথাও যাবো না।'

আর একটা মজার চিঠি পেলাম এক প্রবীণার, 'স্নেহের বাছা, বুড়ির কথা শোনো—সময় থাকতে গুছিয়ে নাও সব। কোনো বিত্তশালিনীকে ঘরণী করো—তোমার রেকর্ড আর সুন্দর মুখ এতে সাহায্য করবে।'

বৃদ্ধার সঙ্গে একমত হতে পারিনি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো বিত্তশালিনীই আমার রেকর্ড সম্পর্কে আগ্রহী নন, চেহারার তো নয়ই।

আমি মনস্থির করার আগেই এক কাগজে আবার লিখে বসলো—

'আমাদের সকলকে জানিয়ে দেবার সময় এসেছে, ব্র্যাডম্যান বাইরে যাবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন।'

এই সুযোগে একটা কথা জানিয়ে রাখি—পরে তিরিশ সালে অস্ট্রেলীয় দলের সদস্য অ্যালান ফেয়ারফ্যাক্স যখন বাইরে খেলার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন, তখন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি।

আমি শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে গেলাম।

চাকরির ব্যাপারে তিনটে বড় কোম্পানী থেকে যুগ্ম সুযোগ এলো এবং তার শর্তাদি পর্যাপ্ত বলেই মনে হলো আমার। ক্রিকেটের বড় খেলাগুলোর পক্ষেও যথেষ্ট। তারপর, চুক্তির ব্যাপারটাও অনেক পরে অসুবিধেজনক মনে হয়েছে, আগে যা বোঝা যায়নি, এবং আর্থিক অসুবিধেই প্রধানতঃ।

অস্ট্রেলিয়ার অনেক খেলোয়াড়ই বাইরে চলে গেলো ক্রমে ক্রমে। এই লেখা যখন লিখতে বসেছি তখন কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী দল গঠিত হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের স্বদেশে মর্যাদার সঙ্গে থাকার প্রশ্নের জবাব কবে পাওয়া যাবে?

অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়াতে ক্রিকেটকে পেশাদারবৃত্তি সমর্থন করা সম্ভব ছিলো না।

আন্তর্জাতিক সফরগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যার জটিলতাই বাড়াচ্ছে। লীগে পেশাদার খেলোয়াড়দের আয়ের সুযোগ বেড়েছে—উঁচু তলায় ওঠার এ হাতছানি এড়ানো কঠিন।

একত্রিশ-বত্রিশের খেলাগুলো শুরু হবার আগে আমি অ্যালান কিপাক্সের দলে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিভিন্ন সফরে অংশ নিয়েছিলাম। অনেক জায়গা ঘোরা হলো, সব নাম মনে পড়ে না—লিথগো, পার্কস, ফরবেস, গ্রিনফেল, ইয়াং, মারামবুরা, ওয়াগা, টুমুট, গুণ্ডানাই, ইয়াস—এই সমস্ত ছিলো।

সব জায়গাতেই কিছু কিছু নতুন মুখের সন্ধান মিলেছে।

পার্কসে কিপাক্স একটা বিশ্রী রকমের আঘাত পেলো—বল লাফিয়ে ওর নাকে এসে লাগলো। নাক ভেঙে গেলো। বৃষ্টির জন্যে ম্যাচ

ব্যবহার করা হয়েছিল, তলায় একটা বড় কাঁটা পাওয়া গেলো। পরে ব্রিসবেনের একটা দুর্ঘটনার পর থেকে কিপাক্সের দ্রুত বলের ভয় বেড়ে গেলো।

কিপাক্স, যে এককালে 'হুক' মারের যম ছিলো, তার এই দুরবস্থা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক।

এরপর র‍্যাণ্ডউইকের বিরুদ্ধে একটা বড় খেলায় দুশো ছেচল্লিশ করেছিলাম, দুশো পাঁচ মিনিটে। তারপর গর্ডনে দুশো এক, সময় নিয়েছিলাম একশো একাত্তর মিনিট। শেষের খেলায় বিপক্ষে ছিলেন কেলেওয়ে, ম্যাকার্টনি ও ক্যাম্পবেলের মতো ঝানু খেলোয়াড়রা, তবু সেঞ্চুরী হয়েছিলো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। একথাটা মনে আছে এজন্যে যে আধ-তোল্লাই বলে একটা ছক্কা মেরেছিলাম এবং একজন ফিল্ডসম্যান সেটাকে আনতাবড়ি মার বলে উড়িয়ে দেওয়ায় আর একবার মেরে দেখিয়েছিলাম, অবশ্য ক্যাটসউডের মাঠটা ছোট ছিলো বলেই সম্ভব হয়েছিলো এটা।

আমার রানগুলো কিন্তু এলোমেলো উঠেছিলো—শূন্য হলো, তারপর তেইশ, মাঝখানে একশো সাতষট্টি, তারপর আবার তেইশ ও শেষে শূন্য।

ব্রিসবেনের অবিস্মরণীয় খেলাগুলোর একটাতে প্রথম 'শূন্যে'র ব্যাপারটা ঘটেছিলো। গিলবার্ট সে খেলায় বারো রানে তিনটে উইকেট নিয়েছিলো প্রচণ্ড গতিতে বল দিয়ে। 'গতি' এজন্যে বলছি যে চার পা দৌড়ে বল দিয়েছিলো গিলবার্ট, আর তাতেই আমার হাত থেকে ব্যাট পড়ে গিয়েছিলো।

কিপাক্সের দুর্ঘটনাটা ঘটলো এরপরেই—থারলো একটা বল হুক করতে গিয়ে বলটা ব্যাটে লাগার আগেই হাঁকড়েছিলো কিপাক্স, ফলে মাথার একপাশে প্রচণ্ড বাড়ি লাগলো।

ক্রিকেট থেকে তার অবসর গ্রহণের ব্যাপারটা ত্বরান্বিত হলো এতে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি হলাম। এঁরাও পূর্বসূরী ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মতোই অস্ট্রেলিয়ার সমকক্ষ হবার কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না। তবু, মানুষগুলো অদ্ভুত সরল এবং অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। দলে

কিছু ভালো খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও পাঁচটা টেস্টের একটাও জিততে পারেননি। সারা টেস্টে আমার মোট রান হলো যথাক্রমে ছশো আশি, একশো বারো, দুই, একশো সাতষট্টি আর ছশো নিরানব্বই।

শেষ টেস্টে আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিলো—গ্রিমেট আর আমি দুজনই অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেললেও, সে বল করেনি এবং আমি ব্যাট করিনি। এর মধ্যে আর এক কাণ্ড হলো—সাজবদলের ঘরে একটা টেবিল থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে গোড়ালিতে চোট পেলাম, তাই ব্যাট করতে পারিনি। গ্রিমেটের বল করার দরকারই হলো না। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে করলো ছত্রিশ এবং পরেরটায় পঁয়তাল্লিশ।

আইরনমংগার তেইশ ওভার বল করে চব্বিশ রানে সবকটা উইকেট নিলো। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ব্যাটসম্যানের নাম না করলে তার ওপর অবিচার করা হয়—সে হচ্ছে জিম ক্রিস্টি। ওদের হার্বি টেলারও তাঁর পুরনো খেলার কিছু ইঙ্গিত দিলেন। ওদের অধিনায়ক উইকেটরক্ষক এইচ. বি. ক্যামেরনের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করি আজও। তাঁর অকাল মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে কারণ তিনটি দুর্লভ গুণের সমাবেশ ঘটেছিলো—ব্যাটিং, পাকা হাতের উইকেটরক্ষণ আর অধিনায়কোচিত ধূর্ততা। এলোপাথাড়ি মারের প্রবণতা ছিলো ক্যামেরনের। এছাড়া উইকেটরক্ষণের মানও সময়ে সময়ে স্বীকৃত পর্যায়ে পৌঁছয়নি, তবু এ দুটোতে এক-একসময় অপ্রতিরোধ্য মনে হতো তাঁকে।

ওদের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হয়েছিলো মিডিয়াম-পেস ঋ্যাটা নেভিল কুইনকে নিয়ে। মরিস টেটের পর এরকম দ্রুতগতিসম্পন্ন বোলার আমার নজরে আসেনি। ওদের আর একজন পরিশ্রমী বোলার—ম্যাণ্ডি বিল। ওর একটা বল ঠেঙাতে গিয়ে স্টাম্পে লাগিয়ে বসেছিলো, এবং সে-সময় ওর চোখমুখে যে বিস্ময় লক্ষ্য করেছি তা আজও ভাসছে আমার চোখে।

ম্যাকমিলানকে প্রথম শ্রেণীর স্লো বোলার আখ্যায়িত করা হলেও, গ্রিমের্টের ওপর ভরসা ছিলো চিরকালীন। কিন্তু বার্ট আইরনমংগারের নশো সাতষট্টির বিনিময়ে একত্রিশটা উইকেট নেওয়ার আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা বাদ দিলে চলবে না। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় দলে কেন তাঁকে

নেওয়া হলো না এটা আজও রহস্য আমার কাছে। জানা গেলো 'নো' বলের আধিক্যই নাকি এর কারণ—এটা অত্যন্ত ছেঁদো যুক্তি মনে হয়েছে আমার। কারণ অস্ট্রেলীয় আম্পায়ারদের ছাড়পত্র মিললো কি করে তাহলে! তার 'স্পিন' হয়তো গতানুগতিক প্রথায় হতো না, তাহলেও শুধু সেজন্যেই তাকে বাতিল করা ঠিক হয়নি।

'ও'রিলী সে বছরই প্রথম পাদপ্রদীপের সামনে এলো এবং শেষ টেস্টে দুটো মোটামুটি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলো। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলাগুলো অস্ট্রেলিয়াকে হুঁশিয়ার করে দিলো। কুইন্সল্যাণ্ডের একটা কাগজ অদ্ভুত খবর পরিবেশন করলো : আফ্রিকানরা এক ভূতের সঙ্গে খেলছে! বিস্তারিত খবরটা এই রকম : "পরলোকে ডন ব্র্যাড্‌ম্যান। অস্ট্রেলিয়া আজ বিশ্বের সেবা ব্যাটসম্যানের শোকে মুহ্যমান! ব্রিসবেনের টেস্টে (অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা) ডন ব্র্যাড্‌ম্যান হঠাৎ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার মারা যান।"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে একটা প্রচারহীন কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিলো। এ থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে—অনেক আজগুবি খবরও আমাদের অজ্ঞাতসারে ছাপা হয়।

যাক। জনগণের বিচারে সেটাই ছিলো আমার শ্রেষ্ঠ মরসুম। আমার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের একটা বোঝাপড়া হলো, এবং সেই সঙ্গে শীতে বিশ্রাম নেওয়াতে মনের শান্তি ফিরে এলো। গরম পড়তে নতুন উদ্যম নিয়ে মাঠে ফিরে এলাম। মরসুমের অধ্যায়ে দাঁড়ি টানার আগে নিউ সাঁউথ ওয়েলসের ব্ল্যাকহিলের একটা ঘটনার কথা বলতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ের প্রতিপক্ষ দলটি ছিলো লিথগো একাদশ। সে খেলায় আমার দুশো ছাপান্ন ছিলো—তার মধ্যে চোদ্দটা ছক্কা আর উনত্রিশটা চার। ওয়েণ্ডেল-বিলের সঙ্গে জুটিতে ব্যাট করার সময় একশো দু রানের একশো আমিই করেছিলাম, তিনটে ওভারে। স্কোরটা ভেঙে লিখলাম :

প্রথম ওভার	:	৬, ৬, ৪, ২, ৪, ৪, ৬, ১
দ্বিতীয় ,,	:	৬, ৪, ৪, ৬, ৬, ৪, ৬, ৪
তৃতীয় ,,	:	১, ৬, ৬, ১, ১, ৪, ৪, ৬

তিন ওভারে বিলের ছটো রান তৃতীয় ওভারের প্রথম ও পঞ্চম বলে। কেইর্নসের অধিবাসীদের মতে ওখানে সবচেয়ে কম সময়ে সেঞ্চুরী হয়েছিলো উনিশশো দশে—লরি কুইন্সম্যান করেছিলেন। সময় লেগেছিলো আঠারো মিনিট। ব্ল্যাকহিলে অবশ্য আমার সময় নেওয়া হয়নি, তবু—আমার ধারণা ওই সময়ও লাগেনি আমার।

ওদের বব নিকলসন বলে একজন বোলার ভাল গান করতো। উনিশশো বত্রিশে আমার বিয়েতে বব নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলো। আমার স্ত্রী পরে রসিকতা করে মন্তব্য করেছিলেন যে বিয়ের অনুষ্ঠানের চেয়ে ওর গানের ব্যাপারটাতেই নাকি অভ্যাগতদের বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছিলো।

আমার দ্বৈত জীবন শুরু হলো। উল্লেখযোগ্য—ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যানন হিউজেস আমাদের বিবাহে পৌরোহিত্য করার জন্যে মেলবোর্ন থেকে সিডনি এসেছিলেন। আগামী কঠিন দিনগুলোতে আমার স্ত্রীর অভ্রান্ত বিচারবোধ ও বিচক্ষণ পরামর্শ আমার কাছে অমূল্য বলে মনে হয়েছে।

অ্যামেরিকা : উনিশশো বত্রিশ

ক্রিকেট জগতে আর্থার মেইলির পরিচয় তার বলের কায়দার জন্যে। কিন্তু তার খেয়ালী হাসিটুকুর আড়ালে ছিলো চরিত্রের আর এক দিক, সেটা হচ্ছে তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয়তা আর খেলায় জনপ্রিয়তা বাড়ানোর প্রচেষ্টা, যেখানে যখন সম্ভব। ফলশ্রুতি, মেইলি বত্রিশে ক্যানাডা আর অ্যামেরিকা সফর পাকা করে ফেললো। কিঞ্চিৎ দৌড়োদৌড়ির পর ক্যানেডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ের সৌজন্যে তার সফরের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে চললো।

মেইলি কিন্তু আগেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়েছিলো—আমি সফরে যেতে রাজি না হলে দলের জন্যে অর্থসংগ্রহ সুসাধ্য হবে না।

তাহলে? আমার যাওয়া উচিত হবে কি? হঠাৎ কিছু সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ার কাজের কথাটাও ভাবতে হলো, তার ওপর

রয়েছেন অর্ধাঙ্গিনী। তিনি বললেন, রাজি হও—তবে আমরা দুজনই যাবো। অ্যামেরিকা দেখার লোভ সংবরণ করা কঠিন। তবু, আমাদের একসঙ্গে যাওয়ার শর্তও মেনে নিলো সংস্থা। এবং যেহেতু আমাদের সফর বেসরকারী, নিয়ন্ত্রণ বোর্ডও কোনো বাধা দিলো না। দল গঠন করা হলো টেস্ট আর রাজ্য পর্যায়ের কিছু ছেলে নিয়ে। এঁদের অনেকেই আবার প্রথম শ্রেণীভুক্ত নন।

অর্থসংকট কাটাতে তরুণ খেলোয়াড়দের অনেককেই নিজের খরচা দিতে হলো। আমাদের দু-চারজনের ভাড়া ও ভাতা যোগাড় হলো। ক্রিকেট সফর মানেই টাকা—অনেক টাকা, এবং দর্শক-সংখ্যা যেখানে নগণ্য সেখানে কাউকে না কাউকে বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার দায়িত্ব নিতে হয়।

উনিশশো বত্রিশের ছাব্বিশে মে, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় আমরা এস. এস. 'নায়েগ্রা' জাহাজে চড়ে বসলাম। তখন কি একবারও ভেবেছি যে এই প্রবীণ জাহাজটি পরের বিশ্বযুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে সলিল সমাধি লাভ করবে আর ডুবুরিদের কাজ বাড়াবে? জাহাজের খোলে অনেক সোনা ছিলো। অবশ্য বত্রিশের যাত্রায় 'নায়েগ্রা'য় সোনা ছিলো না। থাকলেও জানা হতো না। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়েই জাহাজে উঠেছিলাম এবং অকল্যাণ্ডে জাহাজ নোঙর করা পর্যন্ত ক্যাবিনের বাইরে পা দিইনি। শহরে অল্প সময় কাটিয়ে আমরা ফিজি দ্বীপের সুভা বন্দরে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের সাদর সম্বর্ধনা জানালো স্থানীয় মানুষ। সুভাতে যে খেলা হবার কথা ছিলো তা বাতিল হলো, বৃষ্টির জন্যে। কিন্তু খেলা না হলেও কিংসফোর্ড-স্মিথ যে মাঠে তাঁর বিস্ময়কর উড়োজাহাজটি নামিয়েছিলেন সেটা তো দেখা হলো। ব্যাপারটা যে সত্যি বিস্ময়ের তা যে কোনো আনাড়ীও বুঝবে।

ঘোরাও হলো। সারা দ্বীপ ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। দলের কয়েকজন ছোকরা দিশী পানীয় 'কাভা'র আস্বাদও নিলো। দেখতে কফির মতো, কিন্তু জানলাম (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয় কিন্তু।) পানীয়ের প্রতিক্রিয়া খুব মধুর নয়।

বিকেলে ওদের খালি পায়ে রাগবি খেলা দেখলাম, পা চালানোর বহর

দেখে মনে হলো খেলাটা ফুটবলে রূপান্তরিত হলে মানাতো বেশি। এরপর ওদের ফাস্ট বোলার ছ ফুট তিন ইঞ্চির এডওয়ার্ড-থাকারোর খপ্পরে পড়লাম। লোকটা আবার এক সেপাইকে দেহরক্ষী করে নিয়ে এসেছে।

ফিজির মানুষের ধারণা, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের চেহারা দশাসই হওয়া দরকার। মজা পেলাম যখন এডওয়ার্ড আমার হাতের পেশী টিপে অনুভব করতে লাগলো, পরে আবার নিজেরটাও দেখালো। ওদের রাপু পোপের সঙ্গেও দেখা হলো—ইনি অনেকদিন আগে ফিজির এক ক্রিকেট দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলেন। আমাদের পরের বন্দর হনলুলু, মার্কিন শাসিত। ছেড়ে এগিয়ে ভিক্টোরিয়া—তারিখটা জুনের ষোলোই।

বিশ্রী ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উষ্ণ স্বাগত জানাতে এলেন ক্রিকেটের কর্মকর্তারা। বন্দরে জাহাজ ভিড়তে রাত নটা বেজে গেলো, ওদিকে পরদিন সকালেই খেলা।

এ যাত্রায় আর আবহাওয়ার সঙ্গে মিতালি হলো না আমাদের। কাউইচ্যানের মাঠটা সুন্দর, চারপাশ গাছে ঘেরা। আঠারোজনে খেলে একশো চুরানব্বই করলো ওরা, জবাবে আমরা আট উইকেটে পাঁচশো তিন। আমাদের অধিনায়ক ভিক রিচার্ডসন আর আমাতে সাত মিনিটে পঞ্চাশ রান তুলেছিলাম। এদিকে স্ট্যান ম্যাক্‌ক্যাব এমন জোরে এক বল পেটালো যে সেটা এক মহিলা দর্শকের পায়ের ওপর পড়লো, হাড় ভেঙে গেলো পায়ের। মহিলাটি আবার প্রতিপক্ষ দলের এক খেলোয়াড়ের স্ত্রী। সারাদিনে আশেপাশের ঝোপে ছটো বল নিখোঁজ হলো। ফলে, একসময়ে চারটে বল দিয়ে খেলা চলতে লাগলো, পাছে ঝোপে বল খুঁজতে সময় যায়। সেই রাতেই এক ভোজসভায় যোগ দেবার কথা, কিন্তু খেলাশেষে অনেকের জামাকাপড় খুঁজে পাওয়া গেলো না—হাতে সময়ও নেই, কারুর জুতো আছে, জামা নেই, কারুর বা জামা আছে, জুতো নিরুদ্দেশ। স্থানীয় লোকদের কাছে বিস্তর জামাকাপড় 'ধার' করা হলো, তাদের হাসির খোরাকও হলো ব্যাপারটা।

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে পরের খেলায় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো—এক ওভারে (আট বলের) ছটা উইকেট নিয়েছিলাম। পাততাড়ি গোটাতে

হলো এখান থেকে—এবারের গন্তব্য ভ্যানকুভার। সেখানকার ব্রকটন পয়েন্টের মাঠে খেলা। এই মাঠ সম্পর্কে আমার একটাই বক্তব্য—এর তুলনা বিরল—শুধুমাত্র পটভূমিকার জন্যে। প্যাভেলিয়ানে ডেক-চেয়ার নিয়ে বসে পেছনে চোখ মেলে দিন—সারি সারি তুষারমণ্ডিত পাহাড়, গাছের সমারোহ মাঠ ঘিরে, আরও পেছনে তাকান অট্টালিকার প্রাচুর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে শহর। ফিল্ডিংয়ের পক্ষে আদর্শ মাঠ, ব্যতিক্রম শুধু একটাই, ম্যাটিং নারকোল ছোবড়ার।

তিনদিন খেলা চললো—দিনের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে খেলা। দ্বিতীয় দিনে উত্তেজনা চরমে উঠলো—স্থানীয় দলটি প্রথম ইনিংসেই আঠারো রানে আমাদের হারিয়ে দিলো। পরের খেলাতে আর্থার মেইলি একটা চালাকি করলো—ওদের এক 'তাড়ু' ব্যাটকে প্রস্তাব দিলো—ছক্কা মারতে পারলে সিগার পাবে সে। মার হলো—সিগারও দেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে। আবার সিগারের প্রস্তাব দেওয়া হলো—এবার আর মার হলো না, স্কোর বোর্ডে নাম উঠলো তার। মেইলিরও, কারণ তার বলেই ক্যাচ উঠলো।

ভ্যানকুভার ছাড়তে কষ্ট হচ্ছিলো, কিন্তু পথে ক্যানেডিও পাহাড়ের সারির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার সৌন্দর্যে ডুব দিয়েছি, মাইলের পর মাইল জুড়ে 'ফার' গাছের বিস্তার, দ্রুত প্রবহমান ছোট্ট নদীর কল্লোল আর পাহাড়ী ঝর্ণার ঝিরঝির শব্দ যেন আমাদের এক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেলো।

পূবদেশের এই যাত্রায় সঙ্গী ছিলো বেনী। আমার মাল বইতে পারার আনন্দে উচ্ছ্বসিত সে, যদিও জানে না ক্রিকেট খেলাটা আদতে কি! ওর আগ্রহ শুধু একটা মানুষকে ঘিরে—'মাসা ডন'। আমাকে ওই নামেই ডাকতো সে।

উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর পেরোতে সাড়ে তিনদিন লেগেছে, ক্লান্তিকর যাত্রা, কিন্তু মজাও ছিলো। টরোন্টো পৌঁছলাম যাত্রাশেষে। এখানকার গম-বোনা মাঠগুলো আমাদের নিউ সাউথ ওয়েলসের পশ্চিমাংশের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমাদের সফরের সময়ে টরোন্টো মার্কিন ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। 'ঝাঁকি' বলের রাজা বার্ট কিং ফিলাডেলফিয়া থেকেই খেলতে এসেছিলো।

সে সময়ে ফিলাডেলফিয়া তবু কোনোরকমে একটা পূর্ণাঙ্গ দল পাঠাতে পেরেছিলো ইংল্যাণ্ড সফরে, কিন্তু আজ? ওদের ক্রিকেটের মাঠগুলো সব টেনিসের কোর্ট বনে গেছে।

টরোণ্টোর আর্মার হাইট্‌স মাঠে একটা দারুণ ক্লাবঘর ছিলো, সদস্যদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদার আশ্বাসও সেখানে ছিলো। টেনিস কোর্টের লাগোয়া প্যাভিলিয়ানে নাচের আসর। পরে জেনেছি আশেপাশের জমিও ক্লাবের দখলে ছিলো এবং তার ওপর গৃহনির্মাণের প্রয়োজনে নির্দেশ আসতো ক্লাব থেকেই, উদ্দেশ্য: মাঠের সৌন্দর্য অবিকৃত রাখা।

টরোণ্টোয় তিন-চারটে খেলা হয়েছিলো। বিপক্ষ দলের মান মোটামুটি। এঁদের অনেকেই পরে ক্যানাডার জাতীয় দলের হয়ে ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন।

এই পরিচ্ছন্ন শহরের স্মৃতি আজও বহন করছি।

আমাদের এক সম্বর্ধনা সভায় অবিস্মরণীয় ভাষণ দিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারক স্যর উইলিয়াম মুলক। স্যর মুলককে ওদের লোকে 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান' আখ্যায় ভূষিত করেছিলো।

টরোণ্টোর পরে গুয়েলফের একটা খেলায় পশ্চিম অণ্টারিওর একটা দল আঠারোজনে খেলে অষ্টআশি করতে পেরেছিলো মাত্র। ম্যাক্‌ক্যাব তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলো তেত্রিশ রানে আঠারোটা উইকেট নিয়ে। আমাদের চারশো উনসত্তরে সাতটা উইকেট পড়েছিলো, এর মধ্যে আমার ছিলো দুশো আট। ক্যানাডার মাটিতে আমার সর্বোচ্চ রান। রিড্‌লে কলেজের সঙ্গে পরের দিন খেলা—প্রাক্তন আর বর্তমান সম্মিলিত দলের সঙ্গে এই খেলায় ওদের 'স্ফুলিঙ্গ' বেল অপরাজিত থেকে একশো নয় করলো। সফরে আমাদের বিপক্ষে প্রথম ও শেষ সেঞ্চুরী।

সফরের এই অংশেই 'নায়গ্রা ফলস্‌' দেখলাম সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে। রঙীন আলোকমালায় সজ্জিত বিশ্বের এক অনন্য দ্রষ্টব্য এই জায়গা। রিড্‌লেতে ক্রিকেটের উদ্দীপনা থাকলেও মণ্ট্রিলে কিন্তু এর উল্টো চিত্র পেলাম। তিনদিনে তিনটি খেলা হয়েছিলো সেখানে। সেই সময়ে একটা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলাম—ক্যানাডায় বসবাসকারী ফরাসীদের মধ্যে

ক্রিকেট সম্পর্কে কোনো আগ্রহ ছিলো না। বেস-বলের দিকেই আগ্রহ বেশি।

ক্লিটউড-স্মিথ চোদ্দ রানে আট উইকেট নিলো এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ওদের সাহায্যে এগিয়ে না এলে ভরাডুবি হতে পারতো। কিন্তু তারাও পরের খেলায় সুবিধে করতে পারলো না। অটোয়ার একটা দলে ষোলোজন খেললো, তবু তাতেও স্মিথ নটা উইকেট ফেল্লো সাত রানে। খেলাটা রাজ্যপালভবনের (রিডা হল) মাঠে হয়েছিলো। সেবারকার মতো ক্যানাডা থেকে নিউ ইয়র্ক গেলাম আমরা। সেখানেও ওই একই অবস্থা—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরাই দল টিঁকিয়ে রেখেছে। ইনিসফেল পার্কের মাঠে ওদের খেলাটা খারাপ হয়নি।

খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে তো বসে গেলাম 'শূন্যে'। যে আউট করেছিলো তার উল্লাস দেখে কে। দর্শকদের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে টুপিতে পয়সা তুলতে লাগলো। একটা বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটলো এই খেলায়, অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা উইকেটরক্ষক স্যামি কার্টারের চোখে বল লাগে—চোখটা নষ্ট হয়ে যায় তার। বলটা ছিলো ম্যাক্ক্যাবের, প্রচণ্ড গতিতে ছুটেছিলো সেটা—এবং শেষমুহূর্তে ব্যাটসম্যান বলটি ছেড়ে দেওয়ায় সোজা কার্টারের চোখে এসে লাগে।

নিউ ইয়র্কে পরে ইংরেজদের গঠিত একটা দলের সঙ্গে খেলতে হলো—দ্বীপের নামটা যতদূর মনে পড়ছে, স্ট্যাটেন। এরাও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারলো না।

নিউ ইয়র্ক সম্পর্কে আর একটা কথা বলি, সেখানকার রাস্তা দিয়ে নির্দ্বিধায় হেঁটে গেছি—অটোগ্রাফের খাতা হাতে কেউ রাস্তা আটকায়নি।

মনে রাখার মতো অন্যান্য দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের কথাই মনে পড়ছে। একশো দু-তলা বিশিষ্ট এই বাড়িটা আশি হাজার মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে এ কথা অস্ট্রেলীয়দের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তেষট্টিটা লিফটে মানুষ ওঠানামা করছে, এছাড়া চারটে লিফট রয়েছে শুধু মালপত্র বহন করার জন্যে।

ষাট হাজার টন ইস্পাত লেগেছে এতে—বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়

উনিশশো তিরিশের মার্চ মাসে এবং ছ' মাসের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়।

আজকের ইমারত কারিগরদের কাছে এটা নিঃসন্দেহেই উদ্বেগের কারণ।

নিউ ইয়র্কের ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ার এক ভোজসভায় এলেন ফ্র্যাঙ্ক ডি ওয়াটারম্যান। ওই সময়ে অনেকের পকেটে ওয়াটারম্যান কলম থাকতো, কাজেই কোম্পানীর মালিককে তাদের ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

ক্যাসিনো থিয়েটারের এক মধুর সন্ধ্যার কথাও মনে পড়ছে—'শো বোট' নাটকে গান করেছিলেন বিখ্যাত গায়ক পল রোবসন।

নিউ ইয়র্ক থেকে চললাম ডেট্রইট, ট্রেনে। যেখানে উইণ্ডসরের কেনেডি কলেজিয়েট মাঠে খেলা। এ খেলার দ্রষ্টব্য ছিলেন আম্পায়ারদ্বয়। একজন নির্দেশ দিলেন ছ' বলে ওভার শেষ করতে, আর একজন ফতোয়া দিলেন আট বলের। ভিক রিচার্ডসন এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা জানালেন, 'এম. সি. সি. বা অস্ট্রেলিয়ার কানুন চলবে না এখানে।'

রিচার্ডসন তড়িঘড়ি খেলা বন্ধ করে দিলেন।

এর পরের দৌড় শিকাগো। এতোদিন শুনে এসেছি শিকাগো শহর খুনে, ছিনতাইবাজদের স্বর্গ—কিন্তু পৌঁছে মনে হয়েছে এখানে না এলে এতো সুন্দর শহরটা দেখা হতো না। এখানকার বাগান আর শহরতলীর জায়গাগুলোর অনুকরণ করলে অন্য শহরের শোভা বাড়তো।

গ্রাণ্ট পার্কের মাঠটা বিরাট—সবার জন্যে উন্মুক্ত থাকলেও হাজার পাঁচেকের বেশি দর্শক কোনদিনই আসেনি।

এসব ছোট ছোট খেলাগুলোতেও অনেক মজার ঘটনা ঘটে—যেমন প্রথম দিনই, খেলা চলছে তখনো—একটা বাচ্চা ছেলে মাঠের বাইরে আমাদের কাকে যেন জিজ্ঞেস করলো—'প্রথম খেলা কারা জিতেছে?'

আর একবার—কিপাক্স তো একজনকে ক্যাচে আউট করেছেন—হঠাৎ দেখা গেল অন্য ব্যাটসম্যানটিও উইকেটের বাইরে। কিপাক্স মজা করার জন্যে একটা উইকেট তুলে ছুঁড়ে দিলেন বোলারের দিকে, দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন 'হাউজ্যাট!' আম্পায়ার গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঠিক বুঝতে

পারছি না। বড্ড তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো তো ব্যাপারটা।' এবড়ো-খেবড়ো পিচ মাঠের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন আশ্বাস দিলেন। পরের দিন নামতে দেখি মাঠভর্তি জল। আমাদের প্রতিবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে কর্তারা জানালেন—আমাদের সুবিধে হবে ভেবেই তো জল ঢালা হয়েছে।

পৃথিবীর অন্য কোথাও এ ধরনের রসিকতা (!) চলে কিনা জানা নেই আমার।

এরপর উইনিপেগ। চব্বিশ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রার শেষে এক সম্মিলিত ক্যানেডিয়ো একাদশের সঙ্গে খেলায় নামতে হলো। ক্যানাডার হুল-ফোটানো তাপও অনুভূত হলো, এডিলেডের গরম কোথায় লাগে এর কাছে!

খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা মাঠ ছেয়ে গেলো ফড়িঙে। বলগুলো ব্যাটের কাছে না পৌঁছে অবাঞ্ছিত জীবগুলোর প্রাণান্তকর হলো।

উইনিপেগে থাকাকালীন প্রখ্যাত হাডসন বে' কোম্পানী এক ভোজ-সভায় আপ্যায়িত করলেন আমাদের। সেই উপলক্ষ্যে এক অভিনব স্মরণিকাও ছাপা হয়েছিলো, মেপ্‌ল্‌ পাতার অনুকরণে—কাঠে। উইনিপেগ থেকে রেগিনা; সেখান থেকে মুজ জ'। এখানেও প্রচুর মজা হলো। আম্পায়ারদের একজন স্থানীয় চুয়িংগাম কোম্পানীর সেল্‌সম্যান ছিলেন, তিনি উদার হাতে সবার মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন বস্তুটি। খেলোয়াড়েরা সেগুলো আবার বেলে সেঁটে দিতে লাগলো। একটা বেলে বস্তুটি পর্যাপ্ত পরিমাণে না লাগানো থাকায় সেটা আস্তে আস্তে হেলে পড়তে লাগলো মাটির দিকে—আম্পায়ার কিন্তু সেটা মাটি না ছোঁয়া পর্যন্ত আউট দিলেন না!

সতেরোজনে ব্যাট করলো ওরা। এবং বিল আইভ তেইশ রানে আঠারোটা উইকেট নেবার পরও ওদের দু-একজন 'সফল' খেলোয়াড়ের 'খেল' দেখবার সুযোগ রইলো।

ফিল্ডিংয়ের সময় আবার ওদের চোদ্দজন পর্যায়ক্রমে বল দিলো।

কোনো ইনিংসে এতো বোলারের আধিক্য এই প্রথম চোখে পড়লো। অনেকটা বেস-বল খেলার ঢঙে, একের পর এক আগমন ঘটতে লাগলো ওদের।

মুজ জ' থেকে ইয়র্কটনের দুশো মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া হলো গাড়িতে। রাত তিনটেয় পৌঁছে আবার সকালেই মাঠে। এরপর সাসকাটুন, এডমণ্টন, সব শেষে ক্যালগারী। সর্বত্র দড়ির ম্যাটিং। খেলার মাঠগুলো সব পার্কে, এবং সবগুলোই সুসজ্জিত। এই ফাঁকে বেড়ানো হয়েছে বানফ্ আর লেক লুই—দুটোই দেখার মতো জায়গা। এগুলো সম্পর্কে যে কিংবদন্তী আছে তা অতিরঞ্জিত নয় মনে হবে দেখার পর।

ভ্যানকুভারে ফিরে স্থানীয় একাদশের সঙ্গে খেলা হলো। ওরা প্রথম ইনিংসে করলো সাঁইত্রিশ, দ্বিতীয়টায় ছিয়ানব্বই। আমাদের হলো এক ইনিংসে তিন উইকেটে তিনশো সাঁইত্রিশ।

খেলার একটু হেরফের করা হলো পরে—আমাদের আর্থার মেইলিকে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার একটা দলের অধিনায়ক করে দেওয়া হলো। তার পরের দিন অ্যালান কিপাক্স নেতৃত্ব নিলো। স্থানীয় ছেলেরা ভালোই খেললো। হেনড্রী (অস্ট্রেলীয় দলের নয়) করলো সাতান্ন রান।

ক্যানাডার সফরে দাঁড়ি টেনে সিয়েট্‌ল্ রওনা হওয়া গেলো। সেখান থেকে ওরিগোঁর অনন্ত বনভূমির ভেতর দিয়ে স্যান ফ্র্যানসিসকো। সারা রাস্তাটায় মনে রাখার মতো সৌন্দর্যের বিস্তার, কিন্তু দেড়দিন পরে যাত্রা-শেষেই খেলার মাঠে নামতে হলো।

স্যান ফ্র্যানসিসকোর কেজার স্টেডিয়ামে খেলার আয়োজন হয়েছিলো। সত্তর হাজার দর্শক যে মাঠে বসে খেলা দেখতে পারে সেখানে দেখা গেলো মাত্র কয়েক শো লোক হয়েছে। 'ফ্রিস্কো'র মানুষের ক্রিকেট সম্পর্কে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে এমন মনে হলো না। উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার 'সর্ব-তারকা সমন্বিত' দলের রান উঠলো কুড়ি, পনেরো জনে খেলে। তার মধ্যে পারসিভ্যাল করলেন দশ, ফালতু রান তিনটে।

দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য কিছুটা উন্নতি হলো ওদের খেলায়—তেত্রিশ রান উঠলো, কিন্তু ব্যক্তিগত রান দশকের ঘর ছুঁলো না। অস্ট্রেলিয়া করলো ছ উইকেটে ছশো আটষট্টি, পরেই 'ডিক্লেয়ার' করে দেওয়া হলো।

ওদের প্রথম ইনিংসে বল ছুঁয়েছি ন বার, তাতেই তিনটে ক্যাচ, চারজন রান আউট।

প্রথমদিকের এক ব্যাটসম্যান তাঁর পূর্বসূরী দুজন 'শূন্যে' বসে যাওয়ায় নির্বাচকদের এক প্রস্থ গালাগাল দিয়ে নামলেন—'অর্বাচীনদের নামানো উচিত হয়নি', কিন্তু নিজেও প্রথম বলেই ফিরে গেলেন।

স্থানীয় কাগজেও খেলা সম্পর্কে নানা মজার খবর ছাপা হয়েছিলো—মোদ্দা কথা স্যান ফ্র্যানসিসকোর দিনগুলো আমাদের নির্ভেজাল আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে। মনে বেশ কিছু অনীহার ভাব নিয়ে লস এঞ্জেলসে পৌঁছলাম—একেবারে ছায়াছবির রাজত্বেই বলা যায়। ওখানে তখন কিছু ছবির কাজ চলছিলো। মেরি এস্টর, জিন হারলো, মিরনা লয়, বরিস কারলফ, স্যর চার্লস অব্রে স্মিথ প্রমুখদের শুটিং দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো সেবার। মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের স্টুডিও ঘোরা হলো। তারপর খেলা—ওদের দলের অধিনায়কত্ব করলেন স্যর চার্লস স্বয়ং। উনি ওই অঞ্চলের একজন নিষ্ঠাবান ক্রিকেটপ্রেমী বলে পরিচিত। সেদিন ওঁর যে ব্যাটিং দেখলাম তা ওই বয়সে ওঁর দ্বারাই সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য—আঠারোশো অষ্টআশিতে ইংল্যাণ্ডের যে দলটি অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলো তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন স্যার চার্লস। আর সেও আমার জন্মের বহু আগে। ক্রিকেট ছাড়াও স্যর চার্লসের আর একটা পরিচয় নিশ্চয়ই সকলে জানেন—তিনি একজন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা। ওঁর মৃত্যুতে ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ ইংরেজদের চেয়ে কম শোকাহত হননি।

ওঁদের খেলা সম্পর্কে বলার বিশেষ কিছুই নেই, কাজেই বললাম না। মাঠের বাইরেকার কথাই বেশি করে মনে পড়ছে—যেমন সস্ত্রীক লেসলি হাওয়ার্ডের সঙ্গে একটা পুরো সন্ধ্যে কাটানো, এবং সেখানেই মরিন ও'সুলিভ্যান, নরমা শিয়ারার আর আরও অনেক নামী-দামী শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার স্মৃতি। যুদ্ধের সময় হাওয়ার্ডের হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা আমাকে বেদনা দিয়েছে।

সফরটা দ্রুতই শেষ হয়েছিলো—দশ সপ্তাহে ছ হাজার মাইল পরিক্রমা। এই সময়টুকুর মধ্যে একান্নটা ইনিংস খেলতে হয়েছে, রান হয়েছে তিন

হাজার সাতশো উনআশি (ইনিংসের গড় একশো ছ' রান করে)। একই সময়ে স্ট্যান ম্যাকক্যাবের হয়েছিলো ছ.হাজার তিনশো একষট্টি রান, উইকেট নিয়েছিলো একশো উননব্বইটা।

অ্যামেরিকায় ক্রিকেটের মান অত্যন্ত শোচনীয়। ক্যানাডার সম্পর্কেও ওই এক কথাই প্রযোজ্য, যদিও অবশ্য বেস-বলের চর্চা কিছুটা হয় এখানে।

ক্রিকেটের কৃপায় আমার এবং আমার স্ত্রীর অনেক দেশ ঘোরার সুযোগ হয়েছে—অন্যকিছু করার মাধ্যমে এটা হতো কিনা সন্দেহ। উদ্যমের প্রশ্ন ছিলো ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে ছিলো আরও সমস্যাকুল দিন, যার পদধ্বনি তখনো কানে আসেনি।

জার্ডিনের দল

আমরা ক্যানাডায় থাকতেই জার্ডিনের দল তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। এঁরা উনিশশো বত্রিশে অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসেছিলেন। ভয় হলো—এবার তো মারমুখী বোলিংয়ের সামনে পড়তে হবে। অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তেই বলের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কোনো আন্দাজ পাওয়া যায়নি। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর মার্কিন সফরের শেষদিকে আমার খেলাও পড়ে গিয়েছিলো। তার ওপর পায়ে চোট—স্যান ফ্র্যানসিসকো থেকে সিডনি ফেরা পর্যন্ত বিশ্রাম জুটলো। সামনে আবার অস্ট্রেলীয় মরসুম। অস্ট্রেলিয়ায় ফিরেই নতুন কাজের ভার নিয়ে নিলাম—বেতার ঘোষণা আর কাগজে লেখা, দুই-ই চলতে লাগলো। সব ভালোই চলতে লাগলো কিছুদিন, কিন্তু গোল বাধলো তখনি, যখন নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কাছে কাজ আর খেলা একসঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। বোর্ডের সভাপতি যে ফতোয়া জারী করলেন তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেলো—আমি নাকি লেখা আর খেলার কাজ একসঙ্গে চালাতে পারি না; আইনের ছাড় শুধু তাদের জন্যে—যাদের পেশা সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা আমার প্রধান উপজীব্য একথাও স্বীকার করা হলো ঠিকই, কিন্তু সে ছাড়া আমার যে অন্য ধান্ধাও আছে সেটাও সবিনয়ে জানাতে ভুললেন না তাঁরা।

খবরটা যখন আমার কাছে পৌঁছলো তখন আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝুন। ওই অবস্থায় অন্য কোনো নীতিবান লোক যা করতো আমিও তাই করলাম। চুক্তিভঙ্গের দিকে না গিয়ে জানিয়ে দিলাম—বোর্ড তাঁদের মত না পাল্টালে টেস্ট দল থেকে আমাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারেন।

ফলশ্রুতি, উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশের টেস্ট থেকে খারিজ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো, এমন কি চৌত্রিশের ইংল্যাণ্ড সফরের ব্যাপারটাও অনিশ্চিত হয়ে উঠলো।

এই টানা-পোড়েনের মধ্যেও পার্থে এম. সি. সি.-র বিরুদ্ধে খেলার একটা মওকা জুটে গেলো।

আমন্ত্রণ তো পাওয়া গেলো কিন্তু পরের ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করলে ভাবি গ্রহণ না করলেই ভালো ছিলো। একে তো সিডনি থেকে পার্থ যেতেই ট্রেনে পাঁচদিন কেটে গেলো, তার ওপর টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে মাঠে দৌড়োদৌড়ি করতে হলো আরও দুদিন। এর পর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়লো—ব্যাটিং করতে নামতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। দুবারই চটচটে উইকেটে খেলতে হলো আমাদের।

ভেরিটির বোলিংয়ের তুলনা নেই—আঠারো ওভার বল করে সাঁইত্রিশ রানে সাতটা উইকেট ফেলে দিলো।

এদিকে ইংরেজ দলের কর্তারা লারউড, বাওয়েস আর ভোসির মতো ঝানু খেলোয়াড়দের দল থেকে বাদ দিলেন। রহস্য আরও ঘনীভূত হলো।

সিডনি থেকে ফিরেই আবার ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলতে হলো। এই খেলাতেই ফ্লিটউড-স্মিথকে প্রথম দেখি—উনি তখন সত্য কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে এক খেলায় বাইশ রানে ছটা উইকেট নিয়ে ফিরেছেন।

প্রথম ইনিংসে দুশো আটত্রিশ রান তুলতে সময় লেগেছিলো একশো পঁচানব্বই মিনিট। প্রথম একশো রান করতে অবশ্য সময় লেগেছিলো সত্তর মিনিট। দ্বিতীয় ইনিংসে বাহান্ন করেছিলাম, আউট হইনি। কিন্তু এরকম দু-একটা জাঁদরেল খেলা খেললেও শরীর যে ভেঙে পড়ছে এটা পরিষ্কার বুঝলাম। এদিকে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সঙ্গে মনান্তরের ব্যাপারটা

ক্রমে প্রকাশ্য বিরোধের দিকে এগিয়ে চললো। আমার অবশ্য কোনো দোষ ছিলো না; যাই হোক বোর্ড কাগজওলাদের ডেকে পাঠালেন।

অন্যদিকে লণ্ডন থেকে আমার খেলার তাড়া আসতে লাগলো। এসব ঘটনা আমার মানসিক স্থৈর্য একেবারে নষ্ট করে দিলো এবং ওই সময়ে আমি শুধু কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে চেয়েছি।

শেষে কাগজওলারা আমাকে লেখা থেকে রেহাই দিলেন, খেলাতেও বাধা দিলেন না।

এরপর অস্ট্রেলীয় একাদশের হয়ে খেলার জন্যে মেলবোর্ণ যেতে হলো। এম. সি. সি.র সঙ্গে খেলা—আর এই খেলা থেকেই জার্ডিন তার মারাত্মক বডি-লাইন বল শুরু করলো। এর তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট, এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কানে জল ঢোকাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। এই খেলাতে একটা ব্যাপারই দেখবার ছিলো, সেটা মিডিয়াম পেস অফ স্পিন বোলার লিসলে স্যাগেলের কাণ্ড। দশটা ওভারে ইংরেজদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলো। বত্রিশ রানে আটটা উইকেট ফেলে দিলো সে।

পরের খেলাগুলোতে অবশ্য এরকম কৃতিত্ব আর দেখাতে পারেনি স্যাগেল, তবে তার ওই বিরাট চেহারা আর বলের কায়দা ইংরেজদের স্থায়ী বিপদের কারণ হতে পারতো। সুযোগ অবশ্য দেওয়াও হয়নি তাকে।

ক্রিকেট, বিদেশ সফরের হুড়োহুড়ি আর বাকযুদ্ধ—শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিলো। এম. সি. সি.র খেলায় এটা আরও বেশী করে অনুভব করলাম। ওর টেস্টের বোলিংও দেখলাম অনেক কমজোরী হয়ে গেছে, কিন্তু খেলার জেল্লা আছে। জার্ডিনের নতুন থিওরীর (!) অবশ্য সে বিরুদ্ধবাদী ছিলো এবং দল গঠনের নতুন কায়দায় তার মতো খেলোয়াড়ের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে মনে হলো।

পরের সপ্তাহে প্রথম টেস্টের তারিখ পড়লো, আমি খেলতে রাজি হলাম—কারণ লেখার বালাই তো নেই। আমার বেতারে ঘোষণার ছাড়পত্রও মিললো। স্বস্তি পেলাম—বেতারের মাধ্যম কাগজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে দুশ্চিন্তা হলো শরীরটাকে নিয়ে, নির্বাচকদের সে কথা

জানালামও। ওঁরা ডাক্তারী পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন। পরীক্ষা হলো—ডাক্তার বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিলেন।

খেলতে পারলাম না, কিন্তু খেলা তো দেখতে বাধা নেই। স্ট্যান ম্যাক্ক্যাব টেস্টের প্রথম সেঞ্চুরী করলো—অপরাজিত একশো সাতাশি। ইনিংসের শেষে তো স্রেফ বল হাঁকড়েছে, সঙ্গে টিম ওয়াল। দশম উইকেটে আধ ঘণ্টায় ওদের রান হলো পঞ্চান্ন, তার মধ্যে টিম চার রান করলো।

পরে স্ট্যানের আরও ভালো খেলা দেখেছি ট্রেন্ট ব্রিজে। তবে এ খেলায় বোলারদের উদ্দাম বোলিং যে ভাবে ঠেকিয়েছে সে তার জবাব নেই। আর একটা দেখার জিনিস ছিলো সে খেলায়—লারউডের বল। বলের প্রচণ্ডতা ভোলা যায় না। দ্বিতীয় ইনিংসে লারউড আঠারো ওভার বল করে আটাশ রানে পাঁচটা উইকেট নিলো।

অস্ট্রেলিয়ার এই খেলা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয়েছিলো, কারণ স্ট্যান ছাড়া আর কেউই পঞ্চাশ রানও করতে পারেনি। দ্বিতীয় টেস্টে আমার ডাক পড়লো। কয়েকদিনের বিশ্রামে শরীর সেরেছে একটু, নামলাম। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে দর্শকদের উল্লাস কানে এলো। আবার তারই মধ্যে হারবার্ট সাটক্লিফ আওয়াজ দিলো। উত্তরে বললাম, 'ফিরে যখন এসেছি তখন কি খুব সুবিধে হবে?'

সুবিধে হলো—কারণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিঃশব্দে ফিরে এলাম, বাওয়েসের শর্ট পিচের অফ স্টাম্পের একটা বল খেলতে গিয়ে বিপত্তি হলো—মারের ভুলে 'লেগ' স্টাম্পে লাগলো বল।

দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ত্রুটি সারবার চেষ্টা করেছি, একশো তিন—নট আউট থেকে। খেলার শেষ উইকেটে বার্ট আইরণমংগার আমার জুটি হলো। তখন রানের সংখ্যা নব্বইয়ের ঘরে। খেলার মধ্যেই বার্টের টেলিফোন এলো—ভদ্রলোককে বলা হলো সে ব্যাট করতে নেমেছে সবে। ভদ্রলোক হালকা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ধরছি।'

বার্টের সঙ্গে কথা বললাম, সে বললো, 'কোই পরোয়া নেই—তোমাকে ডোবাবো না।'

হ্যামণ্ড বল করছিলো, নিখুঁত বল—তবু, বার্ট আমাকে ডোবায়নি।

অস্ট্রেলিয়া সে খেলায় জিতেছিলো। ও'রিলী দশটা উইকেট নিয়ে তার খেলার কিছু নমুনা ইংরেজদের দিয়েছিলো। সর্বাধিক রান উঠেছিলো দুশো আটাশ। জার্ডিন তার সেই প্রাণঘাতী বল দিয়ে চললো—কিন্তু পিচের অবস্থা খারাপ থাকায় সুবিধে হলো না তার।

এডিলেডে পরের টেস্টে একটা বিশ্রী ব্যাপার হলো। সকলেই জানেন ওল্ডফিল্ড সে খেলায় মাথায় চোট পেয়েছিলো। লারউডের দোষ না থাকলেও দর্শকেরা আরও দু-একটা ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়লো—ভয় হলো, মাঠে ঢুকে হয়তো খেলাটাই না নষ্ট করে দেয়। এইরকম সামান্য একটা ঘটনা থেকেই ইংল্যাণ্ডে একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছিলো। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে, অস্ট্রেলিয়ার তখনো কিছু রান বাকি জয়লাভের জন্যে। খেলা এগোচ্ছে না দেখে দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়লো—স্টাম্প উপড়িয়ে ফেলে দিলো। পুলিস এসে ওদের বের করে দিতে আবার খেলা চললো। এর মধ্যেই এক 'গুণমুগ্ধ' তো বেড়া টপকিয়ে ঢুকে পড়লো আমার ছবি নেবার জন্যে। ছবি নেওয়া হলো না, লোকটা গ্রেপ্তার হলো—জরিমানাও হলো তার—দু পাউণ্ড আর অন্যান্য খরচ পনেরো শিলিং। টাকা না দেওয়াতে কয়েক ঘণ্টা হাজতবাসও করতে হলো তাকে। এদিকে মজা হলো কি—সে ছবিও বেরিয়ে গেলো কাগজে আমার।

লোকটার সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করা হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে—কারণ, অনেকগুলো লোক যদি ওই ব্যাপারে মেতে উঠতো তাহলে কি সবাইকে সাজা দেওয়া যেতো!

হাজতের কথায় অস্ট্রেলিয়ার এক আদিবাসীর কীর্তি মনে পড়লো। গুরুতর অপরাধে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিলো। তার এক আদি-বাসী বন্ধুকে যখন ব্যাপারটা জানানো হলো সে আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে বললো, 'এটা ঠিক হলো না, ও তো অতদিন মেয়াদ ভোগ করবে না।' কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললো, 'ও তো বাঁচবে না বেশিদিন—বয়স হয়েছে তো!'

এডিলেডের মাঠে ফিরে যাই—সেখানে আর কোনো গোলমাল হয়নি তারপর। খেলায় উডফুলও চোট পেয়েছিলো, আর তাতে খেলার অবনতি হলো আরো।

বাকি টেস্টগুলো সম্পর্কে লেখার কমই আছে। অস্ট্রেলিয়ার বদলা নেবার সুযোগ থাকলেও সেরকম কোনো ইচ্ছে দেখা গেলো না আমাদের অধিনায়কের। খেলা চললো, অবশ্যই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে।

সিডনি ক্রিকেট মাঠ পার করা একটা ছক্কা মারের সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ হলো। শেষ টেস্টে লারউডের অবস্থা আরও খারাপ হলো। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আর কখনো তাকে খেলতে দেখা যায়নি।

বডিলাইনের ব্যাপারটা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। ক্রিকেটের ইতিহাসে বডিলাইনের বল দেওয়ার বৃত্তান্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

ওই মরসুমের আরও দু-একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার—এম. সি. সি. আর ভিক্টোরিয়ার শেষ খেলায় 'টাই' হয়েছিলো। অস্ট্রেলীয় দলের প্রথম ও শেষ 'টাই'। শেষ ওভার যখন চলছে, ভিক্টোরিয়ার আর মাত্র সাত রান দরকার। কিন্তু বিধি বাম—জুটলো মাত্র ছটি রান। শেষ বলটা মারতে গিয়ে রিগ আউট হয়ে গেলো।

অন্যটা হচ্ছে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে টিম ওয়ালের দুর্দান্ত বোলিং। ছত্রিশ রানে সবকটা উইকেট ফেলে দিয়েছিলো টিম। শেফিল্ড শীল্ডের সেই ঐতিহাসিক ইনিংসের বিস্তারিত তালিকা দিলাম:

ফিংলটন ব ওয়াল	৪৩
ব্রাউন ক হুইটিংটন ব ওয়াল	•
ব্র্যাডম্যান ক রায়ান ব ওয়াল	৫৬
ম্যাক্ক্যাব ক ওয়াকার ব ওয়াল	•
রাউ ব ওয়াল	•
কামিন্স ক ওয়াকার ব রায়ান	•
লাভ ব ওয়াল	১
হিল ব ওয়াল	০
হাউয়েল ব ওয়াল	•
ও'রিলী ব ওয়াল	৪
স্টুয়ার্ট নট আউট	২
অতিরিক্ত	৭
	১১৩

লক্ষ্যণীয়—একটা পর্যায়ে ওয়াল চারটে উইকেট নিয়েছে কোনো রান না দিয়ে। মাঠের অবস্থা ভালোই ছিলো। টিমকে আরো ভালো বল দিতে দেখেছি পরের খেলায়, কিন্তু এ খেলার কথা কি কোনোদিন ভুলতে পারবো ?

বডিলাইন

আমার ক্রিকেট-জীবনের ইতিবৃত্তে ছেদ টানার আগে কিছু অপ্রিয় স্মৃতির উল্লেখ করতে হয়। ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিলো এমন ঘটনার উল্লেখ না করলে কর্তব্যের অবহেলা হবে, কারণ ঐসব খেলার অনেকগুলোরই আমি কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক জার্ডিন তার মতবাদের অনুকূলে একটা বই লিখেছিলো, লারউডও একটা লিখেছিলো। বইটির আজ আর কোনো গুরুত্ব নেই কারণ বডিলাইন বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। বডিলাইন বল আর দেওয়া যাবে না, কারণ—এম. সি. সি. আইন করে তা বন্ধ করে দিয়েছে। জোর দিয়ে একথা বললাম এজন্যে যে, ইংল্যাণ্ডের মানুষের ধারণা অস্ট্রেলিয়াই এটা বন্ধ করার মূলে। এম. সি. সি. অবশ্যই অস্ট্রেলিয়ার প্রতিবাদের ভিত্তিতেই এ কাজে এগোতে পেরেছিলো।

এখন দেখা যাক, এই বডিলাইনের ব্যাপারটা আসলে কি ? ব্যাটস-ম্যানের শরীর বরাবর শর্ট পিচের দ্রুত বল দেওয়াই বডিলাইন বল করা।

অ্যালান কিপাক্স তাঁর 'অ্যান্টি বডিলাইন' বইয়ে এ ধরনের বল করার বিপক্ষের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে :

ক। বলগুলোর অধিকাংশই দেওয়া হতো ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য করে

খ। বলগুলো শর্ট পিচে দেওয়া হতো যাতে সেগুলো ব্যাটসম্যানের কাঁধ বা মাথা বরাবর গিয়ে পড়ে

গ। ফিল্ডিংয়ের কাজটা 'লেগে'ই প্রাধান্য পেতো, শর্ট লেগে চার কি পাঁচজন, এবং দূরে লং লেগে একজন দাঁড়ি করিয়ে।

কিপার অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান, কাজেই কোনো ইংরেজ ব্যাটসম্যানের উদ্ধৃতি দেওয়াই ভালো। ওয়ালি হ্যামণ্ড-এর মতে বডিলাইন হলো :

১। দ্রুতগতিসম্পন্ন বল দেওয়ার রীতি

২। উইকেটের ওপর দিয়ে উড়ে যায় এমনভাবে বল দেওয়ার রীতি

৩। ব্যাটসম্যানের শরীর বরাবর বল দেওয়ার রীতি

৪। মাঠের লেগের দিকটায় বা আটজনের অবস্থানের ব্যবস্থাসহ বল দেওয়ার রীতি।

বডিলাইন বল দেওয়ার বিপক্ষীয়দের মতে এটা অবশ্যই ভ্রান্তিকর রীতি বলে উল্লিখিত। ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং, ফ্রেড রুট, প্রমুখরা লেগ থিওরিতে বল করতেন—এবং তাতে কারুর জীবন বিপন্ন হয়নি।

কিন্তু বডিলাইনের ব্যাপারটা অন্যরকম। এ ধরনের বল দেওয়ায় শারীরিক বিপদটাই মুখ্য হয়ে দেখা দিলো। ব্যাপারটার সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনে স্যর পেলহ্যাম ওয়ারনারের উদ্ধৃতি স্মর্তব্য। ইনিই সর্বপ্রথম লিখিতভাবে বডিলাইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, যদিও সে সময়ে 'বডিলাইন' কথাটা আক্ষরিক অর্থে চালু হয়নি।

ইয়র্কশায়ার আর সারে'র উনিশশো বত্রিশের বাইশে অগাস্টের এক খেলায় লণ্ডনের মর্নিং পোস্টে তাঁর বিবৃতি ছাপা হলো : "বাওয়েসের বল দেওয়ার পদ্ধতি পালটানো দরকার। বাওয়েস অনের দিকে পাঁচজনকে ফিল্ডিংয়ে রেখে, অনেকগুলো শর্ট পিচের বল দিলেন এবং সবগুলোই মনুষ্য সমান উচ্চতায়। এগুলোকে কিন্তু সত্যিকার বল দেওয়া বলে না, অন্তত: ক্রিকেট খেলার উপযোগী তো নয়ই—এবং এভাবে বল দেওয়া হতে থাকলে এম. সি. সির তরফ থেকে এ সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। মানে, কোনো খেলোয়াড় পিচের মাঝপথ পেরিয়ে বল দিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" তাহলে বাওয়েসই প্রথম লোক যে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ ধরনের বল দেওয়ায় হাত পাকিয়েছিলো এবং ধিকৃতও হয়েছিলো। এটা কিন্তু লেগ থিয়োরি নয়।

এখন দেখা যাক বডিলাইনের ব্যাপারটা চালু হলো কি করে। জার্ডিন তার বইতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আইনানুগ লেগ

থিয়োরি কিভাবে চালু হলো এ ব্যাখ্যা তার বইয়ের অনেকখানি জুড়ে আছে। কিন্তু এহ বাহ্য, আমি তো বলেইছি—লেগ থিয়োরি আর বডিলাইন এক ব্যাপার নয়।

লিয়ারী কনস্ট্যান্টাইন তাঁর 'ক্রিকেট ও আমি' বইতে লিখেছেন: "জার্ডিনের বই আদ্যোপান্ত পড়ে ক্রিকেটে বডিলাইন বলের ব্যাপারে উত্তেজনাকর কথাবার্তা পাবেন, কিন্তু এ সম্পর্কে সারকথা তাঁতে অনুপস্থিত।"

এখন জার্ডিনের বক্তব্য কি দেখা যাক, তিনি বলছেন: 'যদিও আমি উনিশশো ত্রিশের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলিনি, ব্র্যাডম্যানের লেগ স্টাম্পের খেলা হতাশাব্যঞ্জক হয়েছে বলে জেনেছি। ব্র্যাডম্যানকে রুখবার জন্যে লেগ থিয়োরির চল হয়েছে বলে যদি কেউ ভেবে থাকেন তাহলে তিনি ভুল করেছেন।'

লারউড তাঁর বইয়ে আরও সোচ্চার: 'উনিশশো তিরিশের বেলসিং-টন ওভালের টেস্টে প্রথম ফাস্ট লেগ থিয়োরি বল দেওয়ার খুব প্রবণতা দেখা যায়। সামান্য বৃষ্টি হয়েছিলো, তাতেই বল কার্নিক খেয়ে গড়াতে লাগলো। আর্কি জ্যাকসন তাতেই খেলেন, কিন্তু ব্র্যাডম্যানের ক্ষেত্রে তা হলো না। এবং এই ব্যতিক্রমের জন্যে আমার বিশ্বাস—যদি আবার আমাকে অস্ট্রেলিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলেও এই ব্যতিক্রমের কথা ভুলবো না।' জার্ডিনের বক্তব্য সম্পর্কে একটা কথাই বলবো—উনিশশো ত্রিশে যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন, উনিশশো বত্রিশে কিন্তু উল্টো কথাই বললেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ালো, কারণ জার্ডিন তাঁর দলে তাঁদের তিন বডিলাইন বোলার: লারউড, ভোসি বা বাওয়েস-কাউকেই খেলাননি আমাদের বিরুদ্ধে। আবার বৃষ্টিভেজা মাঠে দুদিনের খেলায় আমার রান হলো তিন আর দশ।

কাজেই জার্ডিনের পক্ষে অতো কম সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলা হাস্যকর নয় কি!

কেলেঙ্কারি বাড়লো যখন এফ. আর. ফস্টার কাগজে তাঁর বিবৃতি

ছাপালেন, "জার্ডিন ইংল্যাণ্ড ছাড়ার আগে আমার সেণ্ট জেমসের ফ্ল্যাটে প্রায়ই আসতেন এবং লেগ থিয়োরি ফিল্ডিং সম্পর্কে আমার বক্তব্য শুনেছেন। এগুলো যে আবার বডিলাইন বোলিংয়ে ব্যবহৃত হবে এটা ভাবিনি। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের আমার পুরনো বন্ধুদের এটুকুই শুধু জানিয়ে দিতে চাই যে আমার অভিজ্ঞতা এবং পরামর্শের এ ধরণের অপব্যবহারের জন্যে আমি দুঃখিত।"

বডিলাইন সম্পর্কে ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের ধারণা কিছুটা ভিন্ন, তিনি লিখলেন, "আমার মনে হয় বডিলাইনের জন্ম লণ্ডনের পিকাডেলী হোটেলের খাবার ঘরে। এখানে বসেই 'ব্যাপার'টা ছকেছিলেন জার্ডিন, আর্থার কার, ভোসি আর লারউড।" হ্যামণ্ড আরও বলেছেন এ ব্যাপারে জার্ডিনকে প্রভাবিত করেছেন পি. জি. এইচ. ফেণ্ডার, অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে এম. সি. সির প্রখ্যাত স্কোরার ফার্গুসনের স্কোরগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার পর।

এম. সি. সি. দলের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথেই এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এবং জার্ডিনও একথা অস্বীকার করেননি।

পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কি ধরনের বোলিং চালু হতে যাচ্ছিলো এবং আমাকেই প্রধান লক্ষ্য করা হলো—যাতে আমার বিরুদ্ধে ব্যাপারটা সার্থক করে তুলতে পারলে অন্যদের বেলায়ও কার্যকরী হবে।

উনিশশো তিরিশে 'ওভালে' আমার দুশো বত্রিশ রান হয়েছিলো, তাতে কি সব খেলার গলদ নাকি ছিলো আমার—জার্ডিন আর লারউডের মতে। এবং বডিলাইনের স্বপক্ষেই বলা হলো এটা। বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম, ওরা লিখলো :

১। ওভালে লাঞ্চের আগেকার সময়টা আজ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে উজ্জ্বলতম দিন—তাদের এ দিনের দৃঢ়তাব্যঞ্জক ব্যাটিং অবিস্মরণীয়। উইকেটের অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ব্র্যাডম্যান আর জ্যাকসন ইংরেজ দর্শকদের সামনে তাঁদের খেলার যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, ক্রিকেটের ইতিহাসে তা অনন্য।

২। উইকেট বিপজ্জনক হওয়াতে বোলারদের সুবিধে হলো—বল

'উড়ে' চললো। লারউড ক্রমেই হিংস্র হয়ে উঠলো। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলো খেলোয়াড়গুলো, তবু খেলে চললো তারা। নরমেধের বিরুদ্ধে মোকাবিলার এ'এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

৩। এই ব্র্যাডম্যান ভদ্রলোকের 'ছাতি' আছে বটে—দু দুটো সেঞ্চুরী করলেন লারউডের এই হাড়গোড়-ভাঙা বলে। বুকের ছাতিতে একটা বল লাগাতে ভদ্রলোক ব্যথায় আর্তনাদ করেছেন, তারপরেরটা আঙুলে ফুঁড়লেও হাঁকড়েছেন নির্বিবাদে। হিম্মৎদার লোক।

৪। ডেলি মেলের মন্তব্য : বৃষ্টির পর ওই উইকেটে ব্র্যাডম্যান আর জ্যাকসনের খেলার তুলনা নেই—শারীরিক আঘাতও তাদের কাবু করতে পারেনি।

উল্লেখ্য লাঞ্চের আগে আটানব্বই করেছিলাম ওই জলো পিচে। কিন্তু ক্যাচে আউট হলাম। বলটাই মারিনি আমি। বলটা খেলতে যাওয়ায় সেটা সামান্য ঘুরে গেলো। ঘোরার মুহূর্তে ব্যাট আর চালাইনি—লারউড (একমাত্র উনিই) আউট চাওয়াতে বিস্মিত হলাম, বিস্ময়ের মাত্রা বাড়লো আম্পায়ারের আউট ঘোষণায়!

ওই মুহূর্তটির এক ছবি আছে আমার কাছে। ডাকওয়ার্থ দাঁড়িয়ে আছে হাত বুকের সামনে, গ্লাভ্‌সে ধরা বলটা। ডাকওয়ার্থকে যাঁরা ক্যাচ ধরতে দেখেছেন তাঁরা জানেন কিভাবে সে বলটা লুফে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দেবার সময়ে একটা বিকট হুঙ্কার দেয়। এক্ষেত্রে সে কিন্তু কোনো আবেদন জানালো না। প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো হ্যামণ্ডও না, ছবিতে দেখা যাচ্ছে সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো নামানো।

আমি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করছি না। অন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাকে কখনো আউট দেওয়া হয়েছে, কখনো দেওয়া হয়নি। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে—কেউ না মনে করেন যে লারউড আমার উইকেট নিয়েছে বলে যে জার্ডিন আর সে দাবী করেছে, সেটার মূলে কোনো সত্যতা আছে।

জার্ডিন তার বইতে কিছু ঢালাও বিবৃতি দিয়েছে এবং ভূমিকায় কেপ

টাইমস পত্রিকার কোন এক মিঃ জি. এইচ. হটসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়েছে। মিঃ হটসন লারউডের লেগ-থিয়োরি সম্পর্কে বলেছেন। লারউড প্রথম কয়েকটা ওভার বল দেবার পর ওই থিয়োরির আশ্রয় নিতো, কারণ তার গতি পড়ন্ত তখন। কিন্তু জার্ডিনের বইয়ে হ্যাটা ব্রমলের লেগে খেলার একটা ছবির সঙ্গে মেলে না ব্যাপারটা। দেখা যাচ্ছে বলটা মুখের ওপরে পড়া রোধ করতে শর্ট লেগে বল মারছে সে, ভেরিটি তাকে ক্যাচে আউট করছে। বত্রিশ সালে তার খেলার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে এটা প্রমাণ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এটাকে সে শুধু তার সাফল্যের চাবিকাঠি উল্লেখেই ক্ষান্ত হয়নি, ব্যাটসম্যানের কোনো ঝুঁকি এতে নেই সে দাবীতেও সোচ্চার সে। তার যাথার্থ্য বিতর্কের বিষয় নয়—, তবে সন্তলব্ধ, তবে সে আর এক অধ্যায়।

যাথার্থ্যের পরিমাণ ওভারের রানসংখ্যায় হয় বলে আমার বিশ্বাস, অন্ততঃ লারউডের বক্তব্যের ভিত্তি তাই-ই, কারণ সে উনিশশো তিরিশ, একত্রিশ ও বত্রিশের সংখ্যা উদ্ধৃত করেছে। বত্রিশ সালের হিসেবটা হচ্ছে, আটশো ছেষট্টি ওভার বলে রান হয়েছে দু হাজার চুরাশি। সামান্য খতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে চার বছর আগে উনিশশো আটাশে সে আটশো চৌত্রিশ ওভার বল করে দু হাজার তিন রান দিয়েছে, বত্রিশের চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি—গড়ের হিসেবে। কিন্তু এর থেকে যার গুরুত্ব বেশি সেটা হচ্ছে—যদি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বডিলাইনের ব্যাপারটা বজায় থাকে, তাহলে ক্রিকেটের সব স্তরেই সেটা গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কোনো খেলোয়াড়েরই মতবাদের একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয়। এই জন্যে, আমি আবার লারউডের উদ্ধৃতি দিচ্ছি, 'যদি তা সত্যিই বডিলাইন হয়ে থাকে, তাহলে ব্যাটসম্যানদের কাছে বিপদের ব্যাপারই হবে।'

উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশের ইংল্যাণ্ড দলের নাম ঘোষণায় বিপদের সঙ্কেত পেলাম কারণ দলে চারজন ফাস্ট বোলারের নিযুক্তি হয়েছে।

এম. সি. সি. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত একটা খেলায় সর্বপ্রথম বডিলাইনের প্রয়োগ ঘটলো আমার বিরুদ্ধে। কয়েকজন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, অবিলম্বে এটা বন্ধ না হলে ফল খারাপ হতে পারে।

পরে সিডনির মাঠে প্রথম টেস্টের শেষে ডঃ ই. পি. বারবোর, খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের বল দেওয়ার পালাশেষের প্রার্থনা জানালেন, লিখলেন : "বোলার আর ব্যাটসম্যানের পথের মাঝামাঝি রাস্তার আগে বল পিচ খেয়ে ব্যাটসম্যানের মাথা বরাবর উঠে যাওয়াকে ক্রিকেট বলে না। এ ব্যাপার চলতে থাকলে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের কবর হয়েছে বুঝতে হবে—ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুতার হাতও সঙ্কুচিত হবে, হবে বন্ধুতাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অবসান।"

এবং তখনও পর্যন্ত ক্রিকেটের কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের মতামতের সঙ্গে গলা মেলাতে পারেননি।

আমার এ কথাও মনে হয়েছে যে—আমরা কোনো খেলায় হারছি এ অবস্থায় যদি বডিলাইন বোলিং সম্পর্কে প্রতিবাদ করতাম তাহলে তার ফল হয়তো আরও খারাপ হতো। এবং এই কারণেই, পরে একসময়ে আমরা মেলবোর্ন টেস্টে জেতার পর গোপনে কর্তাদের কাছে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

এম. সি. সি.কে এ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার মতামত জানানোর এটাই পরম মুহূর্ত বলেই মনে হলো আমার।

আমার তখনো মনে হয়েছে এবং এখনো মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার তরফে সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে এ ব্যাপার সম্পর্কে মতবিরোধের অবসান ঘটানো, এবং যখন আমাদের খেলার ফল অমীমাংসিত।

ফলে অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ খেলোয়াড় এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও এ ব্যাপারে সোচ্চার হলেও কর্তারা একমত হতে পারলেন না—আমরা নিজের কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছি বলে অনেকে অনুযোগও করলেন।

রাজ্যের একটা সংস্থার তরফ থেকে একটা প্রস্তাব এলো এই মর্মে, যে—"ইংল্যাণ্ডে তারবার্তা পাঠানোর ব্যাপারে সংস্থা একমত হতে পারছে না।" প্রস্তাবটি মাত্র একটি ভোটে নাকচ হয়।

নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তখনকার কার্যকলাপ এবং 'তার' পাঠানোর ব্যাপারগুলো আজ ইতিহাস রচনা করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার বোর্ড সর্বশ্রী রোজার হার্টিগান, এম. এ. নোব্‌ল্‌, ডব্লিউ. এম. উডফুল এবং ভিক রিচার্ডসনকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটিকে এ সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করতে বললেন,—বিষয়: এ ধরনের বোলিং নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা। কমিটি একটা নতুন নিয়ম প্রচলনের সুপারিশ করেছিলেন, সে সুপারিশ পাঠানো হলো এম. সি. সি.তে অনুমোদনের জন্যে। কিন্তু সে মুহূর্ত পর্যন্তও এম. সি. সি.র কাছে কোনো প্রমাণ পৌঁছয়নি।

উনিশশো তেত্রিশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে খেলতে এলো। ম্যানচেস্টারের দ্বিতীয় টেস্টে ওদের দুজন দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার মারটিনডেল আর কনস্ট্যান্টাইন জার্ডিনের কায়দায় বল দিতে শুরু করলেন। হ্যামণ্ড খেলতে খেলতেই এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন, বললেন—এ ধরনের বল করা বন্ধ না হলে তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে বাধ্য হবেন।

উনিশশো বত্রিশে জ্যাক হবসও একই ঘোষণা করলেন বাওয়েসের বলের মুখে। অথচ যতদিন এঁরা এ' অবস্থার সম্মুখীন হননি এ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা ছিলো না।

জর্জ ডাকওয়ার্থের মতে অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে বডিলাইন-বল মোটামুটি নিয়মমাফিকই হচ্ছে। তেত্রিশ সালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে বক্তৃতায় এ কথা জানালেন। তখনো ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে নটিংহ্যামের খেলা হয়নি।

তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত চিত্রটাই পাল্টে গেলো। ডাকওয়ার্থের চোট-খাওয়া চেহারার ছবিও উঠলো—প্রদর্শনী হলো সেগুলো নিয়ে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে নটিংহ্যামের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলো।

প্রতিশোধও বলতে পারেন। পঞ্চাশ বছর আগে নটিংহ্যাম ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকার করেছিলো।

এম. সি. সি. এবার তৎপর হলো—কাউন্টি ক্রিকেটের উপদেষ্টা কমিটি এবং নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এক যুক্ত বৈঠকের পর জানালো: "এ ধরনের বলকে ব্যাটসম্যানের ওপর বোলারের আক্রমণের নামান্তর বলা যায়।"

অধিনায়কদের ওপর এর বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া হলো। উনিশশো চৌত্রিশে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট সম্মেলনে এই নীতি গৃহীত হলো।

যাক এইখানেই ব্যাপারটার ইতি হলো না, কারণ বল দেওয়ার ধারা তো পাল্টালো না।

চৌত্রিশ সালে এম. সি. সি. ফতোয়া জারি করলো—"বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণের এবং তথ্যাদি সংগ্রহের পর এম. সি. সি. কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যে "এ ধরনের বল দেওয়াটা শারীরিক আক্রমণেরই সামিল, এবং এর অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টায় এটা বেআইনী ঘোষণা করছে।"

কি ঘটেছিলো আসলে তাই শুধু জানালাম—কারণ অস্ট্রেলিয়াই শুধু বডিলাইন বলের বিরোধী ছিলো না এটা সকলের জানা দরকার। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে বাধা নেই যে অস্ট্রেলিয়াই পয়লা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। যেহেতু তাদের ব্যাটসম্যানদের ওপর দিয়েই এর প্রাথমিক চোট গেছে।

লারউড অবশ্য শেষ পর্যন্ত এর বিরোধিতা করে এসেছেন, লিখেছেন—"এম. সি. সি.র কাছে ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা কৃতজ্ঞ, কারণ খেলার আইন প্রণেতা তো তাঁরাই!" আমার মনে হয় তাঁর এই অভিমত আজও অপরিবর্তিত।

বডিলাইন বল কি পরাস্ত করা যেতো?

বোধ হয় না। কারণ একই খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে এটা বারবার প্রযুক্ত হয়েছে এবং কেউই মোকাবিলা করতে পারেননি। কোনো রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়ও না, অন্ততঃ শর্ট লেগের ফিল্ডারের কাছে উইকেট না দিয়ে। বল 'হুক' করার চেষ্টা করেও নিস্তার নেই, বাউণ্ডারিতে ক্যাচ উঠবে। আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতেও কাজ হয় না—একমাত্র ব্যাটসম্যানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কিছুক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে। শুধুমাত্র গুড লেংথ বল খেলে এ সমস্যার মৌখিক সমাধান হয়তো সম্ভব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চোট খাবার সম্ভাবনা প্রবল। হ্যামণ্ড টেস্ট থেকে অবসর নেবার পর বডিলাইন সম্পর্কে লিখেছেন, নিন্দা করেই। হ্যামণ্ড ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করেছেন—যে মাটিতেই বডিলাইনের জন্ম।

বত্রিশ-তেত্রিশের মরসুমে বডিলাইনের মোকাবিলা করার অন্য প্রচেষ্টাও চালিয়েছি—জায়গা থেকে সরে গিয়ে অফে বল হাঁকড়ে। তাতেও কাজ

হয়নি। পূর্ণ সাফল্যলাভ না করলেও চারটে টেস্টে চারবার পঞ্চাশের ওপর রান হয়েছে আমার। ম্যাকক্যাব এবং রিচার্ডসন এর মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন, দুজনেই পাকা খেলোয়াড়, বিশেষ 'হুকের' মারে, কিন্তু ওই চারটে খেলার মাত্র একটিতে ওঁরা যথাক্রমে পঞ্চাশের কোঠায় রান তুলতে পেরেছেন। আমাদের তিনজনের তুলনামূলক সংখ্যাগুলো দিলাম :

	ইনিংস	রানসংখ্যা	নটআউট	সর্বোচ্চ রান	গড়
ব্র্যাডম্যান	৮	৩৯৬	১	১০৩	৫৬'৫৭
রিচার্ডসন	৮	২৩০	—	৮৩	২৮'৭
ম্যাকক্যাব	৮	১৬৬	—	৭৩	২০'৭

আমার খেলার পদ্ধতি অনেকের না-পছন্দ হয়েছে, সমালোচনাও হয়েছে। আমার এক সমসাময়িক জ্যাক ফিংগল্টন তার বইতে আমার খেলার তীব্র আক্রমণ করলো। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এখানে যে—জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে শেষ তিনটে ইনিংসে জ্যাকের রান ছিলো যথাক্রমে—১, ০, ০ এবং এর পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ার দল থেকে খারিজ হলো। ওই তিনটে ইনিংসে আমি করেছিলাম একশো সাতাত্তর রান, গড় ছিলো ৮৮'৫। এই সংখ্যাগুলো পাশাপাশি রাখলে জ্যাকের সমালোচনার অধিকার বিলুপ্ত হয় না কি? আর, সেঞ্চুরী আমাকে প্রায় প্রতি খেলাতেই মারতে হতো, কিছু লোকের দাবী পূরণের খাতিরে।

কনস্ট্যাণ্টাইনের একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে এলো, "বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের মধ্যে বডিলাইনের কায়দা ব্যর্থ হয়েছে দুজনের কাছে, তাঁরা হলেন ব্র্যাডম্যান আর ম্যাক্‌ক্যাব।" আরও বলেছেন জার্ডিনের পক্ষে এ অবস্থায় সেঞ্চুরী সম্ভব হয়েছে একটা কারণে—তাঁর উচ্চতা। জার্ডিন ছ ফুটের ওপর লম্বা ছিলেন। আমার উচ্চতা অনেক কম, কাজেই আমার পক্ষে এই সুযোগ নেওয়া আরও কঠিন হতোই।

বডিলাইনের কাজ কি সর্বক্ষেত্রেই অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে? না, অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে—এল. বি. ডব্লিউয়ের আইন পাল্টাতে এটা সাহায্য করেছে। এম. সি. সি. রাজিও হয়েছিলো। কিন্তু

এতে যথেষ্ট কাজ হয়নি। কারণ ঝুঁকি থেকেই গেলো। আমি তো এই মারাত্মক পদ্ধতি চালু হবার বহু আগে থেকেই বোলারদের সুযোগ বাড়ে এমন কোনো উপায়ের সন্ধানে ছিলাম। উনিশশো তেত্রিশে প্রকাশ্যে দাবীও রেখেছি, পরে আটত্রিশ সালে উইসডেনে এক প্রবন্ধেও জোরদার হয়েছে বক্তব্য। আজও করে চলেছি।

হালে এক প্রবন্ধকার লিখেছেন আমার অবসর গ্রহণের পর থেকেই নাকি আমি এ সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করছি—ভদ্রলোক স্পষ্টতই আমার পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বডিলাইন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবার আগে একটা কথাই শুধু বলবো—এ পদ্ধতির প্রচলন সাময়িক এবং সময়ে পরিবর্তনসাপেক্ষ। এ দীর্ঘ আলোচনার অন্যতম কারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে যে তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিলো সেটার মূলে শুধু ভুল বোঝাবুঝিই ছিলো এটা সপ্রমাণ করা।

উনিশশো তেত্রিশ-চৌত্রিশের মরশুম

বডিলাইনের যুগ শেষ হলো। স্বস্তি পেলাম, তবু সময়টা কেমন যেন একটা অশান্তির মধ্যে কাটলো ভেবে কষ্ট পেয়েছি। ক্রিকেট তো আবার শুরু হলো এবং কাজও বাড়লো। দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে মনের পরিশ্রমও যুক্ত হলো। খেলাশেষের সন্ধ্যেগুলো কাটলো ক্রিকেটের চিন্তায় আর কচকচিতে।

এবং এই সময়ে আমি ক্রিকেটের নিয়মকানুন সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন পড়া-শোনা করেছি। নিউ সাউথ ওয়েল্স ক্রিকেট আম্পায়ারদের সংস্থা পরিচালিত আম্পায়ারসিপ পরীক্ষা পাস করেছি। আম্পায়ার হবার সাধ আমার কোনোদিনই ছিলো না। তবু উনপঞ্চাশ সালে এডিলেড ওভালে চেম্বার অফ ম্যানুফ্যাকচারার্স আর ট্রেডস হলের খেলায় আমি আর টম প্লেকোর্ড আম্পায়ার হলাম।

এ ছাড়া খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে ক্রিকেটের খুঁটিনাটি জানা

দরকার ছিলো—যে কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষেই এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আম্পায়ারদের জন্যে নির্দিষ্ট পরীক্ষায় বসার দরকার নেই, কিন্তু নিয়মকান্থন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যে খেলা নিয়ে আলোচনাও অনেক কাজে লাগে। এর মধ্যে একটা খেলাতে শুধু আমি সঠিক রায় দিতে পারিনি বলে মনে পড়ছে। উনিশশো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে এডিলেডের একটা খেলায় জেওক্রে নোব্লেটকে 'হিট উইকেটে' আউট ঘোষণা করা হয়েছিলো। ক্রিকেটের আটত্রিশ নম্বর ধারায় এটা দেওয়া হলেও আমার মনে হয় ব্যাপারটা বিতর্কিত।

আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি সরাসরি আমার অজ্ঞতা জানিয়েছিলাম এ ব্যাপারে। কারণ মারটা বাইরে (wide) হয়েছিলো এবং সেক্ষেত্রে 'হিট উইকেট' হয় কি ?

আইনকান্থন ঘাঁটা শুরু হলো—আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো, কারণ উনত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে, 'ব্যাটসম্যান ওয়াইড বলে আউট হবেন যদি তিনি আটত্রিশ ধারা ভঙ্গ (হিট উইকেট) করেন।' সেদিন শুধু আমি কেন, সারা মাঠে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও এর জবাব দিতে পারেননি।

যতদূর মনে পড়ে ক্রিকেটের ইতিহাসে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর ঘটেনি। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং যায়ও—সুতরাং খেলোয়াড়দেরও নিয়মকান্থন সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত।

খেলার কথায় ফেরা যাক—উনিশশো একত্রিশে আমাকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেণ্ট জর্জ ক্রিকেট সংস্থা ছাড়তে হলো—কারণ জেলার নিয়মান্থযায়ী যে জেলায় খেলোয়াড় বসবাস করেন সেই জেলার হয়ে খেলাই সঙ্গত। আমি তখন উত্তর সিডনির বাসিন্দা, কাজেই সেই সংস্থার হয়ে খেলার প্রশ্ন দেখা দিলো।

ও'রিলীও সে সময়ে উত্তর সিডনির হয়ে খেলেছিলেন, পরে সেণ্ট জর্জে চলে গেলেন।

ওই সময়ে একটা দলও গঠন করেছিলাম আমি—'সানপামার' নামে। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে বাছাই করে ছেলেদের নেওয়া হয়েছিলো। ওদের

খেলা শেখানো ছাড়া ম্যাচের ব্যবস্থাও থাকতো। একথা বলতে আজ আনন্দিত হচ্ছি যে এদের প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেছে, অধিকাংশই নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে।

সেবার প্রথম শ্রেণীর মরসুমে সময়ের আগেই ছেদ পড়লো কারণ অস্ট্রেলীয় দল ইংল্যাণ্ড সফরের জন্যে তৈরী। শেফিল্ড শীল্ডের খেলা ছাড়াও দুটো প্রদর্শনী খেলার আয়োজনও হয়েছিলো। প্রথমটা ব্ল্যাকি আর আইরনমংগারের সম্মানার্থে, অন্যটি কলিন্স, অ্যাণ্ড্রুজ আর কেলেওয়ে প্রমুখদের জন্যে।

এগুলো 'টেস্ট ট্রায়াল' খেলা বলে চিহ্নিত করাই শ্রেয়, কিন্তু শেফিল্ড শীল্ডের সেই প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি এখানে অনুপস্থিত। খেলোয়াড়েরা ক্রিকেটের পূর্বসূরীদের স্বীকৃতির জন্যে হালকা মনোভাব নিয়েই খেলতো, ফলে সেগুলো একতরফা খেলায় কখনো পর্যবসিত হয়নি।

দুটো খেলার কোনোটাতেই সাড়া পড়েনি, তবে নিখুঁত মিডিয়াম পেস বলের জন্যে, এবেলিং ধন্যবাদার্হ। সে পরে চৌত্রিশে ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিলো।

ডন ব্ল্যাকি ক্রিকেট বৈচিত্র্যের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। আঠারোশো বিরাশিতে জন্মে ছেচল্লিশ বছর বয়সে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন, এবং তাঁর কনিষ্ঠদের অনেকের চেয়ে খেলায় নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন!

সে সময়ে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর 'অফ স্পিন' বোলারের আবির্ভাব ঘটেছিলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—টার্নার, ট্রাম্বল আর নোবল্। সর্বশেষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে পরিচিতি ক্ষণস্থায়ী হলেও তাঁর কথা এতোদিন পরেও আমার মনে জাগরূক।

ব্ল্যাকি উনিশশো আঠাশের সর্বশ্রেষ্ঠ 'অফ স্পিন' বোলার বলে স্বীকৃত। অনেকটা রাস্তা দৌড়ে এসে বল করতেন, আর্কি ম্যাকলারেনের চেয়ে বেশি হাত ঘুরিয়েই বল খালাস করতেন।

তৃতীয় আঙুলে 'লেগে'র দিক থেকে বল ঘোরানো সহজ। তর্জনীর সাহায্যে উল্টো 'স্পিন' অপেক্ষাকৃত কঠিন, কিন্তু ব্ল্যাকি ছাড়া অন্য কাউকে 'অফে'র দিক থেকে বল ফিরিয়ে আনতে দেখিনি। এই ভদ্রলোক আর

আইরনমংগার ক্রিকেটের জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন সেই বয়সে, যে বয়সে মানুষ বসে খেলা দেখে।

ওই বয়সে জনপ্রিয়তাও ঈর্ষার উদ্রেক করে।

এ সব খেলায় আমার রানসংখ্যাও কমেছে। একাগ্রতার অভাব তো ছিলোই—তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে খেলার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিলো। পরিশ্রান্ত হবার আগেই রানগুলো নেওয়া দরকার এ ধরনের মানসিকতা কাজ করেছে।

মরসুমের প্রথম খেলা কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে। একশো চুরাশি মিনিটে দুশো রান করলাম। পরেরটায় দুশো তিপ্পান্ন। তার পরের এক খেলায় কিপাক্স আর আমি তৃতীয় উইকেট জুটিতে একশো পঁয়ত্রিশ মিনিটে তিনশো তেষট্টি করি। এই সুন্দর কায়দাদুরস্ত খেলোয়াড়টি নিউ সাউথ ওয়েলস্ দলের সুদিনে খেলতে পারেননি। কিন্তু সুযোগ যখন এলো কিপাক্স তাঁর হিম্মত দেখাতে ভুললেন না। তাঁর 'ট্রাম্পারীও' কায়দার খেলা কিশোরদের নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত করেছে। পরবর্তী যুগের খেলোয়াড়দের খেলা দেখেই বলে দেওয়া যেতো তারা নিউ সাউথ ওয়েলসের, এবং ট্রাম্পার ও কিপাক্সের উত্তরসূরী। মরসুমের মাঝামাঝি আমার পিঠে হঠাৎ ব্যথা শুরু হলো, ফলে কিছুদিনের জন্যে বসে যেতে হলো। বড়দিনের পরে মাত্র একটা প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ নিয়েছিলাম। সময়টা জানুয়ারীর শেষাশেষি হবে—একশো আটাশ করেছিলাম নব্বই মিনিটে, তার মধ্যে চারঠে ছক্কা আর সতেরোটা চার। খেলাটা ছিলো ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে।

একই খেলায় পশ্চিম অস্ট্রেলীয়ার এরনি ব্রমলে নিরানব্বই আর বত্রিশ করলো, আউট না হয়ে। ব্রমলের স্বাস্থ্য আর স্বচ্ছন্দ মারগুলো নিশ্চয়ই নির্বাচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মনে হয়েছিলো যেন আর এক ক্লেম হিল আবিষ্কৃত হলো। পরের কয়েকটা খেলায় মোটামুটি খেলা দেখালেও প্রথমদিককার জেল্লা আর ছিলো না।

এরই মধ্যে 'সিডনি সান' থেকে লেখার জন্যে আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেলাম, বেতারের ঘোষণাও অব্যাহত রইলো। সাংবাদিকতার ব্যাপারটা একটা আলাদা আকর্ষণ, কিন্তু দিনের শেষে ক্রিকেট থেকে মনটাকে সরিয়ে

নেবার অভ্যেসে দুরস্ত হয়ে উঠলাম। নিউ সাউথ ওয়েলসেই আমার ক্রিকেট জীবনের হাতেখড়ি। আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়পরিজন শুভার্থীরা সকলেই সেখানে, কাজেই সে জায়গা ছেড়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিলো না।

কিন্তু এই সময়েই নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের এক সদস্য মিঃ হজেট্সের কাছ থেকে এডিলেডে যাবার আমন্ত্রণ এলো। ওখানে তাঁর শেয়ারের ব্যবসা ছিলো। হজেট্স্ ইংল্যাণ্ড সফর শেষে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

নিউ সাউথ ওয়েলসে সমৃদ্ধির অনেক রাস্তা ছিলো, কিন্তু ক্রিকেট আর আমার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কোনো ব্যাপারেই আগ্রহী ছিলাম না।

তবু, স্ত্রীর ইচ্ছাতেই একরকম আমি এডিলেডের প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলার জন্যে। সেটা ছিলো উনিশশো চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শারীরিক অবনতি হলো, নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ডাক্তারী পরীক্ষায় ওঁরা আমাকে খেলার উপযুক্ত ঘোষণা করলেও, এডিলেডের দুজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলাম। তাঁদের পরিষ্কার জানালাম ইংল্যাণ্ডের সফর প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং সহ-অধিনায়ক হিসেবে বাড়তি দায়িত্বও আছে। একটা পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার পর ওঁরা বিশ্রামেরই পরামর্শ দিলেন।

অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা রাখার আগে আর খেলা চলবে না।

কিপাক্সকে সহ-অধিনায়ক না করে আমাকে সে দায়িত্ব দেওয়া হলো। অথচ নিউ সাউথ ওয়েলসের অধিনায়ক ছিলেন কিপাক্স। বোর্ডের নীতি আমার কাছে পরিষ্কার হলো—আগামী অস্ট্রেলীয় একাদশের অধিনায়ক নির্বাচনের পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ। উডফুলের অধিনায়কত্বে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি, লাভ করেছি অনেক অভিজ্ঞতাও। চিরাচরিত প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন উডফুল। কৌশলের চেয়ে সংগতির দিকেই লক্ষ্য বেশি। এরকম বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ক্রিকেট জগতে বিরল।

খেলোয়াড় নির্বাচন সম্পর্কে মোটামুটি পূর্বধারণা ছিলো, ব্যতিক্রম

শুধু টিপারফিল্ডের নির্বাচন। এ নির্বাচন আমাদের বিস্মিত করেছে। শেষে কিছু সমাধিত সমস্যা আর অসমাধিত কিছুর টানাপোড়েনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সফরের প্রস্তুতি চললো।

ইংল্যাণ্ড : উনিশশো চৌত্রিশে

ইংল্যাণ্ডের এই সফরে জাহাজের কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। আমি প্রাণপণে সারা রাস্তা শরীরের পরিচর্যা করে চলেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ভেঙে-পড়া শরীরের মানুষকে দ্রুত চাঙা করে তোলার কোনো দাওয়াই তো আবিষ্কৃত হয়নি।

যাই হোক, জাহাজে ডেভিস কাপ খেলতে যাচ্ছিলেন যে সব খেলোয়াড়, তাঁদের সঙ্গে হৈ-চৈতেই সময়টা কোথা দিয়ে কেটে গেলো। দলে ছিলেন জ্যাক ক্রফোর্ড, ডন টার্নবুল, আড্রিয়ান কুইস্ট আর ভিভিয়ান ম্যাকগ্রাথ। একটা মজার খেলাও অনুষ্ঠিত হলো জাহাজে—প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকগ্রাথ আর ক্রিকেটের দিকপাল ক্ল্যারি গ্রিমেট। খেলাটা এমনভাবে চললো যাতে গ্রিমেট উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় জয়ী হতে পারেন। তখন গ্রিমেটকে দেখে আপনার মনে হতো যেন উনি এইমাত্র কোনো টেস্টে দশটা উইকেট নিয়ে খেলা শেষ করেছেন। জানি না তিনি খেলার ঠাট্টাটা আদৌ বুঝতে পেরেছিলেন কিনা।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সেই পুরনো সমাদরই জুটলো। পূর্বপরিচিতের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ চললো, নতুন মুখের সঙ্গেও চললো আলাপচারী। লর্ড হেলশ্যাম তখন এম. সি. সি.র সভাপতি। হেলশ্যাম সেই দলের একজন যিনি শত কাজের মধ্যেও ক্রিকেটের জন্যে সময় দিতে পারেন। ওয়েম্বলের ফুটবল কাপ টাই ফাইনালে অতিরিক্ত চমক ছিলো—অস্ট্রেলীয় দলের আগমনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাদ্যবৃন্দের পরিচালক ও তাঁর ভিরানব্বই হাজার সহযোগী 'ফর দে আর জলি গুড ফেলোজ' গাইতে শুরু করে দিলেন।

সাদর অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড।

সাংবাদিকদের এক সংস্থায় ভোজে আপ্যায়িত হলাম আমরা। এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনায় আগের সমস্ত তিক্ততা এক ফুৎকারে উড়ে গেলো।

সফরের আয়োজন করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড আর এম. সি. সি. যুগ্মভাবে। এম. সি. সি.র আশ্বাস ছিলো পূর্বের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতেই খেলা পরিচালিত হবে কিন্তু দিগন্তে মেঘ জমলো—জার্ডিন জানালেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই মরসুমে ক্রিকেট খেলার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কোনোটাই নেই আমার।'

ক্রীড়ামোদীরা কিন্তু খেলা দেখতেই অত্যুৎসাহী এবং তাদের ব্যবহারে তারই প্রকাশ পেলো।

খারাপ আবহাওয়ায় অনুশীলনের অসুবিধেই হলো, তবে অ্যালান ফেয়ারফ্যাক্সের আভ্যন্তরীণ ক্রিকেট বিদ্যালয়ে অনুশীলনের ব্যবস্থা হলো। সেখানেও এক বিপত্তি—বার্ট উডফিল্ডের ভ্রূ কেটে ফাঁক হয়ে গেলো বলের মারে। লোহার একটা খোঁটা থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিলো বলটা। এ ধরনের জায়গাগুলো শিক্ষণের উপযোগী হলেও অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তখনো শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তাই প্রথম খেলা থেকে ছাড় প্রার্থনা করলাম। উডফুল কিন্তু আমাকে খেলতে রাজি করালেন, তাঁর বক্তব্য আমি বসে যাওয়াতে আমাব শারীরিক অসুস্থতার গুজবকে মদত যোগানো হবে এবং ইংল্যাণ্ডের মানসিক বল বাড়ার সহায়ক হবে।

খেললাম। দুশো ছ' রানও হলো। পরিশ্রমও হয়েছিল। রানগুলো দ্রুত ওঠাতে কাগজওলাদের আনুকূল্যও জুটলো, কিন্তু আমি তো জানি ভেতরে ভেতবে আমার কি চলছে। এবং এর ফলশ্রুতি হলো—তার পরের মে মাসেব মধ্যে মাত্র একটা খেলাতেই পঞ্চাশ রানের ওপরে যেতে পেরেছিলাম।

তার মধ্যে দুটো 'শূন্য' রানের ইতিহাসও ছিলো।

গ্রিমেট আর ও'রিলীকে আক্রমণের পুরোধা করা হবে জানা গেলো। আমাদের ব্যাটিংও মোটামুটি ভালই ছিলো। ও'রিলী লিস্টারের এগারোটা উইকেট নিলেন, পলফোর্ড কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধে দুশো উনত্রিশ করলেন,

আউট হননি। পরেই আবার এম. সি. সি.র বিরুদ্ধে করলেন ছ'শো আশি। এবারও নট আউট।

সে সফরে এ ঘটনাগুলোই উল্লেখের দাবী রাখে।

হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে খেলায় 'শূন্য' করার পর লর্ডসে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে আমার খেলা যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো। মিডলসেক্স তো ছ'শো আটায় করে বসে আছে, এদিকে অস্ট্রেলিয়ার উডফুল আর পন্সফোর্ড শূন্য হাতে প্যাভিলিয়ানে ফিরেছেন। আমি গত খেলায় 'শূন্য' করে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। ভাগ্যই বলতে হবে, জিম স্মিথের একটা 'আউট সুইং' আমার স্টাম্প প্রায় ছুঁতে ছুঁতে বেরিয়ে গেলো; এটা খেলার গোড়ার দিকে। তারপর কি থেকে কি হলো জানি না—পঁচাত্তর মিনিটে একশো পুরলো। উনিশটা চার হয়েছিলো ওরই মধ্যে।

অস্ট্রেলিয়ার রান তখন ছ' উইকেটে একশো পঁয়ত্রিশ। পরের দিন একশো ষাট নেবার পর জ্যাক হাল্‌মের স্বপ্নময় ক্যাচে আউট হলাম—জ্যাক তো পুকুরে গড়িয়েই পড়লো বল ধরার পর। টমি এনথোভেন হ্যাটট্রিক করায় খেলার উত্তেজনা বাড়লো। যেহেতু এই খেলার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম, সেজন্যে এ খেলার সম্পর্কে উইলিয়াম পোলকের বক্তব্য উদ্ধৃত করলাম:

"যাঁরা ক্রিকেট ভালবাসেন তাঁদের এক স্মরণীয় দিন কেটেছে গত শনিবার লর্ডসের মাঠে। চল্লিশ বছরেরও বেশি ওই মাঠে আমার যাতায়াত এবং ডব্লিউ. জি., রনজি, ট্রাম্পার, ফ্র্যাঙ্ক উলি, ম্যাকার্টনি, জেসপ, হ্যামণ্ড আর হবসের মতো খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের ব্যাটের যাদু মুগ্ধ করেছে আমাকে, কিন্তু ওই দিনের ব্র্যাডম্যানের শত রান যেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে, এর শ্রেষ্ঠতা মহাকাব্যীয়। উডফুল আর পন্সফোর্ড শূন্যহাতে ফিরে যেতে নামলেন 'লা' ডন। প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত অনিশ্চয়তার পর ডন ওদের নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করলেন। সময়ের মাপে এমন অনবদ্য মার আগে দেখিনি। বল কখনো সোজা কভারে, কখনো বোলারদের শরীর ঘেঁষে, লেগের নিশানায় কখনো, আবার স্লিপের ফাঁকে—উড়ে চললো বল, যাদুর স্পর্শে প্রাণ পেয়ে। স্মিথের ফাস্ট বল,

রোবিনসের স্লো বল, ইয়ান পিবলসের বিলম্বিত বল সবই ব্যর্থ হলো তার কাছে। সবই ডাল-ভাত। 'লা' ডন অনুপ্রাণিত হয়ে খেলে চললেন, কখনো বাঁ পা বাড়িয়ে কখনো নাচের ভঙ্গিতে খেলেই চললেন যাদুকর। একসময় মনে হলো এ খেলা বুঝিবা শেষ হবে না কোনোদিন। এই পঁচাত্তরটি মিনিট যাঁরা বল দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতিপটেও উনি চিরকাল বিরাজ করবেন, দশটি বাউণ্ডারী ওইটুকু সময়ের মধ্যে মারাও অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন বলা যায়। 'লা' ডন মরসুমের সেরা ইনিংস খেলে গেলেন। উনি বা আর কেউ যদি ওই খেলার পুনরাবৃত্তি করেন বা করতে পারেন, আমি অবশ্যই সেখানে হাজির থেকে আনন্দের ভাগীদার হবো। জবাব নেই…"

পোলক দেহ রেখেছেন, কিন্তু এ বর্ণনাটুকুর জন্যে আমি চিরঋণী থেকে গেলাম।

টেস্টের খেলাগুলোয় হার তো এড়ানো গেলো, কিন্তু সমালোচকদের কলম থামলো না। উডফুল নিজেও বসে গেলেন টেস্টের পূর্বমুহূর্তে। জার্ডিন তো খেললেনই না, তাঁর পয়লা নম্বর সাকরেদ বব উইয়াটও আঙুল মটকে বসলেন। সিরিল ওয়ালটারস নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করলেন। বড্ড কমজোরী মনে হয়েছিলো ওয়ালটারসের নায়কত্ব, কারণ মানুষটা নির্বিরোধী মেজাজের।

খেলা উত্তেজনার চরমে উঠেছিলো, এবং কোনো সেঞ্চুরী না হলেও চিপারফিল্ড নিরানব্বই করেছিলেন লাঞ্চের আগেই। তারপর অপ্রত্যাশিত-ভাবে আউট হয়ে যান ক্যাচে। উইকেটরক্ষকের হাতেই উঠলো ক্যাচ।

এ খেলার আর এক বৈচিত্র্য সুদর্শন কেনেথ ফারনেস। টেস্টের প্রথম খেলাতেই দুটো ইনিংসে পাঁচটা করে উইকেট নিলেন শিক্ষক ফারনেস। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভদ্রলোক। পরে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় ফারনেস মারা যান। খেলাশেষের দশ মিনিট আগে জয়সূচক রানটি হয় সে খেলায়।

ইংরেজ আম্পায়ারদের ওপর আমার অপার শ্রদ্ধা। মিচেলকে এল. বি. ডব্লিউ. দিতে হয়েছিলো ডলফিনকে (আম্পায়ার), নিজেদের খেলোয়াড়

হওয়া সত্ত্বেও তবে একথাও বলা যায় যে আম্পায়ারদের সমালোচকদের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। এই ধরনের একটা খবর বেরিয়েছিলো যেটা পড়লে পাঠকদের ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হবে: "যে বলে ব্র্যাডম্যানকে আউট করা হলো সে বল তাঁর প্যাড বা ব্যাট ছোঁয়নি। বলটা এসেছিলো এম্‌সের প্যাডে লেগে। কিন্তু এম্‌স্ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওয়ালি হুঁশিয়ার!' ডলফিন ভুল বুঝে, ডন্‌কে আউট দিলেন।" আমি কিন্তু সানন্দে ঘোষণা করছি যে ডলফিন 'ভুল' করেননি। কারণ বলটা আমার ব্যাটে লেগে, উইকেটকিপারের গ্লাভস্ ছুঁয়েছিলো। আম্পায়ারদের 'ভুল' হয়ই কিন্তু প্যাভিলিয়ানে বসে থাকা সমালোচকদের মতো 'ঝুড়ি ঝুড়ি' নয়!

এর মধ্যে আবার এক গুজব ছড়িয়ে পড়লো—কিপাক্স নাকি টেস্টে খেলার জন্যে নির্বাচিত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, শুধু তাই নয়—আমি দ্বিতীয় ব্যাটে নামাতে তা নিয়েও সোরগোল উঠলো।

ইংল্যাণ্ডের মাঠগুলো দড়ি ঘেরা থাকার ফলে যে কোনো মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারতো মানুষ, অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু এটা নেই। হলোও তাই, নটিংহ্যাম টেস্টে খেলাশেষে লোকে হুড়হুড় করে ঢুকে পড়লো মাঠে, দৌড়ে পালাতে গিয়ে তো দড়িতে পা গেলো আটকে। এতে শুধু আমিই পড়লাম না, পেছনের লোকটাও গেলো। আঘাত এমন হলো যে সে খেলায় তো বসে গেলামই, আর পরেরটায় আমার বদলি লোক রইলো শুধু দৌড়বার জন্যে। দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের পরাজয় হয়েছিলো। ইংল্যাণ্ড তো চারশো চল্লিশ করে বসে রইলো, আমরাও ওই সংখ্যায় পৌঁছনোর চেষ্টা চালালাম, কিন্তু বৃষ্টিতে সব ভেস্তে গেলো। বৃষ্টি আর ভেরিটি মিলে পনেরোটা উইকেট ফেললো, তার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে তেতাল্লিশ রানে আট উইকেট। ইংরেজদের মতো অস্ট্রেলীয়দের ভিজে উইকেটে পেরে ওঠা সম্ভব ছিলো না, কিন্তু তা হলেও ভেরিটির সেইদিনের খেলার মোকাবিলা করা ক্ষমতা কোনো ব্যাটসম্যানের ছিলো বলে মনে হয় না। রানের সমষ্টি পরিমিত হওয়া সত্ত্বেও খবর বেরোলো, মনে রাখার মতো খবর—লিখলেন কার্ডাস: "অদৃষ্টকে ধন্যবাদ যে ব্র্যাডম্যান আউট

হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, যদিও তিনি নামার মুহূর্তেই ফারনেসকে বল করতে দেওয়া হয়েছিলো। ব্র্যাডম্যান যে ফাস্ট বল পছন্দ করেন না, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ব্র্যাডম্যান তার প্রথম বলে চার মারলেন, দ্বিতীয়টা বাউণ্ডারী—মারে কিছু টান ছিলো। অনবদ্য মার। ওভারের শেষ বলটা খেলা হলো চমৎকার কভার মারে। একই ওভারে ব্র্যাডম্যান 'অফে' পেছনের পায়ে একটা দুইও পিটিয়েছিলেন।

অন্য কোনো জীবিত ব্যাটসম্যানের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব হলে কয়েক গজ হয়তো যেতে পারতো বলগুলো। এককথায় বলতে গেলে ব্র্যাডম্যানের খেলা ইতিহাস রচনা করেছে ওইদিন। ফারনেস তার প্রথম ওভারে চোদ্দ রান দিলেন ব্র্যাডম্যানকে। এর পর এলেন গিয়ারী। প্রথম বলেই অফে চার রান উঠলো। সেখানে আর এক ফিল্ডসম্যান বাড়ানো হলে তার শূন্য জায়গায় বল ছুটলো এবার। গিয়ারীর দিক থেকে ভেরিটি বল দিলেন এবার। এবারও সেই চার—সপাটে। ফিল্ডসম্যানেরা সব পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে। মারের গতি অপ্রতিহত বেড়ে চললো। ব্র্যাডম্যানের ব্যাট থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ ফেরাইনি। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে ক্রমেই। তারপর ভেরিটির আর একটা বলে চার উঠলো, তারপর আবারও তিন বলে তিনটে বাউণ্ডারী—গর্বে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হলো। ওঁর ইনিংসও শেষ হলো, আমার অস্বস্তিও বাড়লো—কেমন একটা অসুস্থ অনুভব। সমালোচকদের মাথা দুলে উঠলো। আমার কিন্তু মনে হলো ব্র্যাডম্যানের আজকের ছত্রিশ তাঁর লীডসের খেলার তিনশো চৌত্রিশের চেয়েও বেশি, পাওয়ার দিক থেকে। প্রতিটি মার জীবন্ত। নিখুঁত খেলা, যার কাছে ট্রাম্পার বা টিল্ডস্‌লের খেলার পারিপাট্যও ম্লান হয়ে যায়।"

ফলোঅনের নিয়ম কি বিরাট গুরুত্বের হতে পারে, অনুভব করলাম—আমাদের প্রথম ইনিংসে যদি সাতটা রান জুটে যায় তাহলে ইংল্যাণ্ডকে আবার ব্যাট করানো যায়। উইকেটের শোচনীয় অবস্থাও সাহায্য করবে খানিকটা। খেলার ফলাফলও অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু ওদের বোলারদের অভাবনীয় কৃতিত্ব এর মূলে কুঠার মারলো।

প্রাদেশিক পর্যায়ে খেলা চললো, সেই সময়ে গ্লস্টারশায়ারের একটা কাগজে মজার খবর বেরিয়েছিলো, খবরটা এইরকম :

অস্ট্রেলিয়ান্‌স্‌ বনাম সামারসেট

ডন ব্র্যাডম্যান যদি জোন্সের গ্যারেজে আসেন তাহলে উপহারস্বরূপ একটা অস্টিন সেভেন পেতে পারেন। এক ডজন স্টকে আছে ॥

মালিকের প্রখর ব্যবসাবুদ্ধি আর রসবোধে খুশী হলাম, কিন্তু আজকের যন্ত্রযান-দৈন্যের দিনে এ ধরনের বিজ্ঞাপনে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? আমি অবশ্য ওঁদের প্রস্তাবে সাড়া দিইনি। আর এক ইংরেজ দানবীরের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—আমরা যেদিন গল্‌ফ্‌ খেলতে নামি সেদিন তিনি এক পুরনো গাড়ি পুরস্কার হিসেবে দেবার ঘোষণা রাখলেন। আর্থার চিপারফিল্ড পুরস্কার লাভ করলেন। তারপর সেটার কি গতি হয়েছে আমার মনে নেই। পুরনো স্মরণিকার ব্যাপারে একটা চেকের কথা মনে আছে, ডঃ ডব্লিউ. জি. গ্রেসের নামে চেকটিতে তাঁরই স্বাক্ষর ছিলো। সেটা উনিশশো সাত সালে ভাঙানো হয়, আমার জন্মের এক বছর আগে। কিন্তু চেকটি আমার কাছেই আবার আসে। নামী লোকের ওই একটি স্বাক্ষরই আমার কাছে আছে।

এই সময়ে নানা রকম ব্যাপারে আমাদের উত্ত্যক্ত হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের অসুখের কথা মনে পড়ছে—উইম্বলডন থ্রোট (throat)। ম্যানচেস্টার তৃতীয় টেস্টে আমাদের প্রচণ্ড তাপের শিকার হতে হয়েছে—কিপাক্স তো খেলতেই পারলেন না, আমি আর চিপারফিল্ড বিছানা থেকে উঠে উইকেটে নিয়েছি আবার খেলার পর ফিরে বিছানায় উঠেছি। আমাদের ডিপথেরিয়া হয়েছে সন্দেহ করা হলো, কিন্তু যীশুকে ধন্যবাদ—সেরকম কিছু আর হয়নি।

এই টেস্টে স্লো উইকেটের কথা এখনো মনে আছে, বোলারদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে খেলতে গিয়ে। ও'রিলীর ভাগ্যটাই খারাপ, তার

হাতে দুশো চোদ্দ রান উঠলো। কাগজের লোকেরা একসময়ে এতো বিরক্ত হয়েছিলেন যে সময়ের আগেই উঠে গেলেন খাওয়া-দাওয়া সারতে। ওই ক' মিনিটের মধ্যেই ও'রিলী চতুর্থ বলের মাথায় স্লিপে সাটক্লিফের উইকেট ফেলে দিলো। এখানেই শেষ নয়—উইয়াটকে 'ক্লিন বোল' করলো, হ্যামণ্ডের চারের মারও নস্যাৎ করলো। সাংবাদিকেরা ফিরে এলেন, উত্তেজনাও ঝিমিয়ে গেলো। তাঁদের আবার বসে বসে হেন্‌ড্রেন আর লেল্যাণ্ডের সেঞ্চুরী দেখতে হলো, এর মধ্যে আর একটা উইকেটও পড়েনি।

একসময়ে মনে হয়েছিলো অস্ট্রেলিয়াকে বুঝি বা ফলোঅনে বাধ্য হতে হবে, কিন্তু আমাদের শেষ জুটিকে ধন্যবাদ: ও'রিলী আর ওয়াল চালিয়ে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত একতরফাই হলো খেলা। অসুখ থেকে উঠতে আবার ক্রিকেটের চিন্তা মাথায় ঢুকলো এবং ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে খেলে আনন্দই হলো—বিল উড্‌ফুলের সঙ্গে নেমে একশো উননব্বই করা গেলো, তার মধ্যে আমার হলো একশো চল্লিশ, একশো পনেরো মিনিটে। বাইশটা চার আর দুটো ছক্কাও মেরেছিলাম খেলায়। আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছি—কারণ বিপক্ষে ছিলেন ভেরিটি।

লীডসের টেস্টে বৃষ্টিই বাঁচিয়ে দিলো ইংল্যাণ্ডকে। প্রচণ্ড উত্তেজনার খেলা—ইংল্যাণ্ডের খেলা শেষ হলো দুশোতে। মাঠের অবস্থা ভালোই ছিলো। দিনের শেষে, যখন সাকুল্যে মাত্র সাঁইত্রিশ রান হয়েছে ব্রাউনকে হারালো অস্ট্রেলিয়া। পরের দিনের ভরসায় ঠেকা দেবার জন্যে বার্ট ওল্ডফিল্ডকে নামালেন উডফুল। কিন্তু দু রানেই বার্ট ক্যাচে বসে গেলেন। স্বয়ং অধিনায়ক মাঠে গেলেন এবার, কিন্তু বাওয়েসের বলে তিনটে রান পকেটে ফিরলেন তিনিও। মোট হলো উনচল্লিশ। এর পরের উইকেট পড়েছিলো— ছটা বাজতে দশ মিনিট বাকি তখন। পন্সফোর্ড পা দিয়ে একটা 'বেল' ফেলে দিলেন ভেরিটির একটা বল 'হুক' করতে গিয়ে। পরিচ্ছন্ন ইনিংস্ খেলেছিলেন পন্সফোর্ড। রান হয়েছিলো একশো একত্রিশ। পন্সফোর্ডের ব্যাট স্বাভাবিক মাপ থেকে 'চওড়া' বলা হতো, বল নাকি গলতো না তা দিয়ে। সিডনির এক আম্পায়ার তো সত্যি ভেবে ব্যাট পরীক্ষা করতে বসলেন। ব্যাটের বিস্তার ছিলো সওয়া চার ইঞ্চি।

যাই হোক—আমি ব্যাট ছাড়লাম তিনশো চার রানে। ফর্মে ফিরে আসছি ভেবে আনন্দ হলো খুব। উনিশশো তিরিশের মরসুমের তুলনায় কিছুই নয় যদিও, কিন্তু এর বিরাট নৈতিক প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। স্বল্প রানের কয়েকটা খেলার পর দীর্ঘ এই ইনিংস আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছিলো। সাজঘরে ফেরার পর আমার আর কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না, সতীর্থরাই কাপড় পাল্টানোর কাজটা করেছিলেন। ম্যাসাজের টেবিলেও তাঁরাই বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই খেলার ফিল্ডিংয়ে আবার আর এক ফ্যাসাদ হলো, উরুতে প্রচণ্ড চোট লাগলো, একেবারে নার্সিং হোমে গিয়ে উঠতে হলো। তিন সপ্তাহ খেলা বন্ধ রইলো আমার।

পরের খেলা খেললাম ওভালে, পঞ্চম টেস্ট।

স্যর ডগলাস শীল্ডস, যাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলাম, বেশ উদ্বিগ্নই হলেন। পায়ের অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে গেলেও তাঁর পরামর্শে আরও কিছুদিন বিশ্রাম নিতেই হলো। বিশ্রামস্থল তাঁরই ফার্নহ্যাম কমনের বাড়ি।

স্যর ডগলাসের ছিমছাম বাড়িটার ঠিক পেছনেই একফালি বন ছিলো। সেখানেই রোজ প্রাতঃকালীন বেড়ানো চললো আমার। পাখি আর কাঠবিড়ালী দেখে কাটতো সময়। ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর তুলনা নেই।

উডফুল অবসর যাপন করছিলেন তখন, এবং চতুর্থ টেস্টের সময় তিনি নিজে থেকে বসে গেলেও শেষ টেস্টে তাঁকে নামতে দেখে উল্লসিত হয়েছি। উডফুল পুরো ফর্মে নামলেন—সে খেলায় অস্ট্রেলিয়া বিরাট রানের ফারাকে জিতেছিলো।

ইংল্যাণ্ডের কপালে সে মরসুমে দুর্ভাগ্য লেখা, না হলে প্রবীণ ফ্র্যাঙ্ক উলিকে খেলাতে যাবে কেন? ও'রিলীর সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না ভদ্রলোক। আরও কেঁচে গেলো ব্যাপারটা, যখন এম্‌স্‌কে বাতের জন্যে বসে যেতে হলো। ফলে উলিকে উইকেটরক্ষণে এগিয়ে আসতে হলো—যে কাজ তাঁর নয়। এছাড়া বাওয়েসও খেলা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

আরো একবার পন্সফোর্ড আর আমি চারশো একান্ন করেছিলাম,

আমার ভাগ ছশো চুয়াল্লিশ। দ্বিতীয় উইকেটে এটা বিশ্ব রেকর্ড বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এখানে উল্লেখ্য, নটিংহ্যামের সঙ্গে প্রাক-টেস্ট খেলাতে 'প্রত্যক্ষ আক্রমণে'র ব্যাপারটা প্রথম সংঘটিত হয়—ভোসিই শুরু করেছিলেন সেটা। বেশ খানিকটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিলো এতে।

পঞ্চম টেস্টে আবার ন্যাটা ক্লার্ক এটা চালু করলেন—পুরো 'লেগে'র মাঠ জুড়ে। কাগজে লিখলো, 'অস্ট্রেলিয়ায় ভোসি আর লারউড যা করেছেন প্রায় তাই-ই।' দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাউন আর পন্সফোর্ড দুজনেই 'লেগে'র ফাঁদে পড়লেন, কিন্তু ম্যাক্‌ক্যাব আর আমি আক্রমণাত্মক খেলা চালালাম। ক্লার্ক বাধ্য হলেন তাঁর বলের ধারা পাল্টাতে।

আর একবার অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেলো। উডফুলের জন্ম-বার্ষিকীর শুভদিনও ছিলো সেটা।

এর পরের দুটো প্রথম শ্রেণীর ইনিংসের প্রথম হলো ফোকস্টোনের সঙ্গে—একশো উনপঞ্চাশে নট আউট ছিলাম। দ্বিতীয়টা স্কারবরোতে—লেভসন-গাওয়ার একাদশের বিপক্ষে, এতে একশো বত্রিশ। আগের খেলায় একটা ওভারেই করেছিলাম তিরিশ, তিনটে ছক্কা আর তিনটে চার। ফ্রিম্যান বল করছিলেন। রান তুলতে সময় লেগেছিলো একশো পাঁচ মিনিট।

স্কারবরোর সেঞ্চুরীটা, আমার মতে, মিডলসেক্সের খেলার সঙ্গেই আমার মনে স্থায়ী আসন পেয়েছে। ব্রাউন তিন রানের মাথায় ফারনেসের বলে আউট হয়ে গেলো। তারপর আমি খেললাম। ভেরিটি, বাওয়েস, নিকল্‌স্ আর ফারনেসের সম্মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত করে লাঞ্চের আগে প্যাভিলিয়নে ফিরলাম। আমার রান তখন একশো বত্রিশ।

প্রকৃত ক্রিকেটের শেষ হলো বিল উডফুলের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে।

সফরের বিস্তারিত খবর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে একটা কথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়—সেটা হচ্ছে—আমাদের 'স্পিন' বোলার ও'রিলী আর গ্রিমেটের কথা। ওরা না থাকলে এ সফরের কাহিনী হয়তো অন্য

ভাষায় লিখতে হতো। ও'রিলী তো বিপক্ষীয় ব্যাটসম্যানদের বিভীষিকার বস্তু হয়েছিলো। গ্রিমেটও। তাঁর বয়সের ভার সত্বেও ওর প্রায় সমকক্ষ বলেই দাবী রেখেছেন। টেস্টের খেলাগুলোতে এরা দুজনে তিপান্নটা উইকেট নিয়েছে, অন্যরা সবাই মিলে আঠারোটা।

ফ্লিটউড-স্মিথ গ্রিমেটের পরের স্থানে থাকলেও, পরে সুনাম বেশিই কুড়িয়েছেন, প্রথম সারিতে আসার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলা খেলে। টিম ওয়ালের পায়ে চোট লেগে খেলা নষ্ট হলো। এবলিং বদলী খেলোয়াড় হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও বলের 'দাপট' ছিলো না তার। ব্রমলের খেলা সকলকে নিরাশ করেছে, ইংল্যাণ্ডের মাটির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি সে তার খেলার।

পরে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের জন্যে খেলাই ছাড়তে হয়েছে তাকে; ব্যাটিংয়ের বাহাদুরি নিতে পেবেছে পন্সফোর্ড আর ম্যাক্‌ক্যাব। নিজের কথা আর নাই বা বললাম। ম্যাক্‌ক্যাব সফরের সবচেয়ে বেশি রানের দাবিদার।

সকলেই ভালো খেলেছে, যদিও সব খেলায় না। তবু, কৃতিত্ব কারুর ব্যক্তিগত নয় বলবো।

আমাদের নামই হয়ে গিয়েছিলো 'নিঃশব্দ ষোলজন'। কারণ, আমরা মাঠে বাদানুবাদের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলাম না। এটা সম্ভব হয়েছিলো বুশবি (ম্যানেজার) আর উডফুলের নেতৃত্বের জন্যে। এসবের পরে একটা কথাই মনে হয়েছে—ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটে পুনর্যৌবন ফিরিয়ে আনা দরকার, কারণ উলিকে দিয়ে তো অনন্তকাল চালানো যাবে না।

আমাদের দল মফস্বল থেকে লণ্ডনে এলো—এবার বাড়ি ফেরার পালা। এরই মধ্যে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। সেদিনই আমার এক এনগেজমেণ্ট ছিলো হোটেলে। বাউরালের এক স্কুলের বন্ধু আসছে। কিন্তু রোগের লক্ষণ এতো প্রবল হলো যে ডঃ রবার্ট লি'কে ডাকতে হলো। তিনি সেইদিনই বিকেলে একবার এলেন, আবার পরের দিন সকালে আর একবার, কিন্তু রোগ ধরা পড়লো না। এর মধ্যে ডাক্তার মফস্বলে চলে গেলেন কিছুদিনের জন্যে। তারপর ফিরে এলেন তিনি, বললেন আমার

চিকিৎসার ব্যাপারটা নিয়েই তিনি এ ক'দিন ভেবেছেন এবং রোগটাও মোটামুটি ধরতে পেরেছেন—আমার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি অস্ট্রেলীয় শল্যচিকিৎসক স্যর ডগলাস শীল্ডসকে খবর দেবার অনুরোধও করলেন। ওঁরা দুজনে বসে একমত হলেন। আমি অসুস্থ একথা সতীর্থরা জানতে না জানতেই অস্ত্রোপচার হয়ে গেলো। ডঃ শীল্ডস তাঁর পার্ক লেন নার্সিং হোমে করলেন অস্ত্রোপচার।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কাটলো সময় কিছু। এদিকে অস্ট্রেলিয়াতে আমার স্ত্রী আমার মৃত্যুসংবাদ পেলেন! এ গুজবটা খুব রটেছিলো সেই সময়ে। অবস্থাটা বুঝুন! অস্ট্রেলীয় বিমান-নায়ক স্যর চার্লস কিংসফোর্ড-স্মিথ তখন শতবার্ষিকী বিমান প্রতিযোগিতার জন্যে মহড়া চালাচ্ছিলেন, আমার স্ত্রীকে তাঁর বিমানে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলেন। দরকার অবশ্য হলো না। ভদ্রলোক পরে ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিমান পাড়িতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে তো ভুলতে পারি না।

পার্থ পর্যন্ত প্লেনে এসে 'মালজা' ধরেছিলেন আমার স্ত্রী, কারণ জাহাজ বেশ কিছুদিন আগেই সিডনি ছেড়ে এসেছে। সংশ্লিষ্ট সকলেই অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন তাঁর সঙ্গে। জাহাজেই আমার স্ত্রী সঠিক খবর পেলেন, অর্থাৎ আমি জীবিত, জানলেন। আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্যর ডগলাসের সহৃদয়তাও আজীবন মনে রাখার মতো। আমার এতোদিনের অসুস্থতার একটা স্থায়ী হিল্লে তো করলেন তিনি। এছাড়া উনি আমাকে পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ছাড়া পেলাম আমার স্ত্রী ইংল্যাণ্ডে পৌঁছবার আগের দিন। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের অনেকেই তাঁদের বন্ধুতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। চালকসহ একখানা গাড়িও হুজুরে হাজির হলো। চললো লণ্ডনের নানা দ্রষ্টব্য দেখা। বিশ্রামও জুটলো। শরীরে বল ফিরে এলেও, চোখের কিছু কিছু অসুবিধে দেখা দিলো—চশমা নিতে হলো।

বিশ্রামের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপারও চাপিয়ে দেওয়া হলো ঘাড়ে যা নিজে নিতে চাইনি। শান্ত সমুদ্রতট, সমুদ্রভ্রমণ, মফস্বলের খামার বা অ-ক্রিকেটজনোচিত পরিবেশে সময় কাটানো এগুলোর অন্যতম। অস্ট্রেলিয়ায়

ফিরে যাবার আগে সস্ত্রীক এডিনবরা পর্যন্ত গাড়ি করে বেড়ানো হলো চাঁদের আলোয়।

পার্থে মিঃ বেলের সস্ত্রীক আতিথ্যও নেওয়া হলো। হুইস্কির সঙ্গে সঙ্গে বেলসাহেবের নাম প্রায়শঃই উচ্চারিত। ও রসে বঞ্চিত বলে পানীয়টি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু ভদ্রলোকের আতিথ্যের প্রশংসা আমাকে করতেই হবে। ভদ্রলোককে বিশ্বপ্রেমিক বলতে হয়—কারণ ক্রিকেট খেলাকে স্কটল্যাণ্ডে জনপ্রিয় করে তুলতে সময় বা অর্থব্যয়ের কোনো ত্রুটিই রাখেননি।

লণ্ডনে একটা মধুর দিন কেটেছিলো জন বারন্‌সের সঙ্গে, উনি প্রদর্শকের ভূমিকায় ছিলেন সেদিন। বার্নস পরে শ্রমিক দলের প্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রী নির্বাচিত হন। অনেক অদেখা দ্রষ্টব্য স্থানও ঘোরা হলো। লণ্ডন সম্পর্কে এমন ওয়াকিবহাল মানুষ আর চোখে পড়েনি।

এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের শীত অনুভূত হলো। ক'দিন পরে ইয়োরোপ ঘুরতে বেরোনো গেলো। বড়দিন কাটলো ফ্রান্সে, তারপর ঘরে ফেরার পালা।

অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে গ্রীষ্মের বাকি দিনগুলোতে ক্রিকেটের নিষেধ ছিলো—বাউরালে চলে গেলাম ঘরের ছেলে হয়ে।

তিন মাস পরে আবার স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে এলাম।

উনিশশো চৌত্রিশের ইংল্যাণ্ড সফর পরস্পরবিরোধী আবেগের মধ্যেও স্মরণে থাকবে—বস্তুতঃ, আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা চাঞ্চল্যেরও।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াতে

উনিশশো পঁয়ত্রিশের 'অ্যানজ্যাক' দিবসে (Anzac Day) আমি এডিলেডে আমার নতুন কাজে ফিরে গেলাম। স্টক শেয়ারের ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না। শেখবার অনেক আছে এটাই মনে হলো শুধু। এ ধরনের কাজের একটা আলাদা আবেদনও ছিলো আমার কাছে, কারণ শেয়ার-বাজারের ব্যাপারে জটিলতা বহুবিধ। সাধারণের

ধারণা এর সম্পর্ক শুধু কোম্পানীগুলোর সঙ্গে। কিন্তু ক'জন মানুষ জানে যে আজকের দিনে যে কোম্পানী যৌথ মালিকানায় কাজ করছে সেটাই দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যের সংস্থাপনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলো ?

গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের প্রভূত উন্নতি হলো। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার জন্যেই এটা সম্ভব হলো। পূর্ণ বিশ্রাম আর অ্যাপেণ্ডিক্সের অন্তর্ধানও বলা যায়। পেশীগুলোকে কর্মক্ষমও করা হলো গলফ খেলে। স্রেফ মজা-কো-ওয়াস্তে মাউন্ট অসমোণ্ড ক্লাবের প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিলাম, আশ্চর্য হলাম—আমি জিতেছি! হেঁটে বেড়ানোতেও উপকার হলো, সম্ভবতঃ গলফে আমার অন্যদের চেয়ে জায়গা বেশী লাগে বলে।

তো, আমার আগেকার উদ্যম নিয়েই আবার শুরু করলাম খেলা, নতুন রাজ্যের হয়ে।

নিউজিল্যাণ্ডের পথে এম. সি. সি. দল এডিলেডে থেমেছিলো। একটা খেলাও হলো, আমি সুবিধে করতে পারিনি তাতে।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রান করেছিলো আমাদের বাচ্চা খেলোয়াড় চার্লি ওয়াকার। চার্লির সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়ছে, নিজেকে গালাগাল দেবার অভ্যেস ছিলো তার। উনিশশো তিরিশের ইংল্যাণ্ড যখন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া সফরে এসেছিলো, চার্লি ভালো ব্যাটের কাজ দেখাতে পারেনি। ওই সময়েরই শেষের দিকের এক খেলায় ওর সতীর্থরা সাজ-ঘরে ওকে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছিলো, বিষয়ঃ চার্লি একটা রান করেছিলো। এটাকে মরসুমে হাজার রানের ইঙ্গিত কল্পনা করে বিপক্ষীয় অধিনায়ক এগিয়ে এসে অভিনন্দিত করে প্রশ্ন রাখলো, 'হাজার হলো বোধ হয় ?' ঝটিতি উত্তর এলো চার্লির, 'না, সবে পঞ্চাশ।'

অস্ট্রেলীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গেলে আমি বাদ পড়লাম—ডাক্তারের নিষেধ। উডফুল অবসর নিয়েছেন, ভিক রিচার্ডসন নেতৃত্ব নিলেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হলো। এই প্রথম আমি কোনো শেফিল্ড শীল্ড দলের অধিনায়ক হবার যোগ্যতা অর্জন করলাম।

আমার পূর্বতন রাজ্য দলের সঙ্গেই প্রথম খেলা পড়লো। সুস্থ হবার পর প্রথম বড় খেলাও। স্কোরের বই খুলে দেখলাম তাতে একশো সতেরো রান করেছিলাম (দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে খেলার চেয়ে মাত্র এক রান কম)। কিন্তু এবার এর জন্যে কি পরিশ্রমটাই করতে হলো। পেশীগুলো পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর মারের অধিকাংশই এক-এর মার। তবু এক ইনিংসে জয় হয়েছে আমাদের। কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে পরের খেলায় আমার পূর্বের উদ্যম ফিরে আসছে লক্ষ্য করে খুশী হলাম। এ খেলায় করলাম দুশো তেত্রিশ। এডি গিলবার্টের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হলো—আগের খেলায় গিলবার্ট বড় তাড়াতাড়ি প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছিলো। এবার গিল্‌বার্ট একশো একুশ রানে দুটো উইকেট নিতে পেরেছিলো, কিন্তু এবারও ক্ষতি হলো আমাদের—ওর বলে হাতটা ভাঙলো।

নববর্ষের দিন খেললাম ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে, মেলবোর্নের মাঠেই। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মোট পাঁচশো উনসত্তর রানের মধ্যে আমি করলাম তিনশো সাতান্ন। মেলবোর্নের মাঠে এটাই আমার সর্বোচ্চ রানসংখ্যা। কিন্তু, তবু জয়ের জন্যে পর্যাপ্ত রানসংখ্যা দাঁড়ালো না, সময়াভাবে। এই মরসুমে তাসমানিয়ার জ্যাকি ব্যাডককের সঙ্গে খেলতে পারায় আনন্দ হয়েছিলো বইকি। সুন্দর ছেলেটা—তার আটত্রিশে ইংল্যাণ্ডে ব্যর্থতার উন্মূল হয়েছে পরের অন্য খেলাগুলোতে। আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করবার চেষ্টা করেছি তার সঙ্গে মাঠে, এবং আমাদের খেলায় যথেষ্ট মিলও লক্ষ্য করেছি। মরসুমের শেষ খেলায় ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাডকক তিনশো পঁচিশ করেছিলো।

শেফিল্ড শীল্ড আমাদের ঘরে এলো, অপরাজিত ছিলাম সারা মরসুম। ন' বছরে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম জয়।

এই জয়ে আনন্দ হয়েছে নিশ্চয়ই। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির একটা চিঠিও পেয়েছি এ সময়ে, সেটা আজও সযত্নে রেখেছি কাছে। চিঠির বক্তব্য ছিলো :

প্রিয় ডন,

রিচার্ডসন, গ্রিমেট, লি, নিটসকে, লোনারগ্যান ও টোবিনের মতো ছ'টা দুর্দান্ত খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি যে কোনো নতুন অধিনায়কের উদ্দীপনায় ভাঁটা ধরাবার পক্ষে যথেষ্ট। নতুন দল গঠনের সমস্যার মোকাবিলা আপনি এবং আপনার সহ-নির্বাচকরা যেভাবে করেছেন এবং যেটুকু উপাদান ছিলো তা দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করেছেন সেজন্যে আমরা গর্বিত।

আমার নিজের এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট সংস্থার তরফ থেকেও আপনার প্রচেষ্টার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, তার ফলাফলেও।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
(স্বাঃ) বি. ডি. স্কিমগার
সভাপতি, দঃ অঃ ক্রিকেট সংস্থা।

প্রথম বারের অধিনায়কত্বে এ অভাবনীয় সাফল্যে আর তরুণ খেলোয়াড়দের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় কার না আনন্দ হয়?

একটা মাত্র খেলা তখনো বাকি—তাসমানিয়ার সঙ্গে। আমি আবার সেই পুরনো দিনে যেন ফিরে গিয়েছি—তিনশো উনসত্তর করে ফেললাম। এডিলেডের মাঠের, আর দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ারও সর্বোচ্চ রান। ক্লেম হিলের রেকর্ডও ভাঙলো। ক্লেমের একটা কৌতুকপূর্ণ টেলিগ্রাম পেলাম:

'অভিনন্দন-ক্ষুদে শয়তান, রেকর্ড ভাঙার জন্যে।'

এই রানসংখ্যার সময়ের একটা তালিকা দেওয়া উচিত মনে হচ্ছে:

প্রথম পঞ্চাশ	—	৪০ মিনিটে
দ্বিতীয় "	—	৩০ "
তৃতীয় "	—	৩৬ "
চতুর্থ "	—	৪৭ "
পঞ্চম "	—	২১ "
ষষ্ঠ "	—	১৯ "
সপ্তম "	—	২৯ "
শেষ উনিশ রান	—	১১ "
		৩৬৯ রান = ২৩৩ মিনিটে

রন হ্যামেন্স এই খেলায় প্রথম নামেন। একশো একুশ করেছিলেন রন, এবং আমার সঙ্গে জুটিতে তিনশো ছাপান্ন তৃতীয় উইকেটে। এটাও রেকর্ড দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার।

গাবি অ্যালেনের দল

ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের সময়টা দোদুল্যমান অবস্থায় কেটেছে অস্ট্রেলিয়ার। সিডনির এক প্রদর্শনী খেলায় এর শুরু, শিকার—ওয়ারেন বার্ডসলে ও জ্যাক গ্রেগারী। ওয়ারেনের পুরো ফর্মের খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে তাঁর অবদানের কথাও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি ছাড়া প্রথম শ্রেণীর খেলায় পঞ্চাশটার বেশি সেঞ্চুরী একমাত্র বার্ডসলেই করেছেন। মনে রাখবেন তাও চার কি পাঁচ নম্বর ব্যাটে না, প্রথম ব্যাটে—বোলিংয়ের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে। গ্রেগারীর সম্পর্কে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করেছি। যদি কোনো খেলোয়াড়কে 'অত্যাবশ্যক' ও 'প্রচণ্ড' আখ্যায় ভূষিত করা যায়, তাহলে গ্রেগারীর সম্পর্কে সেটা প্রযোজ্য। তার প্রথম জীবনের বোলিং নিঃসন্দেহে তীব্র। উনিশশো একুশে সে ইংল্যাণ্ডের আশার মূলে কুঠার চালিয়ে নাইট, টিল্ডসলে আর হেনড্রেনকে পর পর বসিয়ে দিয়েছিলো এবং তাতেই 'রাবার' প্রাপ্তির ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গিয়েছিলো। 'স্লিপে' গ্রেগারী দুটো মানুষের সমান।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভিক রিচার্ডসনের অপরাজেয় দল কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার 'বাকি' দলের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। আমি অধিনায়ক ছিলাম সেই দলের।

খবরে জানা যায়, ও'রিলী আর গ্রিমেট নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলার অবস্থায় আদৌ ছিলো না। তবু দর্শকেরা এই দুই খ্যাতনামা বোলারকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলো।

খেলা খুবই উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছিলো—রিচার্ডসনের দল ছ'

উইকেটে হেরে যায়। দু দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ই মনে রাখার মতো খেলা খেলেছেন।

মরসুমের প্রথম দিকে খেলা পড়ায় আমার শারীরিক অবস্থা ভালোই ছিলো, রানও ভালোই উঠলো—দলের মোট তিনশো পঁচাশির মধ্যে আমার হলো দুশো বারো।

ওই খেলায় দেখবার মতো ছিলো ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্ডের বল। গ্রিমেটের অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণ পরিচালনা করেছিলো ফ্র্যাঙ্ক।

গ্রিমেট সাত উইকেটের বিনিময়ে পেয়েছিলো দুশো আটাশ রান, ফ্র্যাঙ্ক পেলো বারোটা, দুশো সাতাশ রানে। সফরকারী অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হয়েছিলো ফ্র্যাঙ্ক।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার পর আমার এম. সি. সির বিরুদ্ধে খেলার কথা, কিন্তু পূর্বমুহূর্তেই এক পরিজনের মৃত্যু হওয়ায় নামতে পারিনি। ইংরেজরা এডিলেডে পৌঁছনোর ঠিক আগের দিন আমার স্ত্রী আমাকে একটি পুত্ররত্ন উপহার দিলেন। এটিই আমাদের প্রথম সন্তান। চতুর্দিক থেকে অভিনন্দনের বন্যা ভাসলো, কিন্তু আমার মনের কষ্ট মনেই রইলো—কারণ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি বাচ্চাটার অবস্থা। ডাক্তারের সাবধানবাণী: বাচ্চার অবস্থা ভাল নয়। পরের দিন সকালেই হাসপাতাল থেকে জরুরী তলব এলো, শেষ দর্শনের।

তরুণ পিতামাতার কাছে প্রথম সন্তান বিয়োগের বেদনা বড় বিধুর।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেললেন হ্যামণ্ড একা। দুটো ইনিংসে দুটো সেঞ্চুরী, এর আগে পশ্চিমে আরও দুটো করে এসেছেন, সাকুল্যে চারটে পর পর।

ওয়ার্ড এবারও অভাবনীয় বল করলো—দশটা উইকেট পড়লো।

অস্ট্রেলীয়-বংশোদ্ভূত গাবি অ্যালেন নেতৃত্ব করছিলেন এম. সি. সি. দলের। খেলায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি ওঁরা, কিছু আগে একটা মামুলী দক্ষিণ অস্ট্রেলিয় দলকে হারাতে পেরেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে কোনোরকমে অমীমাংসিত খেলা শেষ করেন, নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে ফলাফল নৈরাশ্যজনক, সবশেষে কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম ইনিংসে বিপর্যয়।

'স্লো' বলে যেন সম্মোহিত হলো এম. সি. সি.। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ওয়ার্ড তো দশটা উইকেট নিয়েছিলো, ভিক্টোরিয়ার অখ্যাত ফ্রেডারিক নিয়ে বসলো আটটা উইকেট। সিডনিতে মাক্ষ আটটা, কুইন্সল্যাণ্ডের অ্যালেন ছ'টা। অস্ট্রেলীয় একাদশের চিপারফিল্ড এক ইনিংসেই আট উইকেট। এই সব 'স্লো' বোলারদের মধ্যে একমাত্র ওয়ার্ডেরই পরিচিতি ছিলো, আর তার অধিকাংশ ব্যাটসম্যানেরই খেলার সায়াহ্ন তখন। উইয়াটের কবজি ভেঙেছে, রোবিন্সের আঙুলে চোট। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ডঃ সি. ই. ডলিংয়ের মৃত্যুতে আমার পদোন্নতি হলো—নির্বাচকমণ্ডলীতে চলে গেলাম। নির্বাচকের চাকরিটা খুব সুখদায়ক নয়। ঘরে বসে নির্বাচক কাগজে পাঠিয়ে দিলেন এক তালিকা, খেললো আর এক দল—এমনও হয়েছে। তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তাঁরা, মজার মজার। কাজটা কখনো আগ্রহের, কখনো উত্তেজনার, আবার কখনো বা হৃদয়বিদারক মনে হয়েছে আমার কাছে। অধিনায়ক যখন নির্বাচকের আসনে আসীন তখন অনেক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত সতীর্থকেও দল থেকে বাদ দিতে হয়।

তবে এও ঠিক, প্রিয়জন পোষণের বিলাসিতাও থাকা উচিত নয় কোনো নির্বাচকের। এখানে ভাবপ্রবণতার কোনো স্থান নেই, কারণ তার একমাত্র কাজ হচ্ছে সম্ভাব্য সুনির্বাচিত দল গঠন করা।

উডফুল অবসর নিয়েছেন, রিচার্ডসনও দলে নেই, আমার ওপরই ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়া একাদশের প্রথম টেস্টের নেতৃত্ব নেবার পবিত্র দায়িত্ব পড়লো। ওয়ার্ডের প্রাক্তন রেকর্ড ভালো থাকায় গ্রিমেটের আগেই তার নাম এলো।

খাতায়-কলমে আমাদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই মনে হলো। টসে কোনোবারই জিতি না আমি, এবারও হারলাম। কিন্তু খেলার মোড় নিলো অন্য দিকে—ইংল্যাণ্ডের তিনটে উইকেট পড়লো কুড়ি রানে। এরপরই আমাদের ফাস্ট বোলার ম্যাককরমিকের খেলা পড়ে গেলো। প্রবল বৃষ্টিতে উইকেটের অবস্থা খারাপ হতে থাকলো—ইংল্যাণ্ড অপ্রত্যাশিত-ভাবে জিতে গেলো চারদিনের খেলায়।

আমার নায়কত্ব সম্পর্কেও কটূক্তি হলো। বিস্মিত হলাম না। প্রথমতঃ আমার নেতৃত্ব তার কৈশোরে, তারপর এই প্রথম খেলা। একটা দলকে ঝালাই করে তাকে পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রের রূপ দিতে সময় চাই বইকি। তবে এখনো বিশ্বাস করি সেদিন আবহাওয়া অনুকূল হলে নিশ্চয়ই জিততে পারতাম, কিন্তু এটা বলতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের কৃতিত্ব খর্ব করার অপচেষ্টা করবো না।

বলতে ভুলেছি যে ফ্লিটউড-স্মিথ প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি বাঁ হাতে চোট লাগাতে। দ্বিতীয় টেস্টেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি তিনি। এই খেলাতে কিন্তু আমাদের আরও অসুবিধে হলো—ম্যাককরমিক আর ওয়ার্ড দুজনই ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস হলেও কেউই মাঠে খেলতে পারেননি আদতে। ম্যাককরমিকের পিঠে তখনো ব্যথা রয়েছে, ওয়ার্ডের নাক ভেঙে গিয়েছিলো ব্রিসবেনের টেস্টে। স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। পরে অবশ্য তাকে অস্ত্রোপচারও করতে হয়েছিলো। এবারও টসে হারলাম—এবং হ্যামণ্ডও তাঁর পুরো ফর্মে। সিডনিতে সদ্য দুশো একত্রিশ নট আউট করে এসেছেন। বিপদ বাড়লো বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে, তার ওপর ব্যাডকক বিছানা নিলেন অসুখ হয়ে। এ ছাড়া অ্যালেন আর ভোসিও চুটিয়ে বল করতে লাগলেন, খেলার নিষ্পত্তি যেন সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেলো।

তিনটে খেলার দুটোয় এগিয়ে রইলো ইংল্যাণ্ড, আমরাও সর্বনাশের শেষ অবস্থায়।

এ সবে কিন্তু সুবিধে হলো কাগজওলাদেরই, খবর বেরলো আমাদের কিছু খেলোয়াড় নাকি অধিনায়কের হাত শক্ত করছে না। অধিনায়ক উপযুক্ত এলেমের লোক নয় বলেও জনসাধারণের একাংশ থেকে দাবী করা হলো। রিচার্ডসনকে অধিনায়কত্ব দেবার দাবীতে সোচ্চার হলো তারা। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সাফল্যই এর অন্যতম কারণ মনে হলো আমার। দুটো ব্যাপার তাদের মাথায় ঢুকলো না—এক, বিপক্ষীয়দের দলের সামর্থ্য, অন্যটা নির্বাচকমণ্ডলীর রিচার্ডসনকে নেতৃত্ব থেকে খারিজ।

আমার মাথাব্যথা অধিনায়কত্ব নিয়ে নয়, খেলার আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না এটাই ভাবিয়ে তুললো আমাকে।

তৃতীয় টেস্টে অবশ্য ফ্লিটউড-স্মিথ মাঠে ফিরে এলেন, আর আমিও টসে জিতলাম। আবহাওয়া অত্যন্ত ভালো থাকা সত্ত্বেও তার সুযোগ নিতে পারলাম না—প্রথম দিনই ছটা উইকেট পড়লো একশো একাশি রানে। বৃষ্টি এবারও নামলো, তবে আমাদেরই সুবিধে হলো তাতে। শুরু হলো কৌশলের এক উত্তেজনাকর প্রদর্শনী, যার সুযোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে ন' উইকেটে দুশো রানে খেলা ছেড়ে দিলাম। ইংরেজেরা বেধড়ক খেলা শুরু করলো—বিশেষ করে হ্যামণ্ড আর পেন্ট্যাণ্ড, কিন্তু প্রশংসার মান ছুঁতে পারলো না। লেন ডার্লিংয়ের ক্যাচে দুজনই গেলেন একে একে। পেন্ট্যাণ্ডেরটার তো জবাব নেই। মাটিতে সাষ্টাঙ্গ পড়ে ক্যাচ ধরেছিলো লেন, বাঁ হাতে।

ওঁরা যাবার পর আমার মনে হলো ইংল্যাণ্ডকে বড় তাড়াতাড়ি বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কারণ ওই দুজন যাবার পর ওদের কেউ আর একটা রানও করতে পারবে বোধ হলো না। বোলারদের বলে দিলাম আর উইকেট না নিতে, যাতে আঠালো উইকেটে ব্যাটিংয়ে না নামতে হয় শেষ বেলায়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে অ্যালেন আমার চালাকি ধরে ফেলেছে, কারণ ইনিংস দ্রুত শেষ করতে সে বদ্ধপরিকর। হলোও তাই, ইংল্যাণ্ড ন' উইকেটে ছিয়াত্তর রানে খেলা শেষ করলো। কিন্তু তখনো আধঘণ্টা বাকি খেলা শেষের।

আলো কমে এসেছে, বৃষ্টি নামবার আশঙ্কাও দেখা যাচ্ছে—এমন অবস্থায় আমরা ব্যাট ধরলাম। স্মিথ আর ও'রিলীকে পাঠানো হলো প্রথম জুটিতে। প্যাড পরতে পরতে স্মিথের চোখমুখে যে বিস্ময়ের ছাপ দেখেছিলাম তা আজো আমার মনে আছে—সে প্রশ্ন করেছিলো, 'আমাকেই প্রথম পাঠাচ্ছেন কেন?' ওকে মিথ্যা কথা বলে ওর সম্মানে আঘাত করতে পারলাম না, বললাম, 'এ উইকেট থেকে বেরোবার একটাই রাস্তা—বল মেরে বেরোতে হবে। ভালো আবহাওয়ায় তো সুবিধে হবে না তোমার…'

আমার থিওরি অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিলো, কারণ সে সেদিন তো

আউট হলোই না, উপরন্তু পরের সোমবারে নেমেই আউট হলো, প্রথম বলেই।

ও'রিলীও প্রথম বলে গেলো। বাঁচালো ওয়ার্ড বেমক্কা মার মেরে। আস্তে আস্তে খেলার মোড় ফিরলো। ফিংলটন আর আমাতে ষষ্ঠ উইকেটে তিনশো ছেচল্লিশ করলাম। আমি একাই তুশো সত্তর করে 'ব্যর্থ অধিনায়কত্বে'র গুজবে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলাম।

ওদের খেলায় লেল্যাণ্ডের একশো এগারো রানই সফরের শ্রেষ্ঠ খেলার স্বাক্ষর। ওকে নিয়ে মজাও হয়েছিল সেদিন মাঠে। লেল্যাণ্ড সারাদিন খেলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো, প্রায় পৌনে ছ'টা বাজে—তখন রবিন্স খেলতে এলো তার সঙ্গে। রবিন্স একে সত্ত নামছে তার ওপর দ্রুত দৌড়নোর খ্যাতি ছিল তার—রবিন্স তো হাঁকড়েই দৌড়তে শুরু করলো। তুটো রানের শেষে তৃতীয় রান নেবার জন্যে ফিরেছে সে যখন, ইয়র্কশায়ারের বিপুলকায় মানুষটা (লেল্যাণ্ড) তাকে হাত তুলে নিষেধ করলো, 'আস্তে ভাই, ওদের সবাইকে আজই পাবো না আমরা।' ইংল্যাণ্ডের আরও চারশো রানের দরকার তখন,—আমাদের হাসির বহরটা বুঝতেই পারছেন।

খেলার শেষে একটা বিশ্রী ব্যাপার হলো—অস্ট্রেলিয়ার চারজন খেলোয়াড়কে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের উপসমিতির কাছে হাজির হতে বলা হলো। এঁরা হলেন ম্যাক্ক্যাব, ও'রিলী, ফ্লিটউড-স্মিথ আর ও'ব্রায়েন। ওঁদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারটা পুরো জানা হলো না, তবে গুজবের ব্যাপারেই কিছু মনে হলো। যেখানে পুরো ঘটনাটা অজানা থেকে যায় সেখানে অনুমানের ওপরই নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বোধ হয় অভিযোগ ছিলো যে তারা ঠিকমতো খেলছে না। সেই 'নায়কত্বে'র ব্যাপার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে!

এ ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করলাম, কারণ আমি অধিনায়ক অথচ আমিই কিছু জানলাম না, আমার সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করা হলো না। পরে অবশ্য বেসরকারীসূত্রে জেনেছিলাম ইচ্ছে করেই জানানো হয়নি আমাকে ব্যাপারটা—আমাকে 'রক্ষা' করার জন্যে। কিন্তু আমি মনে

মনে অপরাধীই থেকে গেলাম—কারণ, সতীর্থরা হয়তো ভাবলেন আমিই এটা করিয়েছি। এ সম্পর্কে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতিও ছিলো না কর্তাদের।

চতুর্থ টেস্টে বৃষ্টি হলো না, কিন্তু অতো ভালো উইকেটেও তেমন সুবিধে হলো না। দুশো অষ্টআশি রানেই শেষ হলো ইনিংস। ইংল্যাণ্ড করলো তিনশো তিরিশ, মন্দের ভাল। অথচ ওরা আরো বেশি রানে বেরোতে পারতো।

দ্বিতীয় ইনিংসে অ্যালেন আমাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলো—এমনভাবে বল শুরু করলো যাতে একের ওপর মার না হয় আমার। এক-আধটা বাউণ্ডারী হয়েছিলো, আর আমার দুশো বারো রান তুলতে সময় লেগেছিলো চারশো সাঁইত্রিশ মিনিট! এতেও ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ভালোই রইলো—এবং ষষ্ঠ দিনেও যখন হ্যামণ্ড নট আউট রয়ে গেলেন, বুঝলাম, শিরে সংক্রান্তি!

বল নিয়ে সোজা এগিয়ে গেলাম ফ্লিটউড-স্মিথের দিকে—'অস্বাভাবিক প্রতিভাটি'র হাতে বল দিয়ে জানালাম, ফলাফলের সবটুকুই নির্ভর করছে তারই ওপর।

স্মিথ কথা রেখেছিলো, একটা সুন্দর বল ছাড়লো সে—আর হ্যামণ্ড সেটা খেলার মুহূর্তে ব্যাট থেকে ঘুরে গিয়ে ব্যাট আর প্যাডের মধ্যে 'স্পিন' করলো, সে এগোতেই!

মুহূর্তের মধ্যে প্রবীণ সুহৃদ স্যামি কার্টারের কথা মনে পড়লো—কার্টার বলেছিলেন—একদিন স্মিথের জন্যেই হয়তো অস্ট্রেলিয়া টেস্ট জিতবে। কোনো একটি বলে যদি কোনো খেলার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে এই-ই তো তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন! একটা 'অফ-ব্রেক', খেলার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হলো।

পরের খেলাটা ছিলো শেষ খেলা, মেলবোর্নের মুকুট পরলো অস্ট্রেলিয়া। অবশ্যই টসে জিতে!

এই খেলার ঠিক আগেই ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একটা খেলা ছিলো—এতে অংশ নিয়েছিলেন লরি ন্যাশ, অস্ট্রেলীয় রুলস ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে যাঁর পরিচিতি।

পূর্বের রাজ্য পর্যায়ের এক খেলায় স্যাশের শর্ট পিচ বল দেওয়া নিয়ে ইংরেজদের মধ্যে কিছু বিক্ষোভ ছিলোই, তারপর তাঁর টেস্টে অন্তর্ভুক্তিতে অ্যালেনের উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে খেলাটা আমি দেখিনি—এবং তাতে কি হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিলো না, কিন্তু টেস্টের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটা কথাই বলতে পারি—ম্যাককরমিক বা স্যাশের খেলা যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার দাবীদার।

আবার 'গুজবে'র তৎপরতা বাড়লো, রটে গেলো বোর্ডের সদস্যরা নাকি নির্বাচকদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক প্রাক্তন অধিনায়ক এক নিবন্ধে লিখলেন, 'এই খেলায় ফাস্ট বোলিং যথেষ্ট নিয়মানুগ হওয়া সত্বেও এই ধরনের বল করার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়েছে।'

কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। আমার অধিনায়কত্বের সব খেলায়, আমার বা বিপক্ষ দলের বিভিন্ন আঙ্গিকের বোলারদের 'ধাক্কা' বল দেওয়ার বিরোধী ছিলাম, নীতিগতভাবেই। কিন্তু আমি কোনো বোলারকে কখনো আকস্মিক নিয়মানুগ রীতির বল দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলিনি। মোদ্দা কথা, ক্রিকেটের মূল নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন কোনো খেলার পদ্ধতিতে বাদ সাধিনি, কাজেই এ নিয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক। এই নীতির পরিপন্থী কোনো ব্যাপারে আমি সায় দিইনি, মদত দেবার চেষ্টাও করিনি। 'অ্যাসেস' হাতছাড়া হওয়াতে অ্যালেন স্বভাবতঃই মুষড়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এতে অসন্তোষের কোনো যুক্তি নেই, কারণ তাঁর দলের বেশ কিছু খেলোয়াড় ছোট-বড় আঘাত পেয়েছেন, অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি এখনো বিশ্বাস করি—ইংনিস আগে শেষ করলে তৃতীয় টেস্ট জেতা তাঁর দলের পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। বৃষ্টি নামবে একথা সবাই জানতো, এবং পরে সোমবারে আবহাওয়া অনুকূলে যাবে এটা তো যে কোনো অধিনায়কই আশা করবেন।

টেস্ট খেলার মানের প্রশ্ন উঠলে বলবো ওদের ব্যাটিং পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভরযোগ্য ছিলো না, কিন্তু গাবি স্বয়ং যে কোনো অবস্থার মোকাবিলা করার হিম্মত রাখতেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, ইনি উনিশশো বত্রিশ-

তেত্রিশ সালের তিক্ত স্মৃতিগুলোর সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদার্হ।

অস্ট্রেলিয়ার খেলারও উন্নতি হয়েছে, গ্রেগারী আর ব্যাডককের মতো তরুণ খেলোয়াড়রা যথেষ্ট ক্রীড়াচাতুর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। রস গ্রেগারীর মতো প্রতিশ্রুতিবান তরুণ কমই দেখেছি। প্রথম সারিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা তার অগ্রগতি ব্যাহত করেছিলো এবং তা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভের আগেই তরুণ গ্রেগারীকে দেশের জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছে।

ম্যাক্‌ক্যাবের খেলা তার রানসংখ্যার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে চলেছে বরাবর—ন'জন বোলারের বলে ছ'বার পঞ্চাশের ঘর ছুঁয়েছে সে, এবং করেছে—তার স্বভাবসিদ্ধ অনায়াস ব্যাটিংয়ের বৈশিষ্ট্যে। ফিংলটনের রেকর্ডও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তার ফিল্ডিংয়ের কাজ। পাঁচটা টেস্টের বিচারে ও'রিলী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বোলারের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। সময়ে সময়ে মনে হয়েছে ও'রিলীর লেগ-স্টাম্পের আক্রমণে আতিশয্য আছে, এবং মাঝের ও 'অফ' স্টাম্পের ওপর নজর দিলে খেলায় আরো ভাল ফল পেতে পারতো সে। কিন্তু তবু 'শ্রেষ্ঠ বোলারের' তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ায় ঝুঁকি আছে, বিশেষতঃ সে যখন 'বিগ বিলে'র দৃঢ়তায় প্রতিজ্ঞ। তাছাড়া, দীর্ঘদিনের একটা অনুশীলন থেকে বিচ্যুতিও ক্ষতিকর। সে যাই হোক—ও'রিলীর বল খেলা কষ্টকর ছিলো, তা সে যে উপায়েই করুক।

তবু, সবকিছু মিলে, খেলার মান আশানুরূপ হয়নি। কারণ অন্যদের বিভিন্ন টেস্ট খেলায় উচ্চতর মানের সন্ধান মিলেছে। পরবর্তী কালে উনিশশো আটচল্লিশের দলমান এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

এডিলেডের একটা উত্তেজনাকর খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট মরসুমের অবসান হলো। শেফিল্ড শীল্ডের একটা খেলায় ম্যাককরমিক টিম ওয়ালের ইনিংসে দশটা উইকেট নেবার রেকর্ডের সমকক্ষ হবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রথম ন'টা উইকেট যাবার পর, দৈত্যাকৃতি ভিক্টোরিয়ান সিভারসকে বল দিয়ে যথোচিত কাজের নির্দেশ

দেওয়া হলো। সিভারস তাঁর প্রথম ওভারেই একটা স্টাম্প ওড়ালেন। দুর্লভ যশের জগতে ম্যাককরমিকের আর ঢোকা হলো না।

উনিশশো সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের মরসুম

সফরকারী দলের ভিড় তখনো শুরু হয়নি। আমাদের সেরা খেলোয়াড়েরা শেফিল্ড শীল্ডেব খেলায় যোগ দিলো সবাই। কারণ সামনেই রয়েছে ইংল্যাণ্ড সফরের মরসুম।

এডিলেডের পয়লা খেলাই ভিক রিচার্ডসনের দল আর আমার দলের মধ্যে। টাকাটা ভাগ হবে রিচার্ডসন আর গ্রিমেটের মধ্যে।

ভালো লাগলো, কারণ ক্রিকেটের জন্যে অনেক করেছেন এ দুজন। সরকারী স্বীকৃতি তো মিললো। ভিকের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কার্যকাল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু শেফিল্ডের খেলায় উনি সবচেয়ে বেশি ইনিংস খেলেছেন—একশো আটচল্লিশটা। সাকুল্যে ছ হাজার একশো আটচল্লিশ রান, গড় ৪৩·৬। দুজন মাত্র ব্যাটসম্যান এই সংখ্যা ছাড়িয়েছেন, এক—ক্লেম হিল আর দ্বিতীয়জন, এই অধম।

ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলাধুলোর ব্যাপারেও আমি রিচার্ডসনের গুণমুগ্ধ। মোটামুটি সব খেলাতেই তিনি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এক কথায়, রিচার্ডসনের চেয়ে চৌকস খেলোয়াড় আমার চোখে পড়েনি। সুন্দর স্বাস্থ্য, অসম সাহস, শুধু একটা ব্যাপারে খামতি ছিলো তাঁর—একাগ্রতার।

লারউডের সঙ্গে এডিলেডে তাঁর খেলা অনেকেরই চিরকাল মনে থাকবে। ফাস্ট বোলিং রিচার্ডসনকে কাবু করতে পারেনি—কারণ তাঁর প্রিয় মারগুলোর মধ্যে ছিলো 'হুক' আর 'স্কোয়ার কাট'। ফিল্ডিংয়েও চ্যাপম্যান আর কনস্ট্যান্টাইনের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাঁর। তাঁর 'স্লিপে' ক্যাচ ধরার নির্বিকার কায়দা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

শেফিল্ড শীল্ডে গ্রিমেট কিন্তু রিচার্ডসনের চেয়ে একটা খেলা বেশি খেলেছেন। তাঁর তিন হাজার পাঁচশো আটান্নটি ওভারে পাঁচশো তেরটি উইকেটের ধারে-কাছে কেউ যেতে পারেনি।

পাঠকরা জেনে বিস্মিত হবেন যে গ্রিমেট তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বিগুণ উইকেট নিয়েছেন শেফিল্ডের খেলায়। অবশ্য সহযোগীদের চেয়ে অনেক বেশি ওভার বল করেছেন তিনি। শীল্ড ক্রিকেটে কোনো বোলার দু হাজার ওভার বল করতে পারেননি। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া তাঁর ওপর প্রচুর নির্ভর করেছে এবং সদ্ব্যবহারও করেছে খেলার।

তাঁর চেহারার সঙ্গে খেলার তুলনা করতে যাওয়া ভুল হবে—কাগজওলারা এই ছোট্ট প্রচার-বিমুখ মানুষটাকে ভিজে মাটিতে 'বেড়ালের পদক্ষেপের' উপমা দিয়েছে।

ক্ল্যারি অপরিবর্তনীয় মতবাদে বিশ্বাসী—সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে খেলার গড়ই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ফিল্ডিং অতি সুন্দর সাজাতেন এবং এতো শ্লথগতি বল দিতেন যে কল্পনা করা যায় না। গ্রিমেটকে আমি তিন-চার ওভার ক্রমান্বয়ে বল করতে দেখেছি। খারাপ বল কখনো করেননি। তাঁর অধ্যবসায় আর সঙ্গতিপূর্ণ খেলা উত্তরসূরীদের অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আবহাওয়া খারাপ হওয়ার দরুণ খেলা শুক্র ও শনিবারেই সীমাবদ্ধ রইলো না, হলে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় এই দুজনের নাম থাকতো।

শেফিল্ড শীল্ডে জয়ী হলো নিউ সাউথ ওয়েলস। দ্বিতীয় স্থান হলো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার।

তরুণ খেলোয়াড়েরা কোনো অসাধারণ কৃতিত্বের 'নিদর্শন' রাখতে পারলো না। একজন ছাড়া—সিড বার্নেস, যে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক ব্যাটিংয়ের নজীর রেখেছিলো। বার্নেস পরে টেস্টে খেলেছিলো। খাতায়-কলমে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার দল ভালোই ছিলো, এবং খেলায় মোটামুটি ফলও করবে ধারণা করেছিলাম। কিন্তু ও'রিলী সব আশার গুড়ে বালি দিলো। সে প্রথম খেলাতেই কেঁচে দিলো সব—৩৩·৬ ওভার (৮ বলের) বল করে একচল্লিশ রানে নটা উইকেট নিয়ে।

এই খেলাতে আমার রান ছিলো যথাক্রমে একানব্বই আর বাষট্টি। পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গেই আমার খেলা সবচেয়ে ভালো

হয়েছিলো—দুশো ছেচল্লিশ আর উনচল্লিশ। আউট হইনি। ফিরতি খেলায় হয়েছিলো একশো সাত আর একশো তেরো। সিডনির মাঠে নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে খেলার দিনটায় খুব কষ্ট হয়েছিলো, তাপমাত্রা বেড়ে গেলো, যতদূর মনে পড়ছে, একশো তেরোর ওপরেই। সঙ্গে পশ্চিমে হাওয়ার দাপট। এছাড়া পাশের এক ঝোপে আগুন লাগায় প্রচুর ধোঁয়াও ভাগ্যে জুটেছিলো।

আমাদের উইকেটরক্ষক চার্লি ওয়াকারের আঙুলে চোট লেগেছিলো। ফলে আমাকেই ওর জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছিলো ওই পরিস্থিতিতে। পরের চারটে উইকেটের তিনটে আমার হাতে পড়লেও অস্বস্তি কমেনি একটুও।

অনুশীলন তো শেষ হলো, দলের নামও ঘোষণা করা হলো। অধিনায়কত্বের ভাগ্য আমার কপালেই জুটলো।

আরও একবার সমুদ্রপারের বান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ এলো। উনিশশো চৌত্রিশের চেয়ে ভালো কিছু ফল দেখানো যায় কিনা এ নিয়ে ভাবলাম। আশার কিছু পূরণ হলো।

তবু, এবারের যাত্রাও সাঙ্গ হলো বিয়োগান্তক সুরে, ব্যক্তিগত কারণেই।

ইংল্যাণ্ড : উনিশশো আটত্রিশ

আটত্রিশের ক্রিকেট দলটি পাঁচিশে ফেব্রুয়ারী মেলবোর্নে সমবেত হলো অস্ট্রেলিয়ার বাকি খেলা খেলতে। যথানিয়মে তাসমানিয়া আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতে খেলা হলো।

এবারে সমালোচনা কিছু বাড়লো, গ্রিমেট আর ওল্ডফিল্ড দল থেকে বাদ পড়েছেন বলে। ব্রাউনের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও কথা উঠলো, এতো সব সত্ত্বেও বলা যায় শক্তিশালী দলই গঠিত হয়েছিলো—প্রবীণতম সদস্যের বয়স মাত্র বত্রিশ।

একটা সুখবরও ছিলো—আমাদের পরিচালক ডব্লিউ. এইচ. জিনস্, যিনি অস্ট্রেলীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সম্পাদকও, অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার খেতাবে সম্মানিত হলেন।

সম্পাদককে দলের পরিচালক হিসেবে মনোনয়ন দলের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনকই হয়েছিলো। যে সমস্ত মানুষ কোনো আধুনিক আন্তর্জাতিক সরকারী দলের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পাননি তাঁদের এ ধরনের সফরের অন্যদিকের বিভিন্ন অস্বস্তিকর অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারনা নেই। সম্পাদক যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান নিয়ে ফিরেছিলেন সেজন্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থেকেছেন এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত।

সফরের প্রাথমিক অবস্থাটা সব সময়েই উত্তেজনাকর—বিশেষ করে যে তরুণ খেলোয়াড়টি সর্বপ্রথম খেলতে চলেছে। বিদায় অভিনন্দন সভার ছড়াছড়ি লেগে যায়। হুড়োহুড়িও চলে ক'দিন।

জাহাজে যে কটা দিন থাকা যায় সে সময়টাই বিশ্রামের—ক্রিকেটের পরিবেশ থেকে দূরে সরে থাকাও। এগুলো অবশ্য সাধারণ খেলোয়াড়দের বেলায় প্রযোজ্য, কারণ অধিনায়ককে তার পরবর্তী কর্মসূচীর চিন্তায় বিভোর থাকতে হয়। আটত্রিশের যাত্রা আমার শুভ হয়নি কারণ গলায় ব্যথা আর ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়েই জাহাজে চড়তে হয়েছে আমাকে। অবশ্য এই সময়টুকুর মধ্যে কিছু পড়াশুনো করেছি, প্রয়োজনীয় লেখালেখিও, যা পরে ইংল্যাণ্ডে কাজ দিয়েছে। নেপ্‌লসে পৌঁছনোর পরই আমরা আসন্ন ঘটনাবলীর রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হলাম। এডিলেডে এক বন্ধুকে লিখে জানালাম, "আমাদের জাহাজের ডেক থেকেই ছত্রিশটা ডেস্ট্রয়ার, আটটা ক্রুজার আর বাহাত্তরটা সাবমেরিন চোখে পড়েছে। এগুলো নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যে তৈরী হয়নি।"

সমুদ্রতটে চলেছে নৌমহড়া। চারদিকেই ইউরোপের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। বন্দরে জাহাজ থামলো কিছু সময়ের জন্যে। আমরা পম্পিয়াইয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম—বিগত সভ্যতার মৃত নিদর্শন। পরিচালকও অসুস্থ, বাতে পঙ্গু—লাঠিতে ভর দিয়ে বেরোলেন আমাদের সঙ্গে পম্পিয়াই দর্শনে। ম্যাককরমিক তার তীক্ষ্ণ রসবোধ ও রসিকতায়

আসর জমিয়ে ফেললো। যে কোনো অবস্থায় হাসির খোরাক যোগাতে তার তুলনা নেই।

জিব্রালটারে এক কেচ্ছা হলো—আমাদের দলের তরুণতম সদস্য বার্নেস ডেকের ওপর পিছলে পড়ে কব্জি জখম করলো। প্রথমে মনে হয়েছিলো, সেটা মচকে গেছে শুধু, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে ধরা পড়লো হাড় ভেঙেছে। একেই তো বাড়তি খেলোয়াড় নেই তার ওপর এই ঝামেলা। অস্ট্রেলিয়াতে তার গেলো—বোর্ড কিন্তু লোক পাঠাতে পারবেন না জানিয়ে দিলেন। দলের ছেলেরা এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলো। বার্নেস জুনের আগে মাঠে নামতে পারলো না, কিন্তু ততোদিনে দ্বিতীয় টেস্টের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। বোর্ড রাজি হলে গ্রেগারী বা রিগ এসে খেলতে পারতো।

লণ্ডনে প্রথম দিনেই সন্ধ্যের পর ডঃ পোপ আর আমি হাজির হলাম স্যর ডগলাসের বাড়িতে। চৌত্রিশ সালের সেই মারাত্মক দিনগুলোতে ডাক্তার সাহেবের অবিশ্রাম সাহচর্যের কথা পাঠক নিশ্চয়ই ভোলেননি। ডঃ পোপের কথা বলি—ক্রিকেটামোদী এমন দুটি লোক পাওয়া দুর্লভ। নিজের পয়সায় ভদ্রলোক অস্ট্রেলীয় দলের সঙ্গে ঘুরেছেন ইংল্যাণ্ডে, অন্যান্য দেশেও। সঙ্গে ওষুধের বাক্স, সাজানো বইয়ের স্তূপ, আরও সব জিনিস—যেগুলো কাজে লাগতে পারে বলে মনে করতেন। সবার ওপরে আর একটা ব্যাপার—প্রয়োজনে যে কোনো মানুষকে নির্বিশেষে সুবিবেচিত পরামর্শ দেওয়া। সিডনিতে থাকতে ফলের ঝুড়ি আসতো ওঁর কাছ থেকে খেলোয়াড়দের সংস্থাঘরে। এইরকম নানা উপকার পেয়েছি এই সহৃদয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

ডঃ পোপের মতো অনেক মানুষ পৃথিবীতে থাকলে এখানে থাকাটা অনেক বেশি সুখকর হতো। ক্রিকেট আর মানবিকতার সেবায় তিনি কোনো প্রতিদান পাননি।

সফরে বেরোনোর আগে চিরাচরিত অনুষ্ঠানগুলো চলতে লাগলো। ম্যানসন হাউসে লর্ড মেয়রের ভোজসভা। একেবারে সাবেকী দক্ষিণ অস্ট্রেলীয়-পদ্ধতিতে। লর্ড মেয়র স্বয়ং স্যর হ্যারি টোয়াইফোর্ড, যাঁর স্ত্রী আমাদের অঞ্চলের মেয়ে—আমাদের মানে আমি ও পরিচালক সাহেব।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আর একজন দক্ষিণ-অস্ট্রেলীয় শিল্পী—পিটার ড'সন।

ওরস্টারের উদ্বোধনী খেলা হলো—এই মাঠেই আমার তৃতীয় ধারাবাহিক সেঞ্চুরী। তৃতীয় খেলাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে আমার। এই অনুষ্ঠানগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে রয়্যাল পরসিলেন ওয়ার্কসের পরিচালকমণ্ডলী একটা বিশেষ ফুলদানী তৈরী করেছিলেন। একদিকে আঁকা খেলারই একটা ছবির অনুলিপি—তাতে খেলার মাঠ দেখানো হয়েছে, দর্শকদেরও দেখানো হয়েছে, এমন কি নদী বরাবর সুন্দর গাছপালার সারিও রয়েছে তাতে। এবং এই সবকিছু ছাপিয়ে দেখা যাচ্ছে ওরস্টারের গির্জা। পেছনদিকটায় খোদাই করা লেখা। আজও সযত্নে রেখেছি এটা।

ওরস্টার টসে জিতে আমাদের ব্যাট করতে দিয়েছিলো। একটা সাময়িকীতে এ নিয়ে একটা বিদ্রূপাত্মক নক্শাও ছাঁপা হলো।

ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষ যদি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হতে পারতো তাহলে পূর্বাহ্ণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হতো না।

একথা বললাম এজন্যে যে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটলো, এবং তার শিকার—ম্যাককরমিক। প্রথম খেলাতে ব্যাপারটা ঘটলো, ম্যাককরমিকের ততোক্ষণে মোট উনত্রিশটা বল দেওয়া হয়ে গেছে।

তার উনিশটা বল 'নো-বল' বলে ঘোষণা করলেন আম্পায়ার বল্ডউইন। আমি আম্পায়ারের কাছে জানতে চাইলাম ম্যাক লাইন ছাড়িয়ে বল করছে কি না। উত্তরে জানালেন ভদ্রলোক যে বোলার লাইনের 'দু' ফুট ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে বল করছে। ম্যাককে এ কথা জানিয়ে দেওয়ায় সে অনেকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করেছিলো—কখনো কম দৌড়ে এসে বল করলো, কখনো বাড়িয়ে দিয়ে, কিন্তু আসল কাজটাই হলো না।

একবার তো কদম ঠিক করতে বিশ গজ দৌড়লো লোকটা। বল দেবার পূর্বমুহূর্তে একজন দর্শক আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'জলদি, গেট বন্ধ করে দাও—রাস্তায় চলে যাবে যে!'

কেলেঙ্কারি বাড়লো এতে—ম্যাকের প্রথম বলটাই চার্লি বুলের ডান চোখের ওপর গিয়ে পড়লো। চোখ বুজে ফেললাম—মরেই গেলো বুঝি

ব্যাটসম্যান। বুল তখনকার মতো বসে গেলেও, অবশ্য পরে আবার নেমেছিলো। খেলার শেষে জানা গেলো খেলায় নামার আগে থেকেই তার একটা আঙুল ভাঙা ছিলো।

ম্যাককরমিক কিন্তু মানসিক আঘাত পেয়েছে, তার প্রমাণ—পরের ছুটো কি একটা খেলা ছাড়া সে আর আগের মতো খেলতে পারেনি।

সফর স্বাভাবিক ছন্দেই এগিয়ে চললো। ক্রিকেট ছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্যাপারেই সুযোগ-সুবিধে পেয়েছিলাম ওই সময়ে।

গ্রেস ফিল্ডসের কথাও স্পষ্ট মনে পড়ছে—সমস্ত দর্শকের তাঁর দিকেই দৃষ্টি ছিলো সেদিন। কুইন্‌স হলে এক গানের জলসায় রিচার্ড টবারের মিষ্টি গলাও শোনা হলো। এক সন্ধ্যেয় স্নুকারও খেলা হলো—বিশ্ববিখ্যাত স্নুকার বিশেষজ্ঞ জো ডেভিসের সঙ্গে। ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা সফরে ক্রিকেটের বাইরেও আনন্দ খোঁজেন, আমার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হলো না। মিডলসেক্সের সঙ্গে এক খেলায় আমরা এম. সি. সি.র আতিথ্য নিলাম, ভোজ হলো লর্ডসে।

মিঃ স্ট্যানলি বল্ডউইন, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, (যিনি এম. সি. সি.র সভাপতিও) সুন্দর বক্তৃতা রাখলেন সভায়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে রসিকতা করে বললেন—যৌবনে তাঁর স্বপ্ন ছিলো কর্মকার হবেন।

আমাকে যখন বলতে বলা হলো, বললাম আমার স্বপ্নের কথা। আমার স্বপ্ন ছিলো চুনকামের মিস্ত্রি হবার। আরও বলেছিলাম আমাদের ছুজনের স্বপ্নই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, কিন্তু সেজন্যে কি আমাদের মনে কোনো ক্ষোভ আছে? বোধ হয়, না।

অ্যাটর্নি জেনারেল মেন্‌জিসও বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁর খ্যাতি অনুযায়ীই।

প্রথম কটা খেলায় আমরা খুব ভালো করলাম। চারটে খেলায় সেঞ্চুরী করলো ফিংলটন, ম্যাক্‌ক্যাব, হ্যাসেট, ব্যাডকক ও চিপারফিল্ড। আমিও একটা করেছিলাম।

লর্ডসে পরের খেলাটা এম. সি. সি.র সঙ্গে অমীমাংসিত থেকে গেলো, আমাদের জেতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। এ খেলায় করেছিলাম ছুশো

অ্যাটাক্তর—ওই মাঠের সর্বোচ্চ রান। এম. সি. সির হয়ে বল করছিলেন কেন্ ফারনেস, জিম স্মিথ, রোবিনসন, কম্পটন, এডরিচ আর স্টিফেনসন। শেষোক্ত খেলোয়াড় মিডিয়াম পেস বল করতেন, খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। ইংল্যাণ্ডের মফস্বল রীতি অনুযায়ী কোনো বহিরাগত দলকে খেলার আগে সম্বর্ধনা জানানো হতো না, নর্থহ্যাম্পটনের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টোটা হলো। স্টেশনে এলেন স্বয়ং লর্ড মেয়র এবং মহিলা পরিচালিত স্কচ্ বাজনাদার। 'প্রমীলা'রা আমাদের আগে আগে চললেন হোটেল পর্যন্ত। এ দৃশ্য খোদ স্কটল্যাণ্ডেও চোখে পড়েনি।

বিল ব্রাউন সম্ভবতঃ 'প্রমীলা-প্রভাবিত' হয়েছিলো এবং অপরাজিত একশো চুরানব্বই করে ফেললো। বিলের তখন প্রড়তি অবস্থা, নিজের ওপর আস্থাও হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু রাখে হরি মারে কে! ছ' ছ'বার ক্যাচ পড়ে গেছে তার মারে, বেশ কয়েকটা, এল. বি. ডব্লিউর আবেদনও অগ্রাহ্য হয়েছিলো। বিল কিন্তু নির্বিকার, খেলে চলেছে। ভাগ্যই বলতে হবে। ক্রিকেটে ভাগ্যের ভূমিকা কিন্তু যথেষ্ট—অনেক খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের বাজে খেলায় বিপক্ষের সামান্যতম ভুলে খেলার মোড় ঘুরে গেছে।

এর পর সারে'র বিপক্ষে এক খেলায় আবার সমালোচনার ঝড় বইলো, কারণ 'ফলো অনে' বাধ্য করিনি। কোনো একটা খেলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া ভালো, না, সামগ্রিক সফরের মূল্যায়ন করাটাই লাভজনক—এ নিয়ে অবশ্য বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। আমি সেক্ষেত্রে পরের নীতিটাই গ্রহণ করবো। কোনো একটা খেলায় বোলারের কেরামতি দিয়ে খেলা জেতা হয়তো হলো, কিন্তু পরের খেলাগুলোর কি হবে?

ম্যাক্ক্যাব সারে'র বিরুদ্ধে খেলার জন্যে মনোনয়ন লাভ করলেও খেলতে পারেননি স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে। স্মিথ, ম্যাককরমিক আর ওয়েইটের অল্পবিস্তর চোট ছিলো, ও'রিলীর দাঁত খারাপ আর হোয়াইটের পায়ের আঙুল বিষিয়ে গেছে। ওই অবস্থায় দলের দৈন্য আর বাড়াতে চাইনি, কিন্তু দর্শকেরা নাচার।

ফলে অন্ততঃ একটা জিনিস দেখতে পেলো ওরা—লরি ফিশলক সত্তর

মিনিটে একশো বারো রানের তিরানব্বই তুলে দিলো একাই। এ সফরেও মে মাসের মধ্যে হাজার রান করার ফিকির খুঁজছিলাম। এ সুযোগ দ্বিতীয় কোনো স্বদেশবাসীর ভাগ্যে তো জোটেইনি, ইংরেজদের মধ্যেও একজনই শুধু একবারই করেছে, কাজেই এ সম্মান পাবার সাগ্রহ চেষ্টা চালাতে হবে।

সাউদাম্পটনে হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে খেলায় মওকা মিলবে, ওদের সঙ্গেই এর আগে তিরিশ সালে একবার করেছিলাম। আবারও বৃষ্টি প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিলো। চললো লড়াই—মানুষ বনাম প্রকৃতির।

এ পর্যন্ত কিন্তু সাফল্য সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম, ও'রিলীর ওপর অতিনির্ভরতা সত্ত্বেও। বাধা এলো মিড্‌লসেক্সের কাছ থেকে, প্রথম ইনিংসে ওরা এগিয়ে গেলো। এবারও জনতার ক্রোধের শিকার হলাম আমি, তবে তা ক্ষণস্থায়ী হলো, পরে উল্লাসে ফেটে পড়লো ওরা—ভাবলো আমি প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলা তড়িঘড়ি সাঙ্গ করবো বলে হাত মিলিয়েছি তাদের সঙ্গে। যখন ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো, মানে এডরিচকে মে মাসের আগে হাজার রান তোলার সুযোগ দিচ্ছি জানানো হলো—এডরিচের প্রতিটি মারকে স্বাগতম জানিয়েছে ওরা গলা ফাটিয়ে। বিল যখন রান শেষ করলো তা নিয়ে গভীর উৎসাহের সঞ্চারও হলো।

এ খেলাতেও পিঠের বেদনায় কষ্ট পেয়েছি, ডাক্তার দেখাতে হয়েছে। ডাক্তারও ভাগ্যক্রমে অস্ট্রেলীয়, নাম ডাঃ আইজ্যাক জোন্স। ডঃ জোন্স আমাকে টেস্ট খেলা পর্যন্ত বিশ্রামের নির্দেশ জারি করলেন।

ভাবতে ভালো লাগে যে ইংল্যাণ্ডে কতো অস্ট্রেলিয়বাসী নানা পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন, এঁরা গুণী মানুষ বলেও স্বীকৃত। জনপ্রিয়তার শীর্ষেও রয়েছেন অনেকেই।

প্রথম টেস্টের সময় এসে গেলো, জয়ের আশাও আধাআধি। তবে বিপর্যয় এড়ানোর জন্যেও আমরা সচেষ্ট ছিলাম ঠিকই।

মনোরম পরিবেশে খেলা শুরু হলো। ইংল্যাণ্ড টসে জিতে হ্যামণ্ডকে পাঠালো ব্যাট করতে। কিন্তু মজা হলো স্পিনাররা 'স্পিন' করতে পারলো

না (স্নিথও না)। ফাস্ট বোলাররাও সুবিধে করতে পারলো না—ফলে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত ইংরেজদের একটা উইকেটও নামলো না।

গ্লস্টারের চার্লি বারনেটের এক অদৃষ্টপূর্ব খেলা দেখা হলো। লাঞ্চের আগে আউট না হয়ে নিরানব্বই করলো সে। এ যাবৎ অস্ট্রেলিয়ারই একচেটিয়া ছিলো এ রেকর্ডের—লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার রেকর্ড। তার 'ড্রাইভ' আর 'কাটে'র জবাব নেই—ও'রিলীও হার মেনেছিলো।

লিওনার্ড (লেন্) হাট্ন্ আর ডেনিস কম্পটনও সেঞ্চুরী করলেন। দুজনেই কিন্তু প্রথম টেস্ট খেললেন।

তারপর ল্যাঙ্কাশায়ারের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে এগিয়ে এলো এডি পেণ্টার—দুশো ষোলো, নট আউট রইলো সে। ইংল্যাণ্ড আট উইকেটে ছশো আটান্ন করে ডিক্লেয়ার করে দিলো। বিপদ বাড়লো, কিন্তু ম্যাক্‌ক্যাব নেমে সব ওলটপালট করে দিলো। তার এ খেলা দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস করে রেখেছে। এ সম্পর্কে বইয়ের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা আছে। তবু 'ফলো অনে'র হাত থেকে রেহাই মিললো না, এবং মঙ্গলবারের সারা দিনটা অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষণাত্মক খেলায় নিযুক্ত থাকতে হলো—দর্শকের দৃষ্টিতে যা অনাকর্ষণীয়। জয়ের আশা সুদূরপরাহত হলো, শুধু ঠেকা দিয়ে যেতে হলো।

বিল ব্রাউন আর আমি সারাদিন খেললাম। বিল করলো একশো তেত্রিশ, আমি একশো চুয়াল্লিশে অপরাজিত রইলাম। দলের হয়ে এর চেয়ে ভালো খেলা আগে খেলেছি বলে মনে পড়ে না।

প্রথম ইনিংসে আমাকে আউট দেওয়া হলো। বল করেছিলো সিন—ফিল্ড, ক্যাচ ধরেছিলো এম্‌স্। ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার আউট দিলেন। আমার বিরুদ্ধে এর চাইতে মোক্ষম রায় আর হয়নি। বলটা 'অফ' থেকে ঘুরে ব্যাটের ভেতরের কোণ ছুঁলো কেবল, তারপর প্যাডে লেগে স্টাম্পের ওপর দিয়ে গিয়ে এম্‌সের হাতে উঠলো। এই সবের মধ্যে সামান্য ভারসাম্য হারিয়েছিলাম আমি, ঠিক সেই মুহূর্তে এম্‌স্ 'বেল' ওড়ালো আবার। স্কোয়ার লেগের আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন টিঁকলো না। এম্‌স্ তখন বোলারের দিকের আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চেস্টার

খুব নির্বিকার গলায়, যেন সবাইয়ের কাছে স্পষ্ট হয়েই গেছে ব্যাপারটা, বললেন, 'আউট, কট।' বলেই ফিরে আমাদের দিকে পেছন করে দাঁড়ালেন। এই অলৌকিক রায় চেস্টারকে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আম্পায়ার বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে।

নটিংহ্যাম টেস্টের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা তার পরের ছুটো খেলাতেও কাটলো না, অবশ্য ল্যাঙ্কাশায়ারের খেলায় কোনো পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন ছিলো না—অস্ট্রেলিয়ার হয়েছিলো তিনশো তিন, ল্যাঙ্কাশায়ারের ছুশো উননব্বই। আমি এবারও ফিরে এলাম সাফল্যের দরজা থেকে—ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠের চিরাচরিত নিয়মে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাউন আর ফিংগলটন এমন উদ্যমহীন হয়ে পড়লো যে আমার এ সম্পর্কে কিছু করা দরকার মনে হলো। লাঞ্চের সময়ে ওদের একটু হাত চালাতে বললাম। তারপর ব্রাউন আউট হলে আমি নিজেই চালালাম—তিয়াত্তর মিনিটে একশো পুরিয়ে। সেই সময় পর্যন্ত দ্রুততম সেঞ্চুরী।

লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। ছুটো ব্যাপার উল্লেখযোগ্য খেলায়—হ্যামণ্ড ছুশো চল্লিশ করলেন, অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্রাউনের হলো ছুশো ছ' রান, আউট না হয়ে।

ম্যাককরমিক এই প্রথম তার অস্ট্রেলীয় ফর্ম দেখালো তিনটে উপর্যুপরি উইকেট নিয়ে, ইংল্যাণ্ডের রান তখন তিন উইকেটে একত্রিশ।

হ্যামণ্ড আর পেণ্টার মিলে রান তুললেন ছুশো তিপান্নতে, শেষে নিরানব্বইতে পেণ্টার গেলেন, এল. বি. ডব্লিউ.তে।

হ্যামণ্ডের খেলার আমি চিরদিনই গুণমুগ্ধ, কিন্তু এ যা দেখলাম তা আমি কোনোদিনই ভুলবো না। খেলার মধ্যে ছু-ছুবার চোট পেয়েও অনায়াস ভঙ্গিতে খেলে গেলেন। মারের প্রচণ্ডতার জন্যে হ্যামণ্ড দর্শকদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। এরই একটা থামাতে গিয়ে চিপারফিল্ডের আঙুল ছুমড়ে গেলো। সে খেলায় ফিল্ডিং করা আর সম্ভব হয়নি তার।

লেস্ এমসের আঙুলও ভাঙলো, ফলে পেণ্টার উইকেটরক্ষণে তার অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পেলো।

বিল ব্রাউন যথারীতি ব্যাট করে গেলো, ও ছাড়া এ সফরে কি করতাম বলা মুশকিল।

দ্বিতীয় ইনিংসে উত্থান-পতন শুরু হলো, এবং ইংল্যাণ্ডের সাত উইকেটে একশো বিয়াল্লিশ রান উঠতে মনে হলো জিতে যাবো আমরা। কিন্তু কম্পটন- আর ওয়েলার্ড অন্যভাবে চিন্তা করেছিলো ব্যাপারটা। লর্ডসে টেস্টের দ্বিতীয় খেলাটা মোটামুটি নিয়ম করে উইম্বলডনের টেনিসের সঙ্গে শুরু হয়। আমাদের একটা টেলিভিশান সেট জুটেছিলো—এবং এই প্রথম ওই অদ্ভুত যন্ত্রটির কার্যকলাপ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। টেলিভিশানের তখন শৈশবাবস্থা, তবু খেলাটা পরিষ্কারই দেখা গেলো।

রেডিও টেলিফোনে কথা বলেছি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে উনিশশো তিরিশে। তখন ওই ব্যবস্থারও কৈশোর চলছিলো। যে সব ব্যবস্থা পরবর্তী সময়ে সাধারণ বলে পরিগণিত, সে সবের বাল্যাবস্থা দেখার মজা সবাই পায় না।

ম্যানচেস্টারের চৌত্রিশ সালের প্রচণ্ড তাপমাত্রার উল্লেখ করেছি আগে, এবার আর টস করতেই হলো না—এতো গরম পড়লো যে খেলা বাতিল হলো। ফলে সফরের সব খেলাতেই হারের লজ্জা থেকে পরিত্রাণ মিললো।

লিডসে এসে মনে হলো যা করার এবারই করা দরকার, নইলে কোনোকালেই হবে না তা। ইয়র্কশায়ারের এই মাঠে অস্ট্রেলিয়া আগে ভালো ফল দেখিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও অনুকূলে ছিলো, কাজেই অনুপ্রাণিত হলাম। মাঠের অবস্থাও ভালোই মনে হলো। কিন্তু গোল বাধলো যখন ইংল্যাণ্ড প্রথমে ব্যাট করতে নামলো।

অবস্থার উন্নতি হতে লাগলো ক্রমে, আমাদের বোলারদের ধন্যবাদ, ওদের দুশো তেইশে নামিয়ে দেওয়া গেলো। ও'রিলীর প্রাক-লাঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করতেই হয়—চোদ্দ ওভারে এগারোটা মেডেন, চার রানে এক উইকেট, এর মধ্যে আবার দুটো 'নো-বলে'র। তিনটে ক্যাচও ফেলেছিলো ও'রিলী।

এই রানসংখ্যার কাছাকাছি যাবার প্রাণপণ চেষ্টা চললো, কিন্তু আবার আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হলো—আবার সেই প্লাবনের

শঙ্কা। ভাবলাম—ভিজে মাঠে পর্যাপ্ত আলোয় খেলার চেয়ে কম আলোতে শুকনো মাঠই শ্রেয়। খেলোয়াড়দের আবেদনে না যাবার নির্দেশ দিলাম। ফিল্ডিংয়ে দলনায়কের সে অধিকার রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্টেও এই দাওয়াই দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু কম আলোতে তো ফিল্ডিংয়েরই সুবিধে। জীবনে এতো খারাপ আলোয় কখনো ব্যাট করিনি। কাগজেব লোকেরা জানিয়ে দিলো আমি আবেদন না করলে তারাই করবে, কারণ অন্ধকারে লিখতে পারছে না তারা। গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে আলো ছিলো বলে শুধু মাঠের মাঝখানেই দেখা যাচ্ছিলো আমাদের।

প্রথম ইনিংসে সামান্য রানের ব্যবধানে এগোতে পারলাম। তারপর ও'রিলী আর তার সাকরেদ ফ্লিটউড-স্মিথ শুরু করলো তাদের খেল্। হার্ডস্টাফকে হতবুদ্ধি করে যে বলটা স্টাম্প উড়িয়েছিলো সেটা প্রায়ই চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তারপর আব একটার কথা, যেটা ব্রাউন শর্ট লেগে হ্যামণ্ডকে ক্যাচ ধরলো। এক হাতেই ধরেছিলো সে ক্যাচটা।

'স্পিনে'র কাজ চললো—ইংল্যাণ্ডকে একশো তেইশে ইনিংস শেষ করতে হলো। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একই অবস্থা, তাদেরও ঝপাঝপ পড়তে শুরু করলো উইকেট, আকাশে মেঘের গতায়াতের সঙ্গে তাল রেখে।

খেলা এমন জমে উঠলো যে জীবনে এই একবারই খেলায় অংশ নিয়েও দর্শক বনে গেলাম। সাজবদলের ঘরের দৃশ্যও বিচিত্র—ও'রিলী প্যাড পরেও সমানে প্রার্থনা করে চলেছে, মাঠে যেন নামতে না হয়। পায়চারিও চলেছে। আর এক কোণে পায়চারি চলেছে আমারও। দাঁতে দাঁত লাগার ভয়ে রুমাল চিবিয়ে চলেছি—চা-ও চলছে মাঝে মাঝে। সতীর্থদের খেলার ভাষ্যও কানে আসছে।

আমাদের পরিচালকের অবস্থা আরো শোচনীয়, তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে বেড়াতে বেরোলেন। বাইরে অসংখ্য মানুষের ভীড়, এরা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। শিরা বেয়ে শিহরণ নামছে দর্শকদের, এমন খেলা আগে দেখিনি। ওই পরিবেশে বেঁটেখাটো মানুষ হ্যাসেট চালিয়ে গেলো, বেমক্কা বল পিটিয়ে।

জয় হলো—রাবার হাতছাড়া হবার কোনো ভয় নেই আর। এই

খেলায় ফিল্ডিংয়ের যে নৈপুণ্য দেখেছি তা চালিয়ে যেতে পারলে ক্রিকেটের আইনকানুন না পাল্টালেও চলতো। কিন্তু সব খেলায় তো তা হয় না!

এ ঘটনা স্মরণীয় করে রাখতে হ্যারোগেট হোটেলে একটা ঘরোয়া ডিনারের আয়োজনের লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

লীড্‌সের এই খেলার পর উত্তেজনা থিতিয়ে আসতে সময় লাগলো। দ্বিতীয় আর তৃতীয় খেলাগুলোর সম্পর্কে লেখার বিশেষ কিছু নেই। শুধু পঞ্চম টেস্টের অবমাননাকর পরাজয়ের অপেক্ষায় আছি।

ম্যাককরমিককে বাদ দেবার ঝুঁকি নিতেই হলো। স্নায়বিক ব্যাপারটা তখনো রয়েছে ওর, এবং আগের খেলায় মনে হয়েছে সে যে কোনো মুহূর্তেই পড়ে যেতে পারে। ফলে ম্যাক্‌ক্যাব আর ওয়েইটকে দিয়ে বল দেওয়ানো শুরু হলো। নরম মাঠে দুর্বল হাতের বল পিটিয়ে চললো ইংল্যাণ্ড শক্ত হাতে—রানের পর রান, তারপরও রান—শেষে সেই বিস্ময়কর সংখ্যাটি হলো—সাত উইকেটে নশো তিন রান!

অনেক কথা উঠলো—কেউ বললেন ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়দের নাচিয়েছে। অন্যেরা বললেন টেস্ট্ ম্যাচ যাতে শেষ পর্যন্ত না চলে ভবিষ্যতে সেই ব্যবস্থাই করলো ইংরেজরা, কারণ তারাই এতোদিন সীমিত সময়ের খেলার পক্ষে ছিলো। যাই হোক, এই নিয়ে মাথাব্যথা ছিলো না আমার।

আমাদের আক্রমণভাগের এমন শোচনীয় অবস্থা হলো যে আমাকেই বল তুলে নিতে হলো হাতে—কিন্তু আমার অবস্থাও তথৈবচ—পায়ের গোছে গর্ত হয়ে আছে বলের বাড়ি খেয়ে। পরে এক্স-রে করে দেখা গেছে হাড়ও অক্ষত নেই। সফরে সেই আমার শেষ খেলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের মধ্যেও ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর এক সুন্দর চিঠি পেলাম, লেখা আছে:

> খবরটা পাবার পর কতটা বেদনাহত হয়েছি লিখে জানানো যায় না। জানি এটা আপনার স্বভাব শক্তিতে সহ্য করতে পারবেন, তবু, এর নিষ্ঠুরতা তো অস্বীকার করা যায় না।
>
> আপনার এবং আপনার সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে না পারার জন্যে দুঃখি

আপাততঃ বিদায় নেবার পর বলছি আপনার সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ চিরমধুর হয়ে থাকবে।

ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যান সারা ইংরেজী-ভাষী জগতে সুপরিচিত, কিন্তু মানুষ ব্র্যাডম্যানকে আমার বন্ধু বলেই জানি।

ইতি

আপনার একান্ত বিনীত

বল্ডউইন (বিউডলির)

সে খেলা থেকে ফিংগলটনও অবসর নিয়েছিলো, তার পায়ের পেশী ছিঁড়ে যায়।

এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে একটা মানুষকে ধীরস্থির আত্মস্থ দেখেছি—তিনি লিওনার্ড হাটন। পাক্কা তেরো ঘণ্টা বিশ মিনিট খেলে গেছেন ভদ্রলোক—বিশ্ব টেস্টের রেকর্ড-সৃষ্টিকারী খেলা। রান হয়েছিলো তিনশো চৌষট্টি। কোনো ফাঁক ছিলো না। প্রথম সেঞ্চুরীর সময় ফ্লিটউড-স্মিথের একটা বল তাঁকে প্রায় বসিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু বলটা অফ-স্টাম্পের মাথার এতো কাছ দিয়ে গেলো যে বারনেট সেটা ধরতে পারলেন না। হাটন থেকে গেলেন ক্রিজে। এছাড়া আর কোনো সুযোগের অপব্যবহার চোখে পড়েনি।

সারাটা ইনিংসে অনমনীয় দৃঢ়তার ব্যাটিং—ফাটল ধরাবার সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। প্রত্যেকটি মার নিখুঁত, প্রত্যেকটিই নিজগুণে সমৃদ্ধ।

হাটন যখন আমার তিনশো চৌত্রিশ রানের রেকর্ড অতিক্রম করছেন, আমি সর্ট-লেগে ফিল্ড করছি। আমিই সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত মেলাই তাঁর সঙ্গে।

ইংল্যাণ্ডের এই যুগান্তকারী রানসৃষ্টির অন্য ভাগীদারদের মধ্যে ছিলেন লেল্যাণ্ড, একশো সাতাশিতে রান-আউট হন তিনি। হার্ডস্টাফ একশো উনসত্তর করেছিলেন, অপরাজিত থেকে।

অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামার অনেক আগেই খেলার শেষ হয়েছে বলা যায়, এবং খেলায় দু' পক্ষই একটা করে ম্যাচ জেতায় 'অ্যাসেস' অস্ট্রেলিয়ারই থাকলো, কারণ তখনো পর্যন্ত তাঁদের দখলেই সেটা।

বাকি খেলাগুলো আমি অসুস্থ থাকায় দেখতে পারিনি?

'প্রাণান্তকারী' মরসুমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো দলে, আবার হার হলো আমাদের। এবার গাওয়ারের একাদশের সঙ্গে। খেলা হয়েছিলো স্কারবরোর মাঠে।

আমার সময় কাটলো বার্নহ্যামে। বন্ধু রোবিন্সের আতিথ্যে আমার পায়ের অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এলো। এই সময়ে অবশ্য পায়ের জন্যে আমি বিশ্ববিখ্যাত স্কোয়াস খেলোয়াড় আমৃর্ বে'র সঙ্গে খেলতে পারিনি। শেখার অনেক ছিলো বলেই ক্ষোভ থেকে গেলো। একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খেয়ে ভদ্রলোকের সাহচর্য লাভের তৃষ্ণা মেটাতে হলো। আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি—ভদ্রলোক তাঁর ওই ছোট্টখাট্ট চেহারা নিয়ে একটা প্রচণ্ড পরিশ্রমের খেলায় কি করে খ্যাতির শীর্ষে পৌছেছেন!

সফরের বিশ্লেষণ করার সময় একটা কথাই মনে হয়েছে, যে প্রাথমিক আক্রমণের উপযোগী বোলারের অভাবে আমাদের এই বিপর্যয় বরণ করতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার মুহূর্তে ম্যাক্‌করমিক আমাদের অনেক আশার ব্যাখ্যান শুনিয়েছে, কিন্তু ওরস্টারের সেই ভয়াবহ দিনটির পর সে সম্পূর্ণ নিভে গেছে। দলে আর কোনো পেস বোলার না থাকায়, আমাদের আবার 'স্পিনার'দের ওপরই ভরসা করতে হয়েছে।

তবু, কাজ হয়তো হতো, কিন্তু আটত্রিশের খেলাগুলোর গোড়াতে আমাদের পুরো দুটো দিন গেছে, বল ঘোরাবার চেষ্টায়। এক" ইঞ্চিও এদিক-ওদিক করা যায়নি। তারপর ভরসা তো ও'রিলী আর ফ্লিটউড-স্মিথ।

প্রথম টেস্টের হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার পরও ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্ড অত্যন্ত ভালো ফল করেছে।

ইংরেজদের সঙ্গে খেলায় একটা ব্যাপারের খুব বেশি গুরুত্বের দরকার ছিলো—বলের গতিবেগ। এটা আরো বেশি প্রযোজ্য ছিল প্রাদেশিক পর্যায়ের তিনদিনের খেলাগুলোতে।

তিরিশ সালে অ্যালেক হারউড সফল হননি শুধুমাত্র এই কারণেই। চমৎকার বল করেছেন হারউড, কিন্তু উডফুল তাঁকে দলে রাখতে পারেননি। কারণ: মাঠে আরো অনেক বেশি সময় চলে যেতো।

কোনো দলকে দেড়শো রানে ছ ঘণ্টায় বসিয়ে দেওয়া তাদের তিন ঘণ্টায় একশো তিরিশ করতে দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী, অবশ্যই যদি আপনার লোকেরা প্রয়োজনীয় রানগুলো তুলতে সক্ষম হন।

ওয়ার্ডের এই ব্যাপারে অসাধারণত্ব ছিলো। প্রত্যেকটি খেলায় গড়ে তেত্রিশটা বলে একটা উইকেট নিয়েছেন উনি।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে গ্রিমেট বা মেইলির গড় ছাড়িয়েছেন ওয়ার্ড এইভাবে। 'স্পিন' বোলারদের যাঁরা স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে ওয়ার্ডের কথাও স্বীকার করবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ধরনের বোলাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। ব্যাটিংয়েও বার্নেসকে না পাওয়ায় আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে—ইংল্যাণ্ডে তাঁর পরের খেলাগুলো দেখে তাই মনে হয়েছে।

একটা ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা আজো খুঁজে পাইনি। সেটা হচ্ছে টেস্টের খেলাগুলোতে ব্যাডককের সামগ্রিক ব্যর্থতা। প্রাদেশিক খেলা-গুলোতে দারুণ খেলেছেন, কিন্তু টেস্টে এসেই একেবারে অন্যরকম। আটটা ইনিংসে মোট রান উঠেছিলো বত্রিশ। প্রাদেশিক খেলাগুলোয় অবশ্য বল পিটিয়েছেন অবলীলায়।

দল পরিচালনা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার সেটা প্রথম বারেই জানা হয়েছে। সময়ে সময়ে মনে হয়েছে আর পারছি না যুঝতে, কিন্তু বয়স কিই বা তখন আমার। প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াতে আর একটা টেস্ট মরসুম কাটিয়েই অবসর নিতে হতে পারে।

ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও আমি এখনো বিশ্বাস করি, স্বাভাবিক-ভাবেই খেলার পারম্পর্য বজায় রেখে আটত্রিশ সালেই ইংল্যাণ্ড টেস্টের শেষ মরসুম আমার। টেস্টের শেষ খেলার পর অর্ধাঙ্গিনীরা ইংল্যাণ্ডে হাজির হলেন। 'রা' বলছি এজন্যে যে আমারটি ছাড়া ম্যানেজারের ম্যাকক্যাবের আর ফ্লিটউড-স্মিথের গৃহিণীরাও তাঁদের 'সফরে' এলেন। এঁদের সঙ্গ আমাদের মানসিক স্থৈর্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়েছে।

কিন্তু মনঃপীড়ার কারণ হলো ইয়োরোপের দ্রুতপরিবর্তনশীল সমাজ

চিত্রপট। লণ্ডনের সর্বত্র চলেছে ট্রেঞ্চ খোঁড়াখুঁড়ি। হিটলারের 'বিশ্ব-জয়' স্বপ্নের শিকার হতে হবে ভেবে আতঙ্কিত হয়েছি।

নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পেতেই আমি সস্ত্রীক ইয়োরোপ ঘোরার পালায় বেরিয়ে পড়লাম—ভ্রমণসংস্থার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

তারপর আবার ফেরা।

উনিশশো আটত্রিশ-উনচল্লিশ সাল

সফর শেষে আবার দেশের মাঠ। আবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব, আর জয়ের গৌরব।

ভিক্টোরিয়াকে এক পয়েন্টে হারিয়ে শেফিল্ড শীল্ডের সম্মান ফিরিয়ে আনলাম।

এডিলেডের মাঠে প্রথম খেলা পড়লো নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে, প্রায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পেরেছি এ খেলায়। রান হলো একশো তেতাল্লিশ, কিন্তু আমার খেলার জৌলুষ ম্লান করে দিলো জ্যাক ব্যাডকক, নট আউট দুশো একাত্তর করে। এ খেলায় ও'রিলী সুবিধে করতে পারেনি, সম্ভবতঃ প্রবাসের অতিশ্রম তখনো তার ঘাড়ে ভর করে আছে। আবার অন্যদিকে ক্ল্যারি গ্রিমেট তার পূর্বখ্যাতি বজায় রাখতে পেরেছিলো, খেলার দশটা উইকেটই গেছে তার হাতে।

কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায়, ব্যাডকক আর আমি রান ভাগাভাগি করলাম—সে তুললো একশো, আমি দুশো পঁচিশ।

ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে পরের খেলায় একশো সাত, তারপর আবার কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একশো ছিয়াশি।

সিডনি ফিরে নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে একশো পঁয়তাল্লিশ, আউট না হয়ে। পরের খেলা মেলবোর্ন ক্রিকেট সংস্থার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হলো, এতে হলো একশো আঠারো রান। সি. বি. ফ্রাইয়ের পর পর ছটা সেঞ্চুরী করার রেকর্ড ছোঁয়া গেলো।

শেষ খেলায় দারুণ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিলো—ছয়ের সঙ্গে আরো এক যুক্ত হয় কিনা দেখার জন্যে। কিন্তু না—হলো না—ফ্লিটউড-স্মিথ, কোনোদিনই ভালো ফিল্ডসম্যান বলে যার খ্যাতি ছিলো না, আমাকে পাঁচ রানে ধরলো ক্যাচে।

স্বদেশে এই হলো আমার সফলতম মরসুম।

ক্রিকেট যাঁরা খেলেন তাঁদের শারীরিক পরিশ্রম অন্য যে কোনো খেলার চেয়ে বেশি হয়, কাজেই মানসিক বিশ্রাম দেওয়া উচিত অন্ততঃ। অন্য খেলাতেও সেটা হয়, তবে শারীরিক যোগ্যতাও বজায় থাকে।

এই কারণেই, স্কোয়াস খেলা শুরু করলাম দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় এসে। স্কোয়াসে একাগ্রতার অনুশীলন হয়—যদিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যাণ্ডে খেলাটি অনেক বেশি জনপ্রিয়, আমার মনে হয় এর জন্যে আবহাওয়াই মুখ্যতঃ দায়ী।

স্কোয়াসেও প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় যাবার সুযোগ হলো—দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা। উনচল্লিশের শীতের মরসুমে খেলা হলো ডন টার্নবুলের সঙ্গে—ইনি ডেভিস কাপ খ্যাত খেলোয়াড়। প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো আমাদের খেলা এবং অবশেষে জয়ী হই আমি। ফলাফল হলো ০/৯, ৪/৯, ১০/৮, ৯/৩, ১০/৮। তৃতীয় আর পঞ্চম সেটে আমার ভয়ানক পরিশ্রম হয়েছে। খেলা চলেছে এক ঘণ্টা ধরে। একদিনের ব্যাটিংয়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমের ব্যাপার।

স্কোয়ার্স খেলা শুরুর আগে হ্যারি হপম্যান অবশ্য সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—আধঘণ্টার বেশি যেন একটানা না খেলি। ওঁর কথা মনে পড়ে গেলো—আর কখনো প্রতিযোগিতামূলক স্কোয়াসের আসরে নামিনি।

উনিশশো উনচল্লিশ-চল্লিশে শেফিল্ড শীল্ড নিউ সাউথ ওয়েলসের ঘরে ফিরে গেলো।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া খেলা ভালই শুরু করেছিলো, পূর্বাবস্থা বজায় থাকার পর্যায়ে এলোও, কিন্তু কুইন্সল্যাণ্ডের হাতে শেষে খেলার মোড় ঘুরলো।

উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠলো—তার ঢেউ পৌছলো খেলার মাঠেও।

সরকারী নির্দেশে খেলা চলতে থাকলো, এবং এটা খেলোয়াড়দের—তথা সাধারণ মানুষের নৈতিক স্থিতিশীলতার সহায়ক হয়েছিলো। জাতীয় তহবিল বাড়াবার জন্যে একটা খেলাও অনুষ্ঠিত হলো। হাজার দেড়েক পাউণ্ড সংগৃহীত হলো খেলায়।

ও'রিলী সে মরসুমে অদ্ভুত ভাল খেলেছিলো—বাহান্নটা উইকেট নিয়ে তার গড় হয়েছিলো ১৩·৫। খেলার পর খেলার সে তার প্রভাব বিস্তার করে চললো।

আমার মনে হয় আমার খেলাও সেই শেফিল্ড মরসুমে সন্তোষজনক হয়েছিলো।

খেলাটা ছিলো দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস। এডিলেডের মাঠেই খেলা। আগন্তুকেরা তিনশো ছত্রিশ করলো। তারপর আমরা শুরু করতে ও'রিলী তার ভেলকিও শুরু করলো। প্রথমে ওয়ার্ডের সঙ্গে জুটিতে, পরে গ্রিমেটের সঙ্গে ও'রিলীকে ঠেকাবার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেলাম। এভাবে মোটামুটি এগোনো গেলো। প্রথম ইনিংসে হলো দুশো একান্ন, আউট হইনি। শেষ উইকেটের জুটিতে একশো তেরোর মধ্যে আমি করলাম সাতাশি। দ্বিতীয় ইনিংসে নব্বই হলো, এবারও আউট হইনি—তিন উইকেটে একশো ছাপান্ন রান চলছিলো তখন।

এ ব্যাপারটা নিয়ে এতো লেখালেখি করলাম এই জন্যে যে ও'রিলী তার ধ্বংসকারী মেজাজে ছিলো সেদিন, যার ফলে সেদিনের বিপক্ষের শক্তির প্রচণ্ডতাও কল্পনার অতীত ছিলো।

মরসুমে বাকি খেলাগুলোয় কিছু ভালো রানই তুলতে পেরেছিলাম—মোট রান হয়েছিলো এক হাজার দুই। আটবার আউট হয়েছি, তার মধ্যে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে একটা ইনিংস খেলে একবার।

ইয়োরোপের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেশের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে মনে হলো—নাম লেখালাম রয়েল অস্ট্রেলিয়ান বিমান বহরে।

এতো মানুষ যুদ্ধের কাজে যোগ দিয়েছে যে যন্ত্রপাতি আর বিমানের তুলনায় অনেক বেশি দাঁড়িয়ে গেলো, ফলে আমাকে ফালতু থাকতে হলো

বেশ কিছুদিন। বয়সও বেড়ে যাচ্ছে কাজেই আকাশে ওড়ার সম্ভাবনা মিলিয়ে গেলো ক্রমে। সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করলেন। ক্যাম্পে কাজ বাড়তে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার পেশীর যন্ত্রণাও।

আমি সেখানে আছি জেনে একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ আমার চোখ পরীক্ষা করতে এলেন। ভদ্রলোক বৈমানিকদের চোখের ব্যাপারে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন—এবং আমাকে আদর্শ রোগী বলে বেছে নিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, চোখ পরীক্ষা করে কিন্তু অসুখের প্রকৃতি অন্য বলে জানা গেলো, যে ব্যাপার আগে সন্দেহ করলেও তার প্রতিকার হয়েছে ধরে নিয়েছিলাম।

এর পরও, দুটো প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ নেবার জন্যে ছুটি পেলাম। ডাক্তারের কথাই সত্যি হলো—চারটে ইনিংসে মাত্র আঠারো রান নিতে পেরেছিলাম, তাঁর মধ্যে দুবার 'শূন্য' হস্তে ফেরা! সত্যি বলতে কি, বল প্রায় চোখেই দেখতে পাইনি!

এবার দোসরও জুটলো, চৌত্রিশ সালের রোগগুলোও (অ্যাপেণ্ডি-সাইটিস বাদে) মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিন তিনবার হাসপাতাল আর বাড়ি করে পরীক্ষা হলো। রায়ও বেরোলো—পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।

বড় কঠিন রায়—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আউট হলাম—আম্পায়ারের রায়ই চূড়ান্ত!

ফিরে যেতে হলো বাউরালে শরীর সারাতে। যাঁরা কোনোদিন পেশীজনিত যন্ত্রণায় ভুগেছেন তাঁরা জানেন ব্যাপারটা কি ধরনের বেদনা-দায়ক। একটা সময়ে তো আমার ডান হাত তুলতে রীতিমতো কষ্ট হয়েছিলো—চুল আঁচড়াতে পর্যন্ত পারিনি সেই সময়ে।

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে কোনো অনুভূতি ছিলো না—এটা আর সারেইনি, পরের টেস্টের সময়েও না।

আমার স্ত্রী আগেও আমার বিপদে ত্রাণকর্ত্রীরূপে দেখা দিয়েছেন। এবারও এগিয়ে এলেন তিনি—স্বহস্তে খুর তুলে নিলেন হাতে, দাড়ি কামাবার কাজেও অভিজ্ঞা বলে প্রমাণিত করলেন নিজেকে। কয়েক

মাসের মধ্যে অসামরিক কাজে যোগ দিলাম, হালকা কাজই দেওয়া হলো আমাকে।

শুরু হলো আঁধারের দিন—ক্রিকেট আর খেলা হলো না কোনো দিন।

বিগতদিনের অতিপরিশ্রমের ফল ফলতে আরম্ভ করলো। স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চললো—হতাশা নামলো মনে। কিন্তু কিছু উন্নতি অবশ্য দেখা গেলো—পরে।

সমষ্টি-উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম—এডিলেডের কমল-ওয়েলথ সংস্থার সদস্য ছিলাম কিছুদিন, তারপর উনিশশো চুয়াল্লিশে সভাপতি হলাম সংস্থার।

সংস্থার সদস্য সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছিলো—যাঁদের অধিকাংশই শহরের বিদগ্ধ সমাজের মানুষ। বাইরের মানুষও আতিথ্য নিয়েছেন সংস্থায়। উল্লেখযোগ্য হলেন : লর্ড মণ্টগোমারী আর মিঃ অ্যান্টনি ইডেন।

আমার সভাপতিত্বে প্রথম সম্বর্ধনা জানানো হয় ডেম এণ্ডি লায়নসকে। ইনি প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রাইট অনারেবাল জে. এ. লায়নসের সহধর্মিনী। এমি জনসনের পর কোনো মহিলাকে এ ধরনের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়নি।

এণ্ডি প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়বাসীদের কাছে।

তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী রাঃ অনঃ জন কারটিনের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতার সুযোগ হয়েছিলো। 'যুদ্ধজয় ও শান্তির' যমজ পুরস্কারের জন্যে দীর্ঘজীবী থাকুন তিনি, এ প্রার্থনাও করেছিলাম সভায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, ভদ্রলোক জয়ের বার্তা ঘোষিত হবার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মারা যান।

সংস্থার সভাপতি এবং অন্যান্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দেখেছি ইংরেজদের সঙ্গ কত আনন্দদায়ক। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যপালের এক সভায় একটা অভিজ্ঞতা থেকে একথা বললাম। লর্ড কেইসের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন হয়েছিলো এডিলেডের টাউন হলে। নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি হলো। প্রধান গৃহস্বামী হিসেবে আমার চিন্তা হলো অনুষ্ঠান কিভাবে সুসম্পন্ন হয় তার তদ্বির করে যাওয়া।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে কাগজ খুলে দেখি কেইস্ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং ডাক্তারের নির্দেশে সমস্ত সভাসমিতি যোগদানের কর্মসূচী বাতিল করা হয়েছে। আমার অবস্থাটা বুঝুন!

রাজ্যপাল ভবনে (যেখানে লর্ড কেইস্ উঠেছিলেন), ফোন করলাম, ওঁর সচিবের কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থাটা জানার জন্যে। তখনো সকাল আটটা বাজেনি, যিনি ফোন ধরলেন, তাঁকে সবিনয়ে রাজ্যপালের সচিব বা নিরাপত্তা কর্মীদের কাউকে দিতে অনুরোধ করলাম। বিস্মিত হলাম জেনে, যে তাঁদের কেউই এখনো এসে পৌঁছননি, কিন্তু রাজ্যপাল কথা বলছেন, তিনি কি কোনো সাহায্য করতে পারেন!

অসুস্থতার সংবাদ পাকাপাকি জেনে নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো, "ভাবছিলাম আমি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারি।"

এই সহৃদয় প্রস্তাবের কথা কি ভোলা যায়? সেইদিন থেকে রাজ্যপাল স্যর উইলোবাই নরি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার মানুষের কাছে এক অনন্য শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে গণ্য হয়েছেন। একমাত্র তুলনা যার চলে আর এক রাজ্যপালের সঙ্গে, তিনি আর্ল অফ গাউরি। গাউরিকে মানুষ উচ্চাসনে বসিয়েছিলো—তাঁর নামে একটা ট্রাস্ট তহবিলও চালু হয়েছিলো। সে সংস্থার অবৈতনিক সম্পাদক এবং উদ্যোক্তা ছিলাম আমিই। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড সংগৃহীত হয়েছিলো তহবিলে। এই টাকার সুদ থেকে প্রতি বছর প্রাক্তন সৈনিকদের বা তাঁদের সন্তানাদির বৃত্তির ব্যবস্থাও ছিলো।

বৃত্তির জন্যে আবেদন-প্রার্থীর সংখ্যাও প্রচুর ছিলো। গাউরি সাহেবের নাম এর থেকে উন্নততর কোনো উপায়ে জনসাধারণের মনে প্রোজ্জ্বল রাখা যেত কিনা জানি না।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশে যুদ্ধশেষের বছরে 'মিত্রপক্ষে'র জগৎ পুনরুজ্জীবিত হলো—ইয়োরোপে শত্রুতার পালা শেষ হলো।

উনিশশো চৌত্রিশ সালে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসার একমাত্র কারণ ছিলো একটা ভালো চাকরি পাওয়া যার সঙ্গে ক্রিকেটের কোনো

বিরোধ থাকবে না, নিরাপত্তাও মিলবে। আর এখন আমার স্বাস্থ্য পুনরোদ্ধারের মুহূর্তে, বিনা দোষে, আমি অন্যের ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হলাম। আমি যে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সেটা রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেলো।

পেছনে তাকানোর কোনো অবকাশ নেই—আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অচিরাৎ-সিদ্ধান্তে পৌঁছনো দরকার। এই প্রতিকূলতার মধ্যেও কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যবসায়ে নামলাম। পরের কয়েক মাস ধরে যে ধকল চললো তার জন্যে আমার শারীরিক প্রস্তুতি ছিলো না মোটেই। দিনের অনেক সময় জুড়ে কাজ আর নামমাত্র বিশ্রাম। এবারও আমার স্ত্রী তাঁর অমূল্য সহযোগিতা দিয়ে-আমাকে বাঁচিয়েছেন।

আবার এলো গ্রীষ্ম, বসন্তের দিন পেরিয়ে।

ক্রিকেটে অংশ নেবার কোনো সদিচ্ছা আমার ছিলো না এ মরসুমে, তবু কিছু সময় মাঠে গিয়ে খেলা দেখতাম বসে, ভালো লাগতো।

শেফিল্ড শীল্ডের খেলা বন্ধ হয়ে তার জায়গা নিলো ফৌজী দলের সঙ্গে খেলা। অস্ট্রেলিয়ার এই দলটি ইংল্যাণ্ডে কয়েকটা খেলা খেলে ফিরেছে, সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেই। বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে কিছু খেলা, ভারতেও কয়েকটি খেলায় অংশ নিয়েছে এই তরুণেরা। শেষোক্ত পর্যায়ের খেলা তাদের পরিশ্রমসাপেক্ষ হয়েছে।

স্থির হলো এই সব খেলার সংগৃহীত অর্থ অনুদানের জন্যে চিহ্নিত থাকবে।

ডিসেম্বর এলো। আমার কাছে প্রস্তাব এলো খেলার। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার দলকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে না করায় কর্তৃপক্ষ ফৌজী দলের বিপক্ষে আরও শক্তির উৎস খুঁজছেন। আমার তো অনুশীলনও বন্ধ হয়ে আছে, আমি কি কাজে লাগবো এ অবস্থায়? যাই হোক, আমার উপস্থিতিটুকুই যদি সাহায্য তহবিলের কাজে লাগে তাহলে আমি আছি। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবো জানিয়ে দিলাম।

মূল খেলার আগে আমাদের এডিলেডের ওভালে কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা খেলায় নামতে হলো। আমিও খেললাম, বড়দিনের সময় খেলাটা

হলো। দুটো ইনিংসে হলো আটষট্টি আর বাহান্ন, আউট না হয়ে। কষ্টও হলো খেলতে।

ফৌজী দলের সঙ্গেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হলো না। খাতায় কলমে একশো বারো উঠলো রান সংখ্যা, কিন্তু মারগুলো কি আনন্দ দিয়েছে দর্শকদের? না, আমি নিজেই পাই নি। ফৌজী তরুণেরাও তাদের খেলায় বাহবা নিতে পারেনি। তবু, ওদের মধ্যে হ্যাসেটের খেলায় যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেছে। আর একটি তরুণ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রাখলো, সে সিসিল পেপার। ছেলেটি পরে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলে তার প্রতিভার অপচয় করে।

ছেচল্লিশের গ্রীষ্মে অস্ট্রেলীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড নিউজিল্যাণ্ডে দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

যাত্রার আনন্দে ভরপুর হলেও আমাকে জানাতে হলো যেতে পারছি না ওদের সঙ্গে—কারণ, ঠিক সেই সময়েই ফাইব্রোসাইটিসের আক্রমণ প্রবল হয়েছে, ওষুধে সাময়িক কাজ দিয়েছে মাত্র। আর যে কোনোদিন মাঠে নামতে পারবো এমন মনে হলো না।

অস্ট্রেলীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য বন্ধুবর মিঃ ই. এ. ডোয়াইয়ার আমাকে আর্ন সণ্ডারসের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিলেন। সণ্ডারসের তখন খুব নামডাক ওই রোগের চিকিৎসক হিসেবে।

আশার চেয়ে বিশ্বাস কাজ করে বেশি, রাজি হলাম।

অলৌকিক ক্ষমতা ভদ্রলোকের! যে সব পেশী যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলো, সেই সব জায়গায় অবলীলায় চললো তাঁর ইস্পাত-কঠিন আঙুলের স্পর্শ।

সণ্ডারস প্রাকৃতিক চিকিৎসায় বিশ্বাসী। পূর্ণ চেতনার মানুষকে নিয়েই কারবার তাঁর—পরিচয় হবার আগে এ কথা জানতাম না। পরেও দেখেছি লোকে শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁকে কাজ করতে দিয়েছে—এমনি বিশ্বাসের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সণ্ডারস। প্রথম পর্বের চিকিৎসাতেই আমার বেদনার বহুল উপশম হয়েছে, মনে হয়েছে তাপ-প্রবাহের মধ্যে বরফ-শীতল অনুভব। সণ্ডারস আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্যের

আশ্বাস দিয়েছিলেন—বলেছিলেন আমি আবার ক্রিকেটের মাঠে আগের মতোই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবো।

কথা রাখতে পেরেছিলেন সণ্ডারস, যদিও তখনো দুর্গম রাস্তার শেষ হতে অনেক বাকি।

যুদ্ধোত্তর টেস্টের প্রস্তুতি

ছেচল্লিশের শীতকালটা পুরো চললো শরীরের পরিচর্যা। ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা গেলো ধীরে ধীরে—আগামী মরসুম খেলতে পারবো ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে গেলে যে শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োজন তার ঘাটতি আছে এখনো। তাড়াহুড়োয় বিপদ আছে।

আবার অন্যদিকে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে খেলাটা ঢেলে সাজার প্রশ্ন ছিলো। সে প্রশ্নে আমার কিছু করণীয় কিনা চিন্তার কারণ হলো বইকি।

আমার স্ত্রী আবার ত্রাণকর্ত্রীরূপে দেখা দিলেন, বললেন—ছেলে বড় হয়ে উঠেছে—তার পিতৃদেবকে টেস্ট ক্রিকেটের মাঠে দেখবে এই তার একমাত্র প্রত্যাশা, কাজেই খেলতে হবে। কিন্তু খেলার প্রতি সুবিচার করা যাবে কি? অন্ততঃ একটা মরসুম খেলতে হবেই, পরের কথা পরে।

মরসুম শুরু হতে তখনো কিছু দেরী, আমি সিডনি গেলাম বোর্ডের এক সভায় যোগ দিতে। শরীরের অবস্থা পূর্ববৎ।

এডিলেডে ফিরলাম, আরও ক্লান্ত—অবসাদগ্রস্ত। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো অস্ত্রোপচারের জন্যে। ভাগ্য!

ইংল্যাণ্ড দল আর কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়বে এডিলেডে। কাগজওলারা সোরগোল তুলেছে—আমি টেস্টে নামছি কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার কথা জানতে চায় তারা। তাদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে ক্ষেপে গেলো।

তাহলে আসলে ব্যাপারটা কি? নির্দ্বিধায় বলছি—আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো খেলা।

ডাক্তারের কাছে দৌড়ে গেলাম—তাঁর মতও নেতিবাচক। পরিষ্কার

বলে দিলেন আমার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে নামা উচিত হবে না। তার পরের অবস্থা যাচাইয়ের জন্যে আরও দুজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবার নির্দেশও দিলেন। ব্যবস্থা হলো, তাঁরাও বললেন—আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে টেস্ট খেলার ভরসা না রাখাই ভালো। জানতাম, একথাই শুনতে হবে আমাকে।

মোক্ষম প্রশ্ন করলাম তবুও (খেলা যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে), "খেললে বড় রকমের কোনো স্থায়ী শারীরিক বিকৃতির সম্ভাবনা আছে কি?"

তাঁরা বললেন সে রকম আশঙ্কা আছে জোর খাটাতে গেলে, এবং সর্বশেষে জানালেন আগের খেলা আমি কোনোদিনই খেলতে পারবো না।

উভয় সঙ্কটে পড়লাম। সাক্ষীর পালা শেষ, রায় বেরোবে—আমিই বিচারক।

স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করলাম।

একদিকে কাগজওলাদের সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি, অন্যদিকে ডাক্তারদের সাবধানবাণী। আর একদিকে খেলার ঐকান্তিক আগ্রহ। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সাবধানে খেললে শরীরের ক্ষতি হবে না। ডাক্তারের বারণ তুচ্ছ করে খেলবো ঠিক করলাম, অন্ততঃ ছোট খেলাগুলো। তাতে সুফল পেলে আর একবার অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাট ধরবো।

এডিলেডের মাঠে প্রথম খেলা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। নিজের ওপর অনাস্থা আর মনে উদ্বেগ নিয়ে ফিল্ড করতে নামলাম। টসে যথারীতি হেরেও বিপন্মুক্ত হওয়া গেলো না। পাঁচ উইকেটে পাঁচশো ছ রান পিটিয়ে হ্যামণ্ড সদলে খেলা ছেড়ে দিলো।

কোনোরকমে ছিয়াত্তর করলাম প্রথম ইনিংসে, দ্বিতীয়বারে তিনটে রান লিখিয়ে প্যাভিলিয়ানে ফিরতে হলো।

নিজেকে ব্র্যাডম্যানের ছায়া মনে হলো—কি মনে, শরীরে আর খেলায়।

কাগজে লিখলো: "আজ এক বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের প্রেতাত্মা দেখবার সুযোগ হয়েছে আমাদের,' আর প্রেত কখনোই তার জীবন ফিরে পায় না।"

সবই বুঝলাম। সামনে আরও বিপদ। প্রয়োজন শুধু একটু উৎসাহের।

পরের খেলা পড়লো মেলবোর্নে। উন্নতি হলো খেলার—সেঞ্চুরী করলাম, কিন্তু—হায়, পায়ের পেশী জখম হলো এবার। খেলা শেষ করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম হলো।

পরে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একটা প্রাদেশিক পর্যায়ের খেলায় সেঞ্চুরী হলো। নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসতে শুরু করলো।

এই তো চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্ত।

ও'রিলী খেলা ছেড়ে লেখা শুরু করবে জানিয়ে দিলো। যুদ্ধোত্তর খেলায় ও'রিলী তার পুরনো খেলা ফিরে পেয়েছিলো, বিশেষ করে নিউ-জিল্যাণ্ডের সঙ্গে গত মরসুমের একটা খেলায় উনিশটি ওভারে আটটা উইকেট নিয়েছিলো সে মাত্র তেত্রিশ রানের বিনিময়ে। কিন্তু তার হাঁটুর অবস্থা তখনো স্বাভাবিক হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া তার পয়লা নম্বর বোলার ছাড়া বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে চলেছে মনে হলো।

তাহলে? আমায় খেলায় নামতেই হচ্ছে! অস্ট্রেলিয়ার দলটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হলে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণদের তো থাকা দরকার।

সবকিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব্রিসবেনে অনুষ্ঠেয় টেস্টে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হবার প্রস্তাবে সায় দিলাম।

প্রেত জীবন ফিরে পেয়েছে—আস্থা বেড়েছে, সিদ্ধান্তে অটল আমি।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মাত্র তিনটি প্রাক্-যুদ্ধকালীন খেলোয়াড় খেলতে চলেছি: বারনেস, হ্যাসেট আর আমি। এদের মধ্যে বারনেস শুধু একবারই খেললেন। ইংল্যাণ্ডের দলে তুজন প্রবীণ।

টসে জিতলো অস্ট্রেলিয়া। এই প্রথম হ্যামণ্ডের দলকে মাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। মাঠের অবস্থা এককথায় চমৎকার। কিন্তু বিপদ শুরুতেই, হ্যামণ্ড স্বয়ং তার পুরনো অবস্থান—'স্লিপে' মরিসকে ক্যাচ আউট করলেন। 'বারনেস আর আমাতে ব্যাট করে চললাম বেশ নিরুপদ্রবে

খানিক সময়। তারপর বারনেস গেলো বেডসারের ক্যাচে। লেগেই ঘটনাটা ঘটলো—বেডসারের ছ' ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতাতেই যা সম্ভব। তারপর আমার পালা প্রায় সাঙ্গ করে ফেলেছিলো ভোসি। বলের মাথায় বাড়ি মেরে নীচে রাখার চেষ্টা করেও উঠে গেলো সেটা, পড়লো দ্বিতীয় স্লিপে আইকিনের কাছে।

আমার মতে বল আমার ব্যাট ছুঁয়েছে মাটিতে পড়ার আগে, সুতরাং সেটা 'ক্যাচ' নয়। আমি ক্রিজে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেরীতে হলেও আবেদন হলো ঠিকই। বোলারের দিকের আম্পায়ার বরউইক বিনা দ্বিধায় রায় দিলেন, "নট আউট।" স্কোয়ার লেগে তাঁর সহযোগীর সঙ্গেও এ সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। করলেও একই রায় পেতেন—কারণ স্কট (আম্পায়ার) পরে এক নিবন্ধে লিখেছেন : "ঝাঁকি বল ছিলো সেটা, ব্র্যাডম্যানের ব্যাটের থেকে কয়েক ইঞ্চি নীচে মাটি ছু য়েছিলো বল।"

বিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাদের 'দেরী'তে আবেদনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললো তারা এটা 'ক্যাচ' বলে ধরে নিয়েছিলো বলেই বিলম্ব করেছিলো।

বেতার ঘোষণাকারীরা ওটা 'ক্যাচ' নয় বলে একমত হয়েছিলেন—কাগজওলাদের মতামত অবশ্য সর্বসম্মত হতে পারেনি।

আসলে বেড়ার বাইরে কারুর পক্ষেই এ সম্পর্কে প্রামাণ্য মতামত দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

ঘটনার গুরুত্ব বাড়লো শুধু একটা কারণেই ; যেহেতু খেলায় আমি একশো সাতাশি করে গেলাম। কাগজে বলা হলো ইংল্যাণ্ডকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া হলো।

পরিষ্কার করে একটা কথাই এখানে জানানো দরকার, মূল কথাটা—সেটা হচ্ছে বল তার নিম্নগতির শেষে ব্যাট ছুঁয়েছিলো কি না, আইকিন সেটা লুফেছিলেন কিনা তা নয়।

এ ধরনের সিদ্ধান্তে আম্পায়াররা খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েন। এই প্রসঙ্গে আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে—লর্ডসের মাঠে গ্রিমেটের বলে হ্যামণ্ড পরিষ্কার আউট হলেও ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার 'নট আউট' দিয়েছিলেন।

মহিলারা টেস্টের প্রায় সব বলই 'ঝাঁকি' বলেই চিৎকার করে ওঠেন, তাহলে তো সবই আউট দিতে হয়।

খেলার শেষে হ্যামণ্ড দুজন আম্পায়ারেরই পুনর্নিয়োগ অনুমোদন করেছিলেন, বলেছিলেন, "ওটা ক্যাচ বলে ভেবেছি আমি, কিন্তু আম্পায়ার হয়তো নির্ভুল রায় দিয়েছেন, আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে।"

অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থাতেও বেডসার অনবদ্য বোলিংয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। অতো ভাল বলগুলোও কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। রোদের তাড়ায় খেলা ছেড়ে চলে গিয়েও আবার ফিরেছেন মাঠে।

অস্ট্রেলিয়া সে খেলায় ছশো পঁয়তাল্লিশ করেছিলো।

ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শুরু হতেই ঝড়বৃষ্টিও নামলো। অস্ট্রেলিয়ার আঠালো মাঠেই খেলতে হলো ওদের।

আমাদের টস্যাক চাবুক বোলার হলেও 'কাদা' মাঠে সুবিধে করতে পারেনি, তার অধিকাংশ বলই স্টাম্পের অনেক দূর দিয়েই গেলো।

তার সতেরো রানে তিন উইকেটের গড় খারাপ কেউ বলবে না, কিন্তু ভিজে মাঠে স্টাম্পই লক্ষ্য হয়, তাড়াতাড়ি আউট করার প্রয়োজনে।

এদিক দিয়ে ধরলে তার দ্বিতীয় ইনিংসের বিরাশি রানে ছটা উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব অনেক বেশি। কুড়ি ওভার বল হয়েছিলো।

এবার ঝেড়ে নামলো বৃষ্টি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই হাঁটুজল হয়ে গেলো মাঠে। স্টাম্প উড়ে গেলো। আমরা দৌড়ে সাজঘরে ঢুকে পড়লাম।

বৃষ্টির বেগ কমলে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলে পৌছলাম, ড্রাইভার ভিজে কাক।

মনে হয়েছিলো কয়েকদিনের মধ্যে মাঠমুখো হওয়া যাবে না। কিন্তু পরের দিনই খেলা শুরু হলো আবার।

ইংল্যাণ্ডের বরাত খারাপ। অস্ট্রেলিয়ার সান্ত্বনা দশ বছর আগে গাবি অ্যালেনের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থাও আজকের মতোই হয়েছিলো।

খেলা চলাকালীন আমাদের ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়ালের জলবসন্ত হলো, হাসপাতালে যেতে হলো তাকে। এ অবস্থায় অবশ্য তার বোলিং

খুব কার্যকরী ছিলো না, তবু—সিডনির দ্বিতীয় টেস্টের আগেও সে ছাড়া পেলো না হাসপাতাল থেকে। ইংল্যাণ্ড সিডনির খেলায় একটা বড় ভুলের সংশোধন করেছিলো—গিবকে বসিয়ে ইভানসকে খেলিয়ে। ব্রিসবেনের খেলায় গিব শোচনীয় ব্যাটিং করেছিলো।

আর একটা মজার কথা মনে পড়ছে, চটচটে উইকেটে বল 'উঠন্তে' দেখে এক ইংরেজ অস্ট্রেলিয়াকে বডিলাইন বল দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। অত্যন্ত ছেঁদো অভিযোগ—কারণ ওই মাঠে ওভাবে বল দেওয়াটাই সম্ভব হতো না। আর্থার গিলিগান অবশ্য সংক্ষেপে পরিষ্কার ভাষায় তা নস্যাৎ করে দিলেন, "একেবারে অর্থহীন—নিরর্থক। কথাটি যিনি লিখেছেন পাগলা-গারদে স্থান হওয়া উচিত তাঁর।"

আমার খেলার সঙ্গে আট বছরের আগের খেলার কেউ তুলনা করলে ভুল করবেন। স্রেফ অভিজ্ঞতার জোরে খেলা চালিয়েছিলাম। যাই হোক খেলতে পারছি এবং বাকি মরসুমটাও পারবো এ বিশ্বাস হলো। সিডনির খেলাতেও ইংল্যাণ্ড টসে জিতলো বটে, কিন্তু উদ্যমহীন খেলায় তাদের গতি ব্যাহত হলো। আমাদের বোলাররা অবশ্য খুবই ভালো খেলেছিলো, কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের ব্যাটসম্যানরা যতদিন আধতোল্লাই 'স্লো' বল খেলবেন ততোদিন টেস্ট হারবেন, সে যে পক্ষেই খেলুন না তাঁরা।

ওদের ইয়ান জনসনের খেলায় আনন্দ পেয়েছি। ওর দুটো 'স্লো অফ স্পিন' বল খেলেছি বটে তবে রানের বিনিময়ে নয়। জনসন এগারো ওভার বল করে তিন রানে একটা উইকেট নিয়েছিলো। তার মানে অষ্টআশিটা বলের পঁচাশিটাতেই রান নেই। অবিশ্বাস্য নয় কি? শেষ করলো পঁচিশ ওভারে একত্রিশ রানে চারটে উইকেট নিয়ে—টেস্ট খেলার শুরুতেই দারুণ প্রতিশ্রুতি বলতে হয়।

এই খেলায় ট্যালনের একটা ক্যাচের জবাব নেই—বলটা প্রথম স্লিপে জনসনের কাছে গেলো, কিন্তু বুকে লেগে বেরোতেই ট্যালন স্লিপের মাঝে শূন্যে সেটাকে ধরলো। আশ্চর্য পূর্বানুমান! বয়সটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে চার করার ধাক্কায় ছুটলাম, ফলে উরুর পেশী আবার জখম হওয়ায় সেদিনটা বসে যেতে হলো। বৃষ্টির দাপট বাড়লো। তবে খেলা বন্ধ

করার অবস্থা হয়নি। এদিকে দিনের আলো ফুরিয়ে এলো—বারনেস আবেদন করে টিটকিরি কুড়োলো শুধু। আসল বিপদটা হলো ইলেকট্রিক আলো জ্বালানোতে। এবং আবেদনও তাই নিয়ে।

এসব সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের ক্ষোভের কারণ আবেদনের বিরুদ্ধে নয়, আম্পায়ারদের দীর্ঘ সময়ের নিভৃত পরামর্শ।

ঐ সবের দরকার হয় না যদি সংশ্লিষ্ট আম্পায়ার মনে করেন আলোকাবস্থা পর্যাপ্ত এবং খেলা চলতে পারে।

আম্পায়াররা যখন দ্বিমত হন, আইনে বলে বর্তমান অবস্থাতেই—অর্থাৎ যা যেরকম আছে সেই অবস্থাতেই চলবে। সুতরাং, যদি আম্পায়ারদের একজনও মনে করেন খেলা চলতে পারে, অন্যজন কি মনে করলেন তাতে কিছু আসে যায় না। এ সত্ত্বেও এমন একটা দৃষ্টান্তও মনে করতে পারছি না যেখানে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 'পরামর্শ' ছাড়া কোনো রায় দিতে পেরেছেন।

বৃষ্টি থামলো। রোদের হাসি নিয়ে সোমবারটা আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। এবারও আমি তর্কের কেন্দ্রবিন্দু হলাম। ফিল্ডারদের একজন শর্ট লেগে একটা 'ঝাঁকি' বল ধরলো। বেডসার বল করছিলেন, আপন মনেই বলে উঠলেন, 'এটা তো আউট নয়, তাই না?' আম্পায়ার স্কট জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে, 'আপনি কি আবেদন করছেন?' বেডসার উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' স্কট শেষে বললেন, 'নট আউট।'

পরে বলেছিলেন এই নিয়ে কোনো আবেদন হবে তিনি ভাবতেও পারেননি।

তবু, কোনো কোনো মহলে গুঞ্জন উঠলো—আমার ভাগ্যি (!) ভালো-আউট দেওয়া হয়নি।

বারনেস আর আমি অনেকক্ষণ খেলেছিলাম। দুশো চৌত্রিশ করে ছেড়েছিলাম। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পঞ্চম উইকেটের রেকর্ডও হলো।

ব্যাট যে করতে পারবো এটা ভাবিনি কারণ শুক্রবার পায়ের পেশী জখম হয়ে শনিবার পর্যন্ত বসে ছিলাম। সঙ্গে জুটেছিলো গ্যাসট্রাইটিস। বিছানাতেই ছিলাম সমস্ত সময়টুকু। সোমবারেও অবস্থার উল্লেখযোগ্য

উন্নতি হয়নি। মাঠে নেমেছিলাম সারা পায়ে কাপড় জড়িয়ে, আর সারাটা খেলাই খেলেছি 'পেছনের পায়ে'। এগিয়ে কোনো বল খেলেছি বলে মনে পড়ে না।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ড আস্থা ফিরে পেলেও, পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই ছিলো না।

অস্ট্রেলিয়া আজ এক সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দল বলে চিহ্নিত। জিতেও অস্ট্রেলিয়া বাহাত্বরি নিতে পারলো না। সমালোচকদের বক্তব্য—ইংরেজরা আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে পারেনি বলেই হেরেছে।

এই প্রসঙ্গে গডফ্রে ইভান্সের কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। উইকেটরক্ষক হিসাবে সে প্রথম শ্রেণীর খেলায় তার জায়গা করে নিয়েছে—একটি 'বাই'ও দেয়নি সে।

অস্ট্রেলীয় নির্বাচকমণ্ডলীর দল পুনর্গঠনের সুযোগ এলো, সদ্ব্যবহারও করলেন তার। এঁদের একটা অসুবিধেও আছে এঁদের বিচারাসনে বসিয়ে দেওয়াতে তাঁদের মতামত প্রকাশ্যে জাহির করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

একটা কথা পরিষ্কার হলো তবু—আটচল্লিশের সফরকারী দলের শক্তিবৃদ্ধির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। লিণ্ডওয়াল সুস্থ হয়ে দলে এসেছেন—তৃতীয় টেস্টে খেলবেন। ডুল্যাণ্ড জায়গা নিলেন ট্রাইবের। 'লেগ-স্পিনে' ট্রাইব ভালোই খেলেছিলেন সিডনিতে, কিন্তু সার্থকতার মাপকাঠিতে অচল।

ত্নটো খেলা অস্ট্রেলিয়া জিতলো, তৃতীয়টা ইংল্যাণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা চালালো জেতবার, কারণ 'অ্যাসেসে'র তক্‌ত্‌ বজায় রাখতে হবে। আমাদের ধারণা ড্র করলেই বর্তমানের কাজ হবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড জয়ের দিকেই চললো দৃঢ় পদক্ষেপে।

আগন্তুকদের ভাগ্য কিন্তু তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অনুশীলনে ল্যাংরিজ আবার কুঁচকির পেশীতে চোট পেয়ে বসে গেলো। ভোসিরও একই অবস্থা হলো। এডরিচ বারনেসের একটা পূর্ণবেগের 'হুক' মার ঠেকাতে গিয়ে হাঁটুতে চোট খেলো। পরের দিন অবশ্য সে বল দেওয়া

শুরু করলো কি করে জানি না। শুধু শুরুই নয় প্রথম বলে একটা উইকেটও নিলো।

আমাদের ইনিংসও ভালো হলো না—অবস্থা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও মোটে তিনশো পঁয়ষট্টি উঠলো। আরো কম হতো, বাঁচালো ম্যাককুল। চুটিয়ে ব্যাট করে সেঞ্চুরী করলো সে। তার সঙ্গে প্রথমে ছিলো ট্যালন, পরে ভুল্যাণ্ড।

বেমক্কা ব্যাট করে ইংল্যাণ্ড প্রত্যুত্তরে করলো তিনশো একান্ন। এই খেলাতেই আম্পায়ারের রায় নিয়ে এক বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। মুশকিল হয় যখন দর্শকেরা আম্পায়ারের কাজ সম্পর্কে তাঁদের বিচক্ষণ (!) মতামত দিতে শুরু করেন। কেলেঙ্কারীটা শুরু করেন এক ইংরেজ সাংবাদিক। স্বদেশে এক তারবার্তায় জানিয়ে বসলেন—এডরিচ আর কম্পটন 'নট আউট' ছিলেন।

আমার মতে কিন্তু টেস্ট পর্যায়ে এই খেলার আম্পায়ারিংই পূর্ণ মর্যাদা-সম্পন্ন ছিলো, একটা ক্ষেত্রে ছাড়া—মেলবোর্নে এডরিচের বিরুদ্ধে এল. বি. ডব্লিউয়ের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক হয়েছিলো। কম্পটনকে যখন আউট দেওয়া হলো তখন আমি মিড-অনে, বোলারের উইকেটের ঠিক পেছনেই। কম্পটন বলের লক্ষ্য ঠিক করতে পারেননি, এবং নির্ভেজালভাবেই আউট হয়েছেন। কম্পটন সেটা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ চোখের পলকে ডান পাটা সরিয়ে দিয়েছিলেন 'লেগে'। এ যেন ঘোড়দৌড়ে শেষ সীমা ছাড়িয়ে দূরে গিয়ে ঘোড়ার থেমে যাওয়া।

কম্পটনের সঙ্গে ব্যাট করছিলেন ওয়াশব্রুক, তাঁরও মত—কম্পটন আউট। মেলবোর্নের আর একটা ঘটনাও হৈচৈ ফেলেছিলো—আমার বিরুদ্ধে একটা এল. বি. ডব্লিউ নাকচ। বলা হলো আমি ঠিক স্টাম্পের সামনেই ছিলাম। কথাটা সত্যি, কিন্তু সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।

আম্পায়ারের একটা ব্যাপার প্রায়ই চোখ এড়িয়ে যায়—তা হলো বলের উচ্চতা এবং গতি। এগুলো নিয়েই বিতর্কের অবতারণা হয় এবং সমালোচনাও সোচ্চার হয়।

হ্যামণ্ড আম্পায়ার পাল্টাবার জন্যে আবেদন করতে পারতেন টেস্টের

বাকি খেলাগুলোতে, কিন্তু করেননি। আগন্তুক দলের অধিনায়কদের এ অধিকার স্বীকৃত এবং অস্ট্রেলীয় বোর্ডের এ প্রতিবাদ নাকচ করার ক্ষমতা নেই। অবশ্যই যদি অনুভবনীয় সাক্ষ্য থাকে এর অনুকূলে।

আমি একটা কথা বলতে পারি—হ্যামণ্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অখুশী থাকতে পারেন কিন্তু প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারেননি বা দেননি। আম্পায়ার আর পাল্টানো হয়নি সারা টেস্টে। অন্ততঃ আধ ডজন সিদ্ধান্তে একমত হতে পারেননি সে মরসুমে সকলে। কিছু একদিকে রায় দিলেন, কিছু বিপক্ষে। আমি অবশ্য একটা ঘটনার কথাই জানি। তৃতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা মোটামুটি অনুকূলেই ছিলো, বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে—আর্থার মরিস ছ' ঘণ্টা ব্যাট চালিয়ে একশো পঞ্চান্ন করলো। তারপর ট্যালন আর লিণ্ডওয়াল জুটিতে আমাদের নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছে দিলো—সাতাশি মিনিটে একশো চুয়ান্ন তুলে। ট্যালন আর লিণ্ডওয়াল দুজনই নির্ভরযোগ্য ব্যাট : ট্যালনের স্কোয়ার কাট আর হুক। লিণ্ডওয়াল সোজা পেটানোর পক্ষপাতী ছিলেন। লিণ্ডওয়ালের তখন ছিয়ানব্বই চলছে, বল দিচ্ছেন বেডসার। চারিদিকে তাকিয়ে বুঝলাম চার মারার কোনো রাস্তা নেই। তাহলে? লিণ্ডওয়াল কিন্তু বোলারের ঘাড়ের পাশ দিয়েই চার হাঁকালেন, দুদিকের মাঠের খেলোয়াড়রা যেন পাথর! বল তখন বেড়া পার হয়ে গেছে।

এ ধরনের অদ্ভুত মারের খেলা দেখতে কে না চায়? এই জুটির খেলার পর অস্ট্রেলিয়ার জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলো। ওদিকে ওয়াশব্রুকের সেঞ্চুরী (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম) আর ইয়ার্ডলের খেলা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত অবস্থায় আনলো। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পঁয়ষট্টি বছরে প্রথম অমীমাংসিত খেলা! আমরা তো এতোদিন নিষ্পত্তিমূলক খেলাই খেলে এসেছি। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সালে এম. সি. সি.র সঙ্গে সময়ের ব্যাপারে একটা রফা হলো। ওরা এতোদিন তো অমীমাংসিত খেলাতেই গা-সওয়া হয়ে আছে—অস্ট্রেলীয়রা শেষ দেখতে অভ্যস্ত। এমন কি ছ'দিন খেলা দিয়েও। সফর সম্পর্কেও একটা নিরেট পরিকল্পনা থাকে, এবং খেলার সময় বাঁধা থাকলে একটা চমকপ্রদ শেষও দেখার সুযোগ হয়। দু দিকেরই

অবশ্য এ ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য আছে। এই খেলায় আমার স্কোর ছিলো যথাক্রমে উনআশি আর উনপঞ্চাশ। মেলবোর্ন ক্রিকেটের মাঠে আমার খেলার জীবনের এক ও অদ্বিতীয় টেস্ট খেলা, যেটাতে সেঞ্চুরী না করে আমাকে বসে যেতে হয়েছে। এ মাঠে আমার খেলার সার্থকতার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এক—বল পিচের ওপর যথেষ্ট উঁচুতে আসে, আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায় (কংক্রীটের পিচের ব্যাপারটা)। আটটা টেস্টে রান উঠলো এক হাজার ছুশো একাত্তর, গড় ১১৯·৩। মেলবোর্নে সেবার চার্লি ম্যাককার্টনির ব্যর্থতাও উল্লেখযোগ্য। সে মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাককার্টনির রানসংখ্যা হলো সাঁইত্রিশ, চুয়ান্ন, বারো আর উনত্রিশ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেছিলো সাত এবং পাঁচ। টেস্টের কথায় ফিরে গেলে গডফ্রে ইভান্সের কথা না বলে পারা যায় না—অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে যার হাত দিয়ে একটা 'বাই' হয়নি, আর তিনটে ধারাবাহিক টেস্টে একই ব্যাপার ঘটলো।

এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে ইংল্যাণ্ড কিছুটা নিরাশ হলো। রাবার হাতছাড়া হলেও শেষ ছুটো খেলা জিতে 'টাই' করতে পারতো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এবং সেইরকম প্রস্তুতিই থাকার কথা। খেলাটা কৌশলের হতে পারতো, মানে, ইংল্যাণ্ড ড্র না করে হারতে পারতো।

সিড বারনেস না থাকায় আমাদেরও অসুবিধে হয়েছিলো। বারনেস অসুস্থ হওয়ায় খেলতে পারেনি।

এবারও টসে জিতলো ইংল্যাণ্ড, এবং সমস্ত রকমের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলীয় দলের সমকক্ষ বলে দাবী করতে পারলো না। সারাটা খেলাই হলো প্রচণ্ড গরমের মধ্যে—একশো পাঁচ ডিগ্রীতে—অস্বাভাবিক আর্দ্রতা। এটা অবশ্য ব্রিসবেনেই বেশি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এডিলেডের এই গরমটা, মোটামুটি শুকনোই।

ইংরেজদের কাছে এটা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তিকর হয়েছিলো। উভয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ডকে ছুটো সেঞ্চুরী দিয়ে হাটন আর ওয়াশব্রুক অনেকটা এগিয়ে দিলো—অনেক রানের খেলা হতে পারতো, কিন্তু হয়নি।

আমাদের ডেনিস কম্পটন আর আর্থার মরিসও কম গেলো না—

ছুটো ইনিংসে ছুজনে সেঞ্চুরী মারলো। এই প্রথম অস্ট্রেলীয়রা নিজেদের মাটিতে এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলো। ছুজনেই দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট সংস্থা থেকে সুন্দর উপহার পেয়েছিলো, খেলার স্বীকৃতি হিসেবে। আর একটা অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখেছিলো লিণ্ডওয়াল—ওদের শেষ তিনটে উইকেট নিয়েছিলো চারটে বলে, সবগুলোই বোল্ড। এ খেলা রোমাঞ্চকর হয়নি, কিন্তু কিছু কিছু অসাধারণ মুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ প্রথম ইনিংসে কিথ মিলারের ব্যাটিংয়ের জবাব নেই। সোমবারে তো 'নট আউট' রইলোই সে, পরের দিন রাইটের একটা বল—'নো বল'ই পিটিয়ে ছক্কা করলো। বলটা দিনের পয়লা বল ছিলো।

আমার যতদুর মনে পড়ছে, এ ধরনের ব্যাপার টেস্ট ক্রিকেটে অভূতপূর্ব।

মিলারকে তার ইনিংসের শেষ দিকে ইয়ার্ডলে 'লেগে' আউট করলো, কিন্তু তাতে প্রথমোক্ত খেলোয়াড়ের খেলার জেল্লা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমাদের ছুপক্ষের প্রথম ইনিংসের রানের খুব একটা তফাত ছিলো না, এবং ইংল্যাণ্ডের এই ছিলো দ্রুত রান তোলার উৎকৃষ্ট সময়। আমাদের ফিল্ডিংয়ে রাখতে পারলে জয়ের ক্ষীণ আশা ছিলো।

এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে টস্যাককে তার প্রচণ্ড শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়া হলো। তার, এবং তার সহযোগী ইয়ান জনসনের সাহায্যে রানসংখ্যা আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হলো। টস্যাকের সেদিনকার বোলিং, ও'রিলীর মতে, জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট।

শেষদিনে সবকিছু নির্ভর করলো ইভান্স আর কম্পটন জুটির ওপর।

মাঠের 'গভীরে' দল সাজানোর জন্যে আমাকে কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই খেলায়। এই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে; ক্রিকেট খেলাটাই মুখ্যতঃ দক্ষতা আর কৌশলের। কে কি ভাবে খেলবে সেটা তারই ব্যাপার। আমার বহুদিনের সাধ একজন যোগ্য অধিনায়ককে প্রতিপক্ষরূপে পাওয়া। সে যদি মোটামুটি ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে, আমিও নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু, কখনোই কোনো অবস্থায় প্রতিপক্ষকে খুশী করতে আমি আমার দল বা দেশের বিশ্বাস নষ্ট করতে রাজী নই।

এই খেলার দিন বিশেষ করে মাঠ সাজালাম স্বাভাবিকভাবেই এবং খেলা হয়তো সেই রকমভাবেই এগোতো। কিন্তু তা হলো না। গরমিল শুরু হলো, কম্পটন বাউণ্ডারীতে একটা বল খেলে দৌড়লেন না, বললেন তাহলে মারটা নাকি নষ্ট হবে। কম্পটন ঠিকই করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের ব্যাপারটা বোঝা গেলো এবার। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ডিং পাল্টালাম—আমার ছেলেদের আরও দূরে সরিয়ে দিয়ে। কম্পটন এবার যদি ছোট রান না নেন তাহলে চারও পাবেন না। খেলা ঝুলে গেলো ঠিকই। কিন্তু তা নিশ্চয়ই মাঠের জন্যে নয়। ব্যাটসম্যানরা দুই বা তার বেশি রানের সুযোগ ছাড়া উইকেট ছেড়ে নড়লেন না।

ইভান্স পঁচানব্বই মিনিট ব্যাট করলেন শুধু 'শূন্য' থেকে সংখ্যায় আসার জন্যে। এ জন্যে আমার বা আমাদের বোলারদের করণীয় কিছুই ছিলো না। স্পষ্টতঃই মনে হলো ইংল্যাণ্ড রক্ষণমূলক খেলায় ড্রয়ের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। এতে আমাদের রাবার পাবার সুযোগও বাড়লো।

আমার প্রাথমিক কর্তব্য হলো সমস্ত খেলাগুলো মিলিয়ে জেতা, কোনো একটা খেলা নয়—তাই ওদের ব্যাপারটা চলতে দিলাম।

শেষদিনে লাঞ্চের সময়; ইভান্স আর কম্পটন তখনো ব্যাট করে চলেছেন—খানাপিনার পর একটা বল দেওয়ার পরই হ্যামণ্ড ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। অত্যন্ত ছেঁদো রায় বলে মনে হয়েছে এটা আমার কাছে—কারণ এতে দর্শকদের খেলা দেখা থেকে শুধু বঞ্চিত করাই হলো, দশ মিনিটের জন্যে। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে একশো পঁচানব্বই মিনিটে তিনশো চোদ্দ রান করতে হবে—কাজটা অসাধ্য নয়, কিন্তু ঝুঁকি আছে। তবু, ঝুঁকি নেওয়াও হয়তো যেতো, কিন্তু ইংল্যাণ্ড এক নতুন কায়দা ধরলো, বেডসারকে একটা নতুন বল দিয়ে 'লেগে' পাঁচটা লোক দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। এ ধরনের অস্বাভাবিক ফিল্ড সাজানোর ঘটনা বিরল, কিন্তু এই জিদের জন্যে রান তোলা কিছুটা শক্ত হলো।

আমাকে কোণঠাসা করা হলো আবার, কাগজে লেখা হলো ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলীয় ফৌজী দল বিশ মিনিটে একশো তেরো রান করতে চেষ্টা করে মাত্র একত্রিশ রান করেছিলো, কৃতিত্ব মার্চেন্টের সেই লেগ

থিওরী। এডিলেডের প্রথম ওভার থেকেই বেডসার এই কায়দা নিয়েছিলো।

তবু, ওই অবস্থাতেই মরিস একশো চব্বিশ মিনিটে সেঞ্চুরী করলো, আর আমার পঞ্চাশ রান দিনের সবচেয়ে কম সময়ে হয়েছিলো।

ওই মরসুমেই গোড়ার দিকে অবস্থার পরিবর্তন হলো। এডিলেডে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলা ছিলো ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে, সে খেলায় তাদের উনআশি রান দরকার ছিলো জেতার জন্যে। সময় ছিলো আধ ঘণ্টা।

আমরা ফিল্ডিংয়ে ব্যাটসম্যানদের খেলার পুরো সুযোগ দিয়েছিলাম। খেলা শেষের দু মিনিট থাকতে প্রয়োজনীয় রান তুলতে পেরেছিলো ওরা। ঢিলেঢালা খেলায় হয়তো এটা এড়ানো যেতো, কিন্তু অস্বাভাবিক কোনো পদ্ধতিতে আমার বিশ্বাস নেই।

অ্যাসেসের তো ফয়সালা হলো, কিন্তু সিডনির মাঠে দর্শকসংখ্যার কোনো হেরফের হলো না, আগ্রহ বজায় রইলো যথারীতি।

ইংল্যাণ্ড এবারও টসে জিতলো। খেলা জমেও উঠলো। শেষদিনে, রাইট আর বেডসারের দুর্ধর্ষ বোলিং চলছে, অস্ট্রেলিয়ার তখনো তিরিশ রান দরকার, হাতে মোট পাঁচটা উইকেট।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে তাদের বোলিংয়ের চরম উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলো।

রেলিগুওয়াল বাইশ ওভারে সাত উইকেটে তেষট্টি রান করেছিলো। সারাটা খেলা সে হিংস্র পদ্ধতিতে খেলেছে। যে ছেলে কোনো খেলায় পুরোপুরি শারীরিক সুস্থতা দাবী করতে পারে না, তার কাছে এটা অভাবনীয় নিশ্চয়ই।

শুধু হাটন আর এডরিচ টিঁকে ছিলেন খানিকক্ষণ। ওই একটা খেলাতেই হাটন সেঞ্চুরী মারতে পেরেছিলেন, গলার কষ্ট নিয়ে খেলেও। আর কোনো খেলায় অংশ নিতে পারেননি তিনি।

শুক্রবারটা মোটামুটি ভালো থাকলেও, সারাটা শনিবার বৃষ্টি হলো। রবিবার মাঠ খেলার উপযোগী হলো, কিন্তু রোলার চালানোয় পিচ অসমান রয়ে গেলো।

রাইটের বোলিং ভোলবার নয়, আমাদের সাতটা উইকেট ফেলে দিলো, ইংল্যাণ্ড তার জন্মেই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে যেতে পারলো।

শেষদিনের খেলাটা নাটকীয়ভাবে শেষ হলো। আমাদের প্রথম জুটি তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসে গেলো। আমার যখন সবে দুটো রান হয়েছে, রাইট এডরিচের একটা বল ফেলে দিলো। ধরলে হয়তো সমস্ত খেলার মোড়ই ঘুরে যেতো।

শেষ ঘণ্টায় মিলার আর ম্যাক্‌কুল যখন পিচে, বেডসারের তিনটে পুরো লেংথের বল: শেষটা 'লেগে'র দিক থেকে মিলারের ব্যাট হয়ে স্টাম্প ছুঁলো প্রায়।

বুঝলাম অবস্থাটা, মিলারকে খবর পাঠালাম—'পিটিয়ে খেলো'। মুহূর্তের মধ্যে খেলার প্রকৃতি বদলে গেলো। মিলার মারলো—মিড-অফে চার, আবার বোলারের মাথার ওপর দিয়ে চার। আমরা জিতে গেলাম।

এরকম উত্তেজনাকর খেলা এই প্রথম—যত সহজে হার হতো, ততো সহজেই জেতা গেলো।

অস্ট্রেলিয়ার খেলায় সকলেই সন্তুষ্ট, কারণ শুধু প্রবীণেরাই ভালো করেননি—নবীনেরা আশাতীত ফল দেখিয়েছিলো।

এই প্রথম, জীবনে একটা আন্তর্জাতিক মানের দল পরিচালনা করলাম, যার বোলাররা সর্বাবস্থায় খেলতে অভ্যস্ত বলে প্রমাণ করলেন।

খেলাগুলোর সম্বন্ধে ওয়ারউইক আর্মস্ট্রং লিখলেন, "অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের খুবই দুর্বল মনে হয়েছে, আটচল্লিশ সালের টেস্টে ভাল ফল পেতে হলে অস্ট্রেলিয়াকে নতুন বোলারের সন্ধান করতে হবে।" আমরা মুচকি হেসেছি খবর পড়ে।

ওই ভদ্রলোকই শুধু ভুল করেননি। কারণ আটচল্লিশের অস্ট্রেলীয় দল সম্ভবতঃ সবচেয়ে শক্তিশালী বলে চিহ্নিত হয়েছিলো। ইংল্যাণ্ডের প্রধান অন্তরায় ছিলো তাদের খেলা শুরু করার ফাস্ট বোলারের অভাব। বেডসার একদিকের কাজ ভালোই চালিয়েছিলো। অন্য কোণে এডরিচ অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু মানানুযায়ী খেলতে পারেনি।

আমার এখনো মনে হয় পোলার্ডকে খেলালে ইংল্যাণ্ডের লাভই হতো।

প্রতিবারই সে ভালো বল করেছে এবং টেস্ট একাদশে তার নাম না থাকায় আমি অন্তত: ব্যক্তিগতভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি। ব্রিসবেনের টেস্টে অ্যালেক বেডসার প্রচুর কাজ করেছিলো, দুর্দান্ত গরমে তার যে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা গিয়েছিলো তা সেরেছে কিনা কে জানে। পরের খেলাগুলোয় সে ভাল কৃতিত্বই দেখিয়েছে, মাঝের দু-একটা খেলা ছাড়া।

এডিলেড টেস্টে যে বলে সে আমাকে আউট করেছে, তার চেয়ে ভাল কোনো বলে আমি আউট হইনি বলে আমার ধারণা। পিচের তিন ভাগ এসে বলটা অফ স্টাম্পের দিকে উঠলো। তারপর মাটিতে পড়ে লেগ স্টাম্পে শেষে, সোজা এসে পড়লো মাঝের স্টাম্পে।

টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান মিললো। পর পর টেস্ট চলতে থাকলো, পরের বছরের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে। অস্ট্রেলীয় নিয়ন্ত্রণ বোর্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পুনরনুষ্ঠানের চেষ্টা করলেও ইংল্যাণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো, ব্যাপারটা অবশ্য অবোধ্য নয়। যুদ্ধের দরুন এতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো ইংল্যাণ্ড, যে পর্যাপ্ত সময় না পেলে তার পক্ষে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। সময় আরও পিছোলে সুফল পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ।

সাড়ে আট লক্ষ লোক বসে খেলাগুলো দেখলো, জনপ্রিয়তার বিরাট পুরস্কারই বলা যায়। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তারও প্রমাণ মিললো। মানুষগুলো সব খেলা দেখবার জন্যে 'ক্ষুধার্ত'।

নৈতিক পুনরুজ্জীবনেও বিপুলভাবে সহায়তা করেছে এসব খেলা। ইংল্যাণ্ডেই বিশেষ করে।

পঞ্চম টেস্টের শেষে দুটি মূল্যবান বাণী—চিঠিই বলবো, এলো। প্রথমটার লেখক উপপ্রধান মন্ত্রী ডঃ ইভাট, লিখেছেন: "আপনার এবং আপনার দলের অসাধারণ খেলার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার নিজস্ব কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে আর একটা চিরস্থায়ী রেকর্ড।"

দ্বিতীয়টা বিরোধী দলের নেতা রাইট অনারেবল ডঃ আর. জি. মেনজিসের কাছ থেকে: "আপনাকে কিছু না জানিয়ে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের মরসুমটা

চলে যেতে দেওয়া যায় না। আপনার বিজয়সূচক খেলায় আমি কতবড় গুণগ্রাহী বোঝাতে পারবো না।

একজন উৎসাহী দর্শক হিসেবে আমি সব সময়েই আপনার দক্ষতা লক্ষ্য করে এসেছি। আমাদের অনেকেরই ধারণা, আপনার চেয়ে যোগ্যতর অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়া পায়নি।

সমালোচনার লোক অবশ্যই আছে আপনারও, এবং মনে হয় তাদেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিগত টেস্টের খেলাগুলোয় নির্ভেজাল গর্ব আপনি করতে পারেন।"

টেস্ট খেলার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে ডঃ ইভাটের অবদান অনস্বীকার্য। টেস্টের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলাম আমি আগামী মরসুমে ভারতের বিরুদ্ধে খেলছি। ইংরেজদের বিপক্ষে খেলাগুলোতে আমি আশাতীত সাফল্য পেয়েছি বলেই ধারণা আমার; যদিও সময়ে সময়ে প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে।

দর্শক এবং সমালোচকদের চেয়ে একটা কথা আমি বেশী জানতাম, সেটা হচ্ছে—ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের খেলা আর বিগত দিনের খেলার মধ্যে পর্বত-প্রমাণ ফারাক।

আমার কাছে কিন্তু এটা নৈরাশ্যের কিছু নয়, কারণ, আমি মরসুমটা যে শেষ করতে পেরেছি, এটাই যথেষ্ট।

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালের ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলার ব্যাপারটা খুব স্বস্তিকর না মনে হলেও, আমি আর একটা মরসুম খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াতে এই প্রথম একটা ভারতীয় দল খেলতে আসছে।

তবু, ইংল্যাণ্ডের চূড়ান্ত সফর সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ থেকে গেলাম।

ভারতীয়রা

সাতচল্লিশ-আটচল্লিশের মরসুমে নামার আগে দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট সংস্থার একটা সম্মানপত্র পেলাম, আমার কাছে যার গুরুত্ব অনেক। সাতচল্লিশ সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর লেখা হয়েছিলো চিঠিটা:

প্রিয় মিঃ ব্র্যাডম্যান,

অদ্য অনুষ্ঠিত সভার ৭৬তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে ক্রিকেটের অগ্রগতিতে আপনার সেবার স্বীকৃতিতে সভা সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে আজীবন সদস্য মনোনীত করছে।

সদস্যপদের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি স্বর্ণপদকও সঙ্গে পাঠানো হলো।

সভা আপনার অটুট স্বাস্থ্য কামনা করছে।

বিনীত

স্বাঃ এইচ. ব্রিনম্যান

সভাপতি

স্বাঃ ডব্লিউ. এইচ. জিনস.

সম্পাদক

খেলার জগৎ থেকে অবসর নেয়নি এমন খেলোয়াড়ের কাছে এ সম্মান দুর্লভ। তাছাড়া ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে এটাও আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে।

আগন্তুক দলের সঙ্গে স্বদেশে তাঁদের খেলায় ভারতীয়রা যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন, ইংল্যাণ্ড সফরেও অনুরূপ দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, কিন্তু সূর্যালোকের অভাব এবং আবহাওয়ার অনিশ্চিতি ওঁদের অনুকূলে যাচ্ছে মনে হলো না।

বিজয় মার্চেণ্ট বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন, অন্যেরাও খুব পেছনে নন তাঁর।

অস্ট্রেলিয়া সাগ্রহে তাদের উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশীদের সফরের দিন গুনছিলো। প্রথম দুঃসংবাদটাই হলো—মার্চেণ্ট আসছেন না, আহত হওয়ার দরুণ। আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়ের আসাও অনিশ্চিত হলো। কিন্তু আমার মনে হয় টেস্ট খেলায় ভারতের অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যের কারণ মার্চেণ্টের অনুপস্থিতি।

অস্ট্রেলিয়ায় খেলার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এবং ভারতীয় বোর্ডের মধ্যে পত্রবিনিময়ও হয়েছে। ঢাকা পিচে খেলাটা ভারতীয়দের কাছে সুবিধাজনক হবে এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত হলো না।

কিন্তু, আশ্চর্যের ব্যাপার, ভারতীয়রা খোলা পিচেই খেলার প্রস্তাব দিলেন। এম. সি. সি.ও এ ধরনের পিচে খেলার পক্ষপাতী।

ভাবলাম, ভারতীয় বন্ধুরা একটা বড় ভুল করছেন, কারণ আমাদের দেশে ভিজে মাঠ খুব বেশি চোখে পড়ে না, তবুও, ওঁরা স্বদেশে যতটুকু দেখেন তার বেশিই দেখি আমরা এখানে।

ইংরেজরা অবশ্য মাঠের এই অবস্থায় অনেক বেশি খেলতে অভ্যস্ত, কিন্তু ভারতীয়দের তুলনায় আমরা এ মাঠে বেশি সুবিধে করবো মনে হলো। শুকনো মাঠে তো আরো ভাল খেলা হবে আমাদের, ভাবলাম। আমাদের সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের কথা চিন্তা করে ভিজে মাঠে ভারতীয় দলের অবস্থাটা অনুমান করলাম। এই জন্যেই আমি তাঁদের ঢাকা পিচে খেলার পক্ষে ওকালতি করলাম, ওঁদের অধিনায়ক অমরনাথের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনাও করলাম, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। মনে হলো অমরনাথ আমার প্রস্তাবের সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন, কিন্তু আবহাওয়া-দেবীর ওপর বেশি শ্রদ্ধাশীল থাকায় ওইভাবেই মাঠে নামতে চাইলেন।

ভারতীয়রা ভিজে মাঠে শোচনীয় ফল করলেন, স্বাভাবিকভাবেই হয়তো ফল খারাপ হতো—কিন্তু শেষটা যেন অত্যন্ত দ্রুত হলো।

আর্থিক দিকটাও অবহেলার ব্যাপার নয়। আমি একথা বলতে চাই না—যে ক্রিকেট খেলা অর্থনির্ভরও কিন্তু এ কথা মনে হলো ভারতীয় সফরে লাভের কিছু জমবে না। খেলার সময় কমানো আর একতরফা খেলায় একরকম প্রাপ্তি হবার কথা নয়।

ভারতীয় দলের পরিচালনে ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব, পিটার গুপ্ত—যিনি দল-পরিচালনের ক্ষেত্রে রেকর্ড সৃষ্টিকারী। পিটার কিন্তু তাঁর আগ্রহ ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, হকিও ভালবাসতেন। তাঁকে ছাড়া ভারতীয় কোনো হকি দলও কল্পনা করা যায় না, তিনি আছেনই সঙ্গে।

পিটার সাংবাদিকতা করতেন, এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দিয়েই তিনি অস্ট্রেলীয় পত্রিকা মহলে পরিচিত হয়ে গেলেন, পত্রিকাওলারাও তাঁদের সমধর্মী মনে করে তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন।

মার্চেন্টের পর অধিনায়কত্ব নিয়েছিলেন অমরনাথ। এই অপূ
খেলোয়াড় উনিশশো ছত্রিশের ইংল্যাণ্ড-সফরকারী ভারতীয় দলে ছিলেন
সে সময়ে অধিনায়কত্ব ছিলো ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের (ভি. জি.)
সফরে অমরনাথ সর্বাধিক রান করেছিলেন, রানসংখ্যা ছশো তেরো
বত্রিশটা উইকেটও নিয়েছিলেন তিনি, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মতভেদ দেখ
দেওয়ায় তাঁকে ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। এটাকে নিয়মানুবর্তিতা
নজির বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো। কড়া শাস্তিই বলা যায়, যেহেতু
সেই মুহূর্তে কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

সারাটা সফরে আমি পিটার গুপ্ত ও অমরনাথের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছি
তাঁরা সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেছেন খেলা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চালানো
ব্যাপারে।

আমাদেরও আপ্রাণ খেলতে হয়েছে, যদিও ভারতীয় দল আমাদে
তুলনায় দুর্বল মনে হয়েছে। খেলা জনপ্রিয় করতে আমাদের নান
কৌশলেরও আশ্রয় নিতে হয়েছে।

অমরনাথ এতো সুন্দর মানুষ, অথচ কেন যে তাঁর বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থ
নেওয়া হলো আজও আমার কাছে তা রহস্য।

'লালাসাহেব' নামেই উনি পরিচিত। কোনো ব্যাপারেই রেখে
ঢেকে কথা বলতেন না। যদিও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিনি বেশ বিন
আর কৌশলে সেটা ব্যক্ত করতেন।

এডিলেডেই তাঁদের প্রথম খেলা দেখি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে
এ খেলায় আমি সেঞ্চুরী করেছিলাম এবং এই মানসিকতাও হয়েছিলে
আমার, যে ওঁদের বিরুদ্ধে অনেক রান করতে পারবো। দুটো কারণে এট
হয়েছিলো, প্রথমতঃ—ওদের বোলারদের খেলা মোটামুটি দৃঢ়তাপূ
ও অভ্রান্ত হলেও, ফাস্ট বোলার ছিলো না, মানে প্রথম শ্রেণীর 'স্পিন
বোলার কেউ না। দ্বিতীয়তঃ—আশ্চর্য হলাম ওঁদের দুর্বল ফিল্ডিং দেখে।

সিডনির মাঠে ভারতের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় একাদশের খেলা শুরু হলো
এ খেলার গুরুত্ব অনেক আমার কাছে।

তখন পর্যন্ত আমার রেকর্ড নিরানব্বইটা সেঞ্চুরী। আর একটা হলো

আর এক রেকর্ড। রেকর্ড সৃষ্টির দিক থেকে সিডনির মাঠ আমার প্রতি সব সময়েই সহানুভূতির হাত প্রসারিত করেছে। মাঠও ভালো। ভারতীয়রা প্রথমে ব্যাট করে তিনশো ছাব্বিশে তাঁদের ইনিংস শেষ করলেন। তখনো লাঞ্চের কিছু সময় বাকি। আমাদের একটা উইকেট গোড়াতেই পড়ে যাওয়ায় আমাকে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত সাবধানে খেলতে হয়েছে। লাঞ্চের সময় আমার মাত্র এগারো রান হয়েছে। কাগজওলারা আমার শততম সেঞ্চুরী সম্পর্কে আশাও প্রকাশ করেছে। লাঞ্চের পরে যখন খেলা শুরু হলো মাঠ লোকে লোকারণ্য।

কিথ মিলার আর আমি খেলছি, চা পানের সময় পর্যন্ত খেলাটা উত্তেজনার চূড়োয় একাধারে, অন্যদিকে আমরা গলদঘর্ম। দুজনই শরীরের দিক থেকে সুস্থই—ভারতীয়রাও খুব আগ্রহ নিয়ে খেলছেন।

আস্তে আস্তে রান উঠলো আমার, নব্বই হলো। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। 'অতিরিক্ত' রানও উঠতে লাগলো। স্কোয়ার লেগে একটা বল মেরে একটা রান নিলাম, তারপর ঝুঁকি নিলাম দ্বিতীয়টার। দর্শকেরা প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়।

রান পৌঁছলো নিরানব্বইতে। অমরনাথ কিষেণচাঁদকে ডাকলেন বাউণ্ডারী থেকে। কিষেণ এর আগে বল দেননি এবং আমার কোনো ধারণা ছিলো না তাঁর বোলিং সম্বন্ধে। মিড-অনে একক রানের সুযোগ নিতে আমি তাঁর বল সতর্কতার সঙ্গে খেললাম, কেউ কাউকে ঠকাতে চাইছি না।

আমার ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত মুহূর্তটি এসেছে। দর্শকেরাও তার ভাগীদার—থেকে থেকে তাঁদের উষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন কানে আসছে। মিলারের খেলার জবাব নেই—তবু, আমার মনে হয়েছে তিনিও ত্যাগীর ভূমিকা নিয়েছেন। মিলারই প্রথম আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। চায়ের আগে সেই শেষ ওভার। দর্শকেরা মানসিক চাপ থেকে বিশ্রাম পেলেন। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস নিলাম।

চা-পর্বের পর দর্শকদের পুরস্কৃত করবার বাসনা হলো, অবশ্যই সুযোগ-সাপেক্ষে। ভারতীয় দল নতুন বলে খেলা আরম্ভ করলেন, কিন্তু আমি

॥ আমাব সারা জীবনের প্রেরণা আমার স্ত্রী ॥
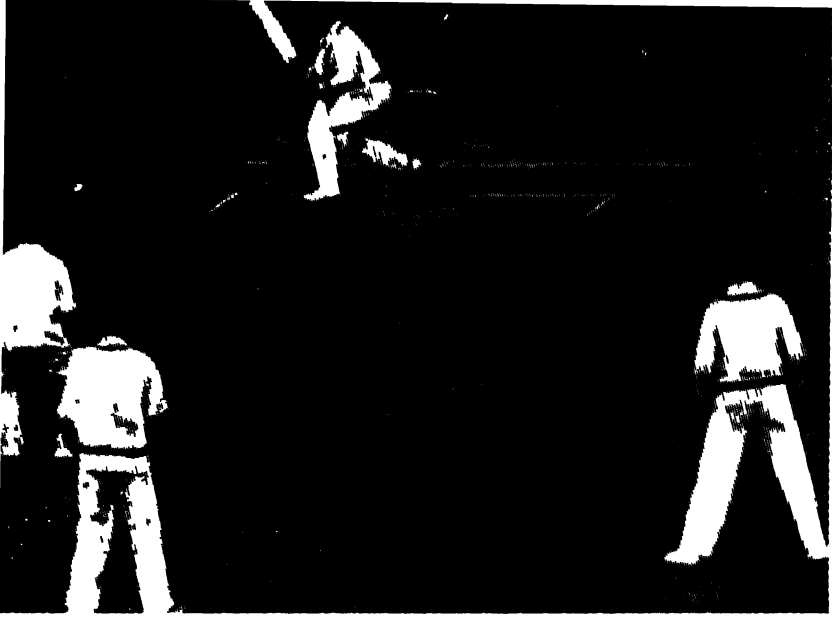
॥ ব্র্যাডম্যানের স্কোয়ার লেগে শর্ট বল মারার এক দুর্লভ চিত্র ॥
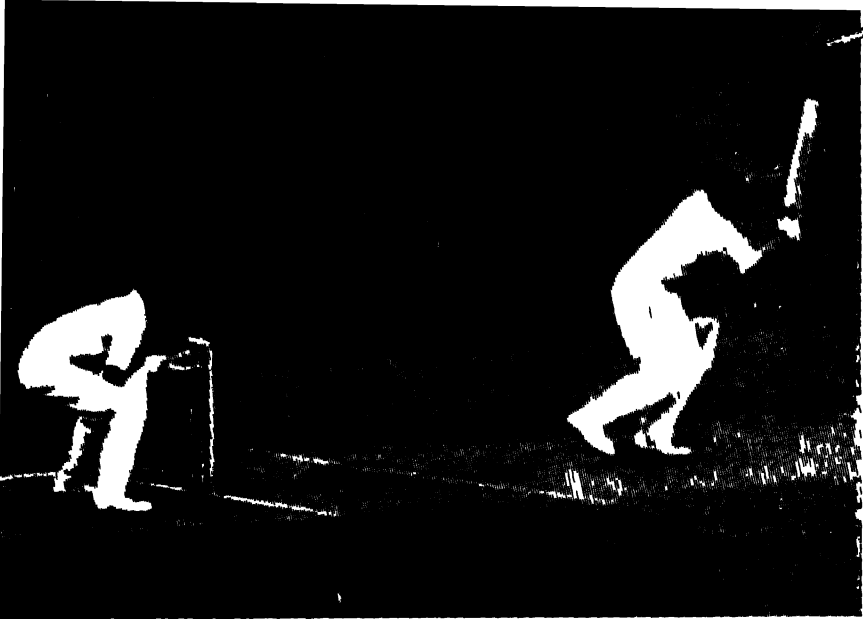
॥ ব্র্যাডম্যান : স্লো বলের বিরুদ্ধে খেলছেন ॥

বিল্ জন্‌স্টন : নেটে

॥ ব্র্যাডম্যানের শততম সেঞ্চুবী : সিডনি ক্রিকেট মাঠের স্কোববোর্ডেব সৌন্দর্য লক্ষণীয় ॥
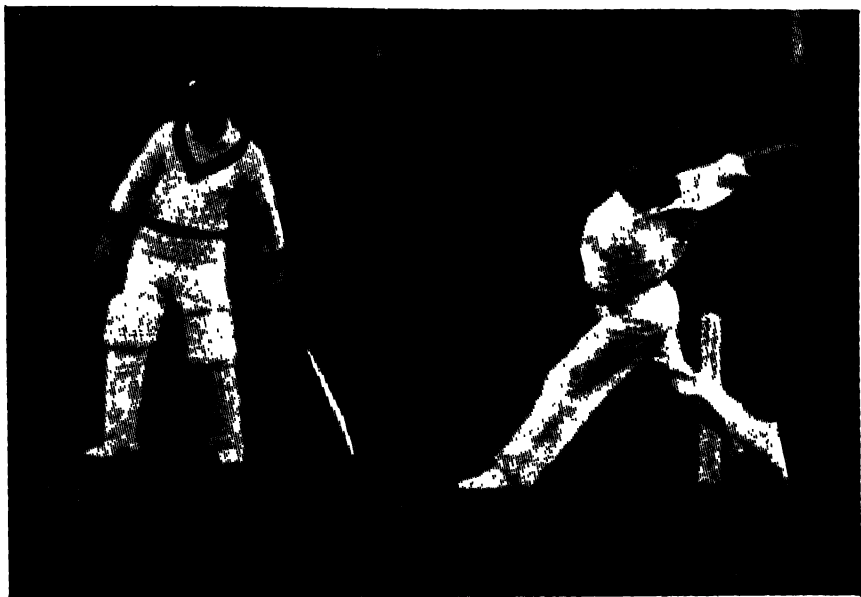
॥ রে লিণ্ডওয়ালের বল করার এক অনবদ্য ভঙ্গী ॥

লর্ডস ১৯৪৮ : ইংল্যাণ্ডের রাণী ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে
করমর্দন করছেন : পাশে সম্রাট দাঁড়িয়ে ॥
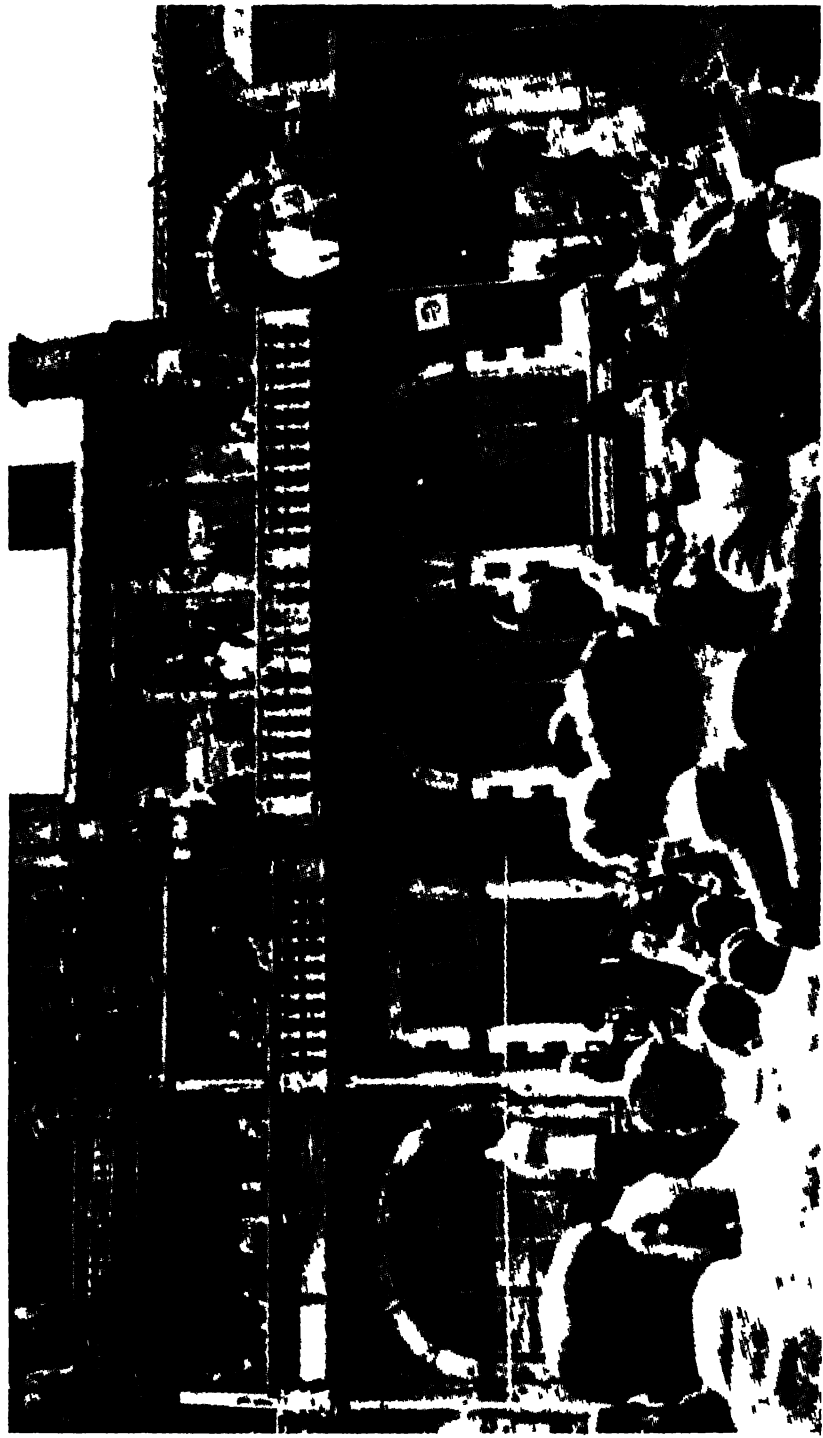
বিদায় ক্রিকেট ! ওভাল-১৯৪৮ : ব্র্যাডম্যান ক্রিকেটকে বিদায় জানালে তাঁর সম্মানার্থে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন ইয়ার্ডলে ॥

ডন ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক) ও লিণ্ডসে হ্যাসেট (সহ-অধিনায়ক) ঃ ১৯৪৮ এর অপরাজিত অস্ট্রেলীয় দল ॥

১৯৪৮-এ ব্র্যাডম্যানকে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটপ্রেমিরা
ওয়ারউইক ফুলদানীটি উপহার দিয়েছিলেন ॥

এডিলেড ১৯৪৮ : ব্র্যাডম্যানকে স্বাগত জানাতে এসেছেন 'ডন' পরিবার ॥

১৯৪৮ ঃ এম. সি. সি-র সভাপতি আর্ল অফ গাওরির কাছে
বিদায় নিচ্ছেন ব্র্যাডম্যান ॥
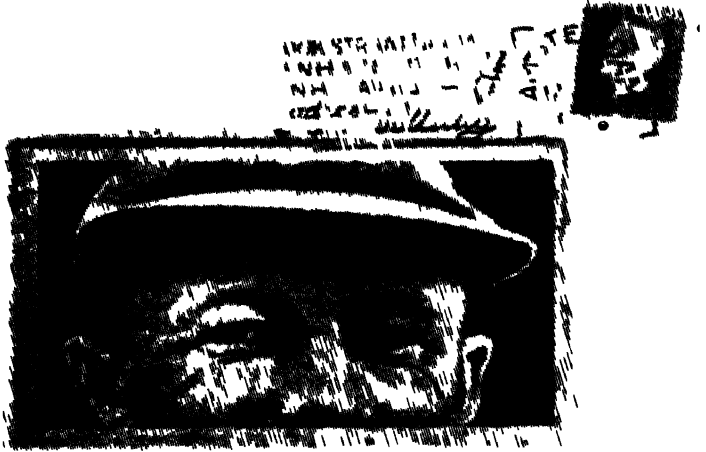
অ্যামস্টারডাম থেকে ইংল্যাণ্ডে ব্র্যাডম্যানের উদ্দেশ্যে
পাঠানো ঠিকানাহীন একটি খাম ॥

বরাবর যে কায়দায় খেলতে চেয়েছি সেই রাস্তায় গেলাম। ভাগ্য আমার পক্ষে, আউট হবার আগে আরও একাত্তর যোগ হলো। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রানগুলো উঠেছিলো। ইনিংসের এই বিশেষ পর্যায়টি আমার ক্রিকেট-জীবনে স্মরণীয়।

আউট হয়ে আবার মুহূর্তে আমার মন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো,—একদিকে দর্শকদের আনন্দদানের প্রশ্ন, অন্যদিকে সাধারণ একটা খেলায় ভারতীয় আক্রমণের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে চালানো।

হঠাৎ রাস্তা পেয়ে গেলাম। পায়ের পেশীতে চোট পড়লো—মুহূর্তের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলাম।

একশোটা সেঞ্চুরী করবো এ মানসিকতা কেন হয়েছিলো আমার বলতে পারবো না—এটা একটা যুগান্তকারী ব্যাপার মনে হয়েছে শুধু। অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম বলেই বোধ হয়। বলতে বাধা নেই ইংরেজদের মধ্যে জনা দশেক এ কৃতিত্বের ভাগীদার হয়ে গেছেন তখনই।

দুশো পঁচানব্বইটা ইনিংসে আমার একশোটা সেঞ্চুরী হয়েছে। গড়ের দিক থেকে এটাই সর্বোচ্চ বলে স্বীকৃত।

সেঞ্চুরী তালিকার চূড়ামণি হলেন জ্যাক হবস। একশো সাতানব্বইটি সেঞ্চুরী হয়ে গেছে তখন তাঁর—এজন্যে অবশ্য এক হাজার তিনশো পনেরো বার ব্যাট করতে হয়েছে তাঁকে। বাকি তিনটে করে দুশো সেঞ্চুরীর কৃতিত্ব অর্জন করার জন্যে হবস তখন ব্যাকুল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি, প্রচণ্ড পরিশ্রম সত্ত্বেও ঐ সংখ্যায় পৌছনোর অব্যবহিত আগেই তাঁকে অবসর নিতে হয়েছে।

এই কৃতিত্বকে চিহ্নিত করতে নিউ সাউথ ওয়েলস ও দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট সংস্থা এবং সিডনি ক্রিকেট মাঠের অছি পরিষদ আমাকে সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রিসবেনেই আমাদের দু' দলের প্রকৃত শক্তি যাচাইয়ের মুহূর্ত এলো। ভারতীয়দের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলো খেলায়।

টসে জিতে আমরা প্রথমদিনের শেষে দুশো তিয়াত্তর করলাম, তিন

উইকেট হারিয়ে। আমি তার মধ্যে করলাম একশো ষাট, আউট না হয়ে। এরকম শারীরিক সুস্থতা আমার বহুদিন ছিলো না। প্রথম দিনের শেষে বৃষ্টি নামলো—এবং ভারতীয় দলের সর্বনাশও।

উইকেট পরীক্ষা করা হলো যথারীতি, আমি খেলতে রাজী হলেও অমরনাথ হলেন না। দর্শকেরা ভাবলেন আমি অকারণে খেলা তুলে নিচ্ছি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুরু হলো। আম্পায়াররাও বাদ গেলেন না। এক একটা সময় আসে মানুষের জীবনে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের অপ্রিয়তার কারণ হয়। আমার আশঙ্কাই সত্যি হলো, ভারতীয় দল মাত্র আটান্ন রানে বসে গেলো। টস্যাক অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখিয়েছে এই খেলায়, প্রথম ইনিংসে পাঁচ রানে দুটো উইকেট নিয়েছেন, দ্বিতীয়বারে উনত্রিশ রানে ছটা উইকেট।

মাত্র এক বছর আগে ভিজে উইকেটে বল করার হাতেখড়ি টস্যাকের। রোডস বা ভেরিটির কাছ থেকেও এর চেয়ে ভালো ফল আশা করা যায়নি। ইংল্যাণ্ড সফরে তার জায়গা পাকা হয়ে গেলো।

খেলার শেষে এক বিপত্তি হলো, পা পিছলে পড়ে টস্যাক হাঁটুতে চোট পেলো। মাঠ ছাড়তে হলো তাকে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আর তার খেলার সুযোগ হয়নি, কারণ হাঁটুতে বড়রকমের অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিলো। আশা করেছিলাম, দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত সুবিধে করতে পারবে। অমরনাথ টসে জিতলেন, কিন্তু নিরাশ হতে হলো এবারও। মিলার আর লিণ্ডওয়ালের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি ওঁরা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে গেলো। খেলা থেমে গিয়ে আবার শুরু হলো, হাজারে একটা বল না খেলায় আউট হয়ে গেলেন সেটাতেই। অমরনাথও গেলেন প্রায় একই কারণে। রান হলো সর্বমোট একশো অষ্টআশি।

অস্ট্রেলীয় ইনিংসের শুরুতে চাঞ্চল্য উঠলো যখন ব্রাউন রান-আউট হলেন মাঁকড়ের কাছে। মজা করেছিলেন মাঁকড়, বল দেওয়ার ভঙ্গি করে হাতে বল রাখলেন—তারপর ব্রাউন ক্রিজ থেকে সরে যাবামাত্র সোজা উইকেটে পড়লো বল। কুইনসল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও এ রকম একটা

ব্যাপার ঘটেছিলো—এবং মাঁকড়ের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে বিতর্কও হয়েছে।

আমি একমত হইনি। ক্রিকেটের আইনে আছে যে ব্যাটসম্যান, বল না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর জায়গা ছাড়বেন না, যদি তাই হয়, তাহলে বোলারকে রান আউট করার সুযোগ দেওয়া হয় কি করে? অবশ্য খুব কমসংখ্যক বোলারই এ ধরনের কায়দা করেন, অনেকের পক্ষে সম্ভবও নয়। কল্পনা করুন লিণ্ডওয়ালের মতো বোলার বল দেওয়ার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেলো! অসম্ভব—স্লো বোলারদের পক্ষেই এটা শুধু সম্ভব।

মাঁকড় কিন্তু আদর্শ খেলোয়াড়। ব্রাউনকে তিনি সাবধানও করেছেন এ ব্যাপারে। এটা আমাদের কাছে কিছু বিসদৃশ মনে হয়নি। আমার অভ্যেস হচ্ছে—ব্যাট ক্রিজেই রাখি যতক্ষণ না বল শূন্যে উঠছে। এতে রান আউট হওয়া প্রায় অসম্ভবই মনে হয়, আমার খেলোয়াড় বন্ধুদেরও এ উপদেশ নিতে বলি।

বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তারই মধ্যে আমাদের মুখোমুখি হতে হলো ভারতীয় বোলারদের। একশো সাত রানে আমরা সকলে আউট হয়ে গেলাম। হ্যামেন্সের সর্বোচ্চ রান হলো—পঁচিশ।

ভারত তাদের সুবিধের জন্যেই বোধ হয় আমাদের ইনিংস এতো তাড়াতাড়ি শেষ করলো। কারণ তারাও সাত উইকেট হারালো একষট্টি রানে। অতি কম সময়েই তাদের এই অবস্থা হলো।

বৃষ্টিতে অবশ্য খেলাই বাতিল হয়ে গেলো। তিরিশ ঘণ্টার খেলা শেষ হলো দশ ঘণ্টারও কম সময়ে। তিনটে পুরো দিন নষ্ট হলো। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা।

তৃতীয় টেস্টে খানিক উত্তেজনা দেখা গেলেও, ভারতের অবস্থার অবনতিই হলো।

আমি আবার টসে জিতলাম, এবং রানসংখ্যা তিনশো চুরানব্বইতে শেষ হলো। ভারত করলো ন' উইকেটে আমাদের চেয়ে একশো তিন কম রান, এমন সময়ে আবার বৃষ্টি শুরু হলো।

উনিশশো ছত্রিশে গাবি অ্যালেনের দলের সঙ্গে খেলার কথা মনে

পড়লো, তাতেও আমি এমন লোক ব্যাট করতে পাঠিয়েছি যারা পিচের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত খেলা ধরে রাখতে পারতো। এবারও কাজ হলো সে কায়দায়।

আমাদের চার উইকেটে বত্রিশ চলছে যখন, আমি আর আর্থার মরিস নামলাম। দুজনেই সেঞ্চুরী করেছিলাম।

ভারত আবার কাদায় পড়লো—মোট রান হলো একশো পঁচিশ। দুটো ইনিংসে দুটো সেঞ্চুরী করে স্বল্প যে কজন খেলোয়াড় এ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আমি তারই একজন হয়ে গেলাম। আমার পুরণো ফর্ম ফিরে পেয়েছিলাম, সত্তর মিনিটে সাতাত্তর রান করেছিলাম ওই খেলায়।

বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিতেই খেলা ছেড়ে দিলাম ভারতকে, ব্যাট দিয়ে।

এ নিয়েও কথা উঠলো—অনেকে বললেন খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো, তাতে অন্ততঃ আসন্ন ইংল্যাণ্ড সফরের অনুশীলন তো হতো। কিন্তু অধিনায়কের কাজ তো দলকে জেতানো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো নয়। অন্য যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই নেতার পক্ষে অস্বস্তিকর।

অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যাণ্ডের ভিজে মাঠের ফারাক সম্বন্ধে দেশের কজন মানুষ ওয়াকিবহাল জানি না; কিন্তু যারা জানেন তারা অস্ট্রেলিয়ার 'আঠালো' মাঠে ব্যাট করা কতো কষ্টকর তা স্বীকার করবেন।

ইংল্যাণ্ডে কিন্তু এর উল্টো। ওদের মাঠ ভিজে থাকলেও তাতে ব্যাটিংয়ের কারিগরী দেখানো যায়। বল অপেক্ষাকৃত ধীরগতি, এবং লাফায়ও কম।

ভিজে পিচে রান তোলার একটা গোপন কথা হচ্ছে প্রথম কয়েকটা বল কোনোরকমে ঠেকা দেওয়া, কিন্তু আমাদের মাঠে বলের এমন সব উদ্ভট কার্যকলাপ দেখা যায়, যে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগেই আউট হয়ে যায় খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়াতে এ রকম মাঠের সংখ্যা বেশি থাকলে ব্যাটসম্যানদের ভিজে পিচে খেলার অভিজ্ঞতাও বাড়তো। কিন্তু তা না হওয়ায়, স্বভাবতঃই যতক্ষণ খেলোয়াড় ক্রিজে থাকে, দ্রুত রান তোলার দিকেই থাকে তার দৃষ্টি।

এ ব্যাপারে কিন্তু ইংরেজদের কোনো নৈরাশ্যবোধ নেই। তারা তাদের মতো খেলে, অবশ্য ওদের ওখানে ভিজে পিচেরই সংখ্যাধিক্য।

এডিলেড টেস্টে আমাদের খেলাটা কিন্তু ভারতীয় বন্ধুদের ভালো লাগলো—কারণ দিনগুলো বেশ খটখটে ছিলো।

আরো একবার টসে জিত হলো। রান উঠলো ছশো চুয়াত্তর, দলের তিনটে সেঞ্চুরী নিয়ে। বারনেস করলো একশো বারো, হ্যাসেট নট আউট একশো আটানব্বই, আমি ছশো এক। এবারকার ডবল সেঞ্চুরী যোগ হয়ে আমার ডবল সেঞ্চুরীর রেকর্ডও হলো, হ্যামণ্ডের চেয়ে একটা বেশি, উনি করেছিলেন ছত্রিশটা।

ভারতীয়রা খেলেছেন যথেষ্ট সাহসিকতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে, তবু তাঁরা হেরেছিলেন—ইনিংসের হার। কিন্তু হাজারে তার মধ্যেও ছটো ইনিংসে ছটো সেঞ্চুরী করেছেন।

টেস্টের পর অমরনাথ আর হাজারের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিতর্ক চলেছে। অমরনাথ দু-একটা টেস্টে সত্যিই অসাধারণ খেলা দেখিয়েছেন, কিন্তু হাজারের মার নিখুঁত, তাঁকে নিঃসন্দেহে কৃতীমান খেলোয়াড়দের পর্যায়ে ফেলা যায়। অমরনাথকে সবাই রান তোলার যন্ত্র হিসেবেই জানেন, এবং তাঁর ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলা দেখে মনে হয়েছে তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদেরও একজন।

কিন্তু টেস্টের খেলাগুলোতে হাজারে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন। হয়তো দলের নেতৃত্ব তাঁর উদ্যমের অনেকাংশ জুড়ে ছিলো। কিন্তু তাঁর খেলায়-অযথা ঝুঁকি নেওয়ার প্রচেষ্টাও এর জন্যে অনেকটা দায়ী। এ জন্যে অনেকগুলো ইনিংস নষ্ট হয়েছে অমরনাথের।

হাজারে কিন্তু এ সব বিলাসিতার প্রশ্রয় দেননি। তাঁর একমাত্র বাধা ছিলো, আক্রমণাত্মক খেলায় অনীহা।

লিণ্ডওয়ালের কথায় ফেরা যাক। আটত্রিশ রানে সাতটা উইকেট নিলো সে—ছশো সাতাত্তর রানের ইনিংসে একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। এডিলেডের মাঠে ইংল্যাণ্ড আর ভারতের বিপক্ষে তার এই খেলা আমাকে বিস্মিত করেছে, কারণ এ মাঠ তো ফাস্ট বোলারদের কাছে সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

অস্ট্রেলিয়ার এডিলেডের মাঠই একমাত্র জায়গা যেখানে কাগজের লোকেরা বোলিং ক্রিজের বাইরে সরলকোণের ভঙ্গিতে বসতেন। শর্ট বাউণ্ডারীতে থাকায় তাঁরা বোলারদের পাগুলো পরিষ্কার দেখতে পেতেন। এবং এইভাবেই বিতর্ক শুরু হয় লিণ্ডওয়ালকে নিয়ে—চিহ্নিত স্থান পেরিয়ে তার বল দেওয়ার ব্যাপারটা।

এই বাদানুবাদের প্রসঙ্গ আর মনে করাতে চাই না; কিন্তু 'নো-বল' কানুনের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলবো এই ফাঁকে।

এটা যুক্তির দিক দিয়ে সন্তোষজনক মনে হলেও, অদ্ভুত সব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন লিণ্ডওয়ালের ক্ষেত্রে, ক্যামেরায় প্রতিবারই দেখা গেছে বল ছাড়ার আগেই তার পা সীমারেখা অতিক্রান্ত।

কোনো আম্পায়ারের পক্ষে একই সঙ্গে বোলারের হাত ও পায়ের ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়। ফলে ছিদ্রহীন রায় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

বোলারকে তাঁর বাঁ (পেছনের) পা ক্রিজের পেছনে রেখে রেখার একটা পর্যায় অতিক্রম করতে দেওয়া যায় সম্ভবতঃ।

আটচল্লিশ সালে 'উইসডেনে'র একটা লেখার সঙ্গে আমি একমত, তাঁরা লিখেছেন: বোলারের সামনের পা ক্রিজের ছু পাশের সংযোগস্থলে 'পড়া' দরকার, এ সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, বিকল্পে অন্ততঃ পরীক্ষা করা যেতে পারে ব্যাপারটা। এতে আম্পায়ারের কাজ সরলীকৃত হবে, এবং বর্তমান নিয়মে কোনো অনিশ্চিতি থাকলে সেটা দূর হতে পারে।

মেলবোর্নে পঞ্চম টেস্টের খেলা শুরু হলো। আমার মাথায় তখন কেবল এক চিন্তা, ইংল্যাণ্ড সফরের। আমার সমস্ত সত্তা নিয়ে চলেছে তার প্রস্তুতি—কারণ ইংল্যাণ্ডকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি তার মানুষকে। তাঁদের উনিশশো চৌত্রিশ আর আটত্রিশ সালের অভ্যর্থনা তো ভুলিনি।

তবে, অসুবিধে ছিলোই। শরীরটা সেরেছিলো কিন্তু মানসিক চাপ থেকে গেছে। সব কিছুই যাচাই করলাম, তারপর শেষ সিদ্ধান্ত নিলাম—আমাকে যেতেই হবে, এটা আমার কর্তব্য। আটাশ সালে আমার

সঙ্গে যাঁরা খেলেছেন তাঁরা কেউই নেই এবার। কাজেই আমার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সহায়ক হবে। তা, ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টের আগের দিন রাতে আমি কাগজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হলাম, তাঁদের জানালাম, "আমি আজই আমার সহ-নির্বাচকদের বলেছি যে আগামী ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়া আমার সহযোগিতা পাবে। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছি, যে ভারতের বিরুদ্ধে খেলাটিই হবে আমার অস্ট্রেলিয়াতে শেষ প্রথম শ্রেণীর খেলা, কারণ ইংল্যাণ্ড সফরের শেষেই আমি ক্রিকেট থেকে অবসর নেবো।"

ফিরে আসার পর অবশ্য গোটা তিন-চার খেলায় অংশ নিয়েছি—উনিশশো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশে, কিন্তু প্রতিশ্রুতির খেলাপ হয়নি, কারণ সেগুলো সবই প্রদর্শনী বা অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত খেলা। দুটো খেলাতে বিশেষ করে আমাকে অংশ নিতেই হয়েছে—সিডনির কিপাক্স-ওল্ডফিল্ড খেলা, আর এডিলেডে আর্থার রিচার্ডসনের সাহায্যার্থে আয়োজিত খেলা। মনের কথা তো জানিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু খেলতে পারবো তো শেষ পর্যন্ত? পঞ্চম টেস্টে আমার শরীরের কি হাল হয়েছে তা যে আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না। ইনিংসের মাঝেই অবসর নিতে হয়েছে—কে জানে ফাইব্রোসাইটিসের পুনরাক্রমণ হলো কিনা—বা কোনো পাঁজরার হাড় সরলো হয়তো।

শেষ কথা বললে বলতে হয় আমার দিন ফুরিয়েছে। খেলার মাঠের দিন—দলে নতুন মুখের প্রয়োজন দেখা দেখা দিয়েছে।

চূড়ান্ত খেলায় ভারতীয়রা যেন নিরাশ হয়ে পড়লেন ক্রমে। প্রথম ইনিংসের শুরুটা ভালোই করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু শুকনো পিচে খেলা খারাপ হতে লাগলো—সাতষট্টি রানে সবাই আউট। অস্ট্রেলিয়ার আবার হলো জয়—একার ইনিংসের।

এ খেলায় এক তরুণ খেলোয়াড়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলো—নীল হার্ভে। প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরী মারলো সে একশো তিপান্ন করে। উনিশ বছরের কিশোরের পক্ষে অনেক রান।

বিশ্লেষণ করতে বসলে বলতেই হয় ভারতীয় দল তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ

রাখতে পারেননি, তবে ওঁদের নিয়মিত দল নামলে কি হতো বলা মুশকিল। ঘটনার বিবরণ হয়তো অন্যভাবে দিতে হতো আমাকে। অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যাণ্ডের চার-পাঁচটি নিয়মিত খেলোয়াড় বসে গেলে দল অনেক কমজোরী হয়—আর ভারতের ছেলেরা, যাদের দলগত শক্তি স্বাভাবিকভাবেই কম তাদের তো আরও ক্ষতি হবে এ অবস্থায়। ব্যাটিংয়ে তবু অমরনাথ আর হাজারে চালিয়ে গেছেন, ওঁদের তুলনা নেই। মাঁকড় অতো বল দেবার পরও ব্যাটের কাজে আশ্চর্য দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন। তবে ফাস্ট বোলিংয়ের মোকাবিলা তিনি কোনোদিনই করতে পারেননি—লিণ্ডওয়ালের হাতেই ওঁর উইকেট পড়েছে প্রতিবার। আর একজন সফরের শেষের দিকে যথেষ্ট উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছেন, তিনি—ফাদকর। ফাস্ট মিডিয়াম বল করতেন, পেসের কাজও ভালো। সোজা মারের পক্ষপাতী ছিলেন ফাদকর।

অমরনাথও সময়ে অত্যন্ত ভাল বল করেছেন।

আমার ঘা সারতে সময় নিলো, ইংল্যাণ্ড সফরের আগে আর মাঠে নামা হয়নি।

সফরের প্রায় সমস্ত সময়টাই দিয়েছি ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাহায্যে। ওদের মান উন্নয়নে সহযোগিতা করেছি। যখনই পেরেছি। উৎসাহ দিয়েছি খেলায়।

টেস্টের জেল্লা এখনো ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেই সীমিত। কিন্তু তা তো হবার কথা নয়—অন্যান্য দেশকেও এগিয়ে আসতে হবে—তবেই টেস্ট খেলার গুরুত্ব বাড়বে।

সেদিন নিশ্চয়ই আসবে, এবং টেস্ট খেলার প্রবীণতম সদস্যদল হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার দায়িত্বও বাড়বে—অন্যান্য দলকে ক্রিকেটের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব।

ইংল্যাণ্ড : শেষবারের জন্য

দাবার দান পড়ে গেছে, আর ফেরার উপায় নেই। প্রকাশ্যে ইংল্যাণ্ড সফরের ঘোষণা করা হয়ে গেছে। ধরেই নিয়েছি আমি দলভুক্ত হবো,

যদিও তখনো দলের তালিকা বেরোয়নি। নেতৃত্ব করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই আমার।

শুধু একটা মাত্র চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে—শরীরে ধকল সইবে তো? ভাবতে শুরু করলাম—ব্যর্থতার ভাবনাই জেঁকে বসলো মনে। দশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অস্ট্রেলীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছি—কাজটা এতো পরিশ্রমের হয়েছিলো যে, পরে সেইজন্যেই সফরের মায়া কাটাবো ঠিক করেছিলাম। আর আজ—দশ বছর পরে আমার বয়সও বেড়েছে, দৈহিক সহনশীলতাও নিশ্চয়ই ক্ষয়ের দিকেই। এই সব ভয়ই মনটাকে ছেয়ে রেখেছিলো, কিন্তু দিন যতো এগিয়ে এলো ততোই মনোবল বাড়তে লাগলো। মনটা আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠলো, এ আগ্রহ তো আগে ছিলো না? দলের নেতৃত্বদানের এক জ্বলন্ত ইচ্ছা সারা দেহমনে শিহরণ তুলেছে।

দলের তালিকা বেরোলো—নিশ্চিন্ত হলাম। এমন একটা দল যাচ্ছে যাদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত। যাদের কাছে পিতৃসুলভ শ্রদ্ধা পেয়েছি, যারা সব সময়ে আমার নির্দেশ পালনে এক পায়ে খাড়া, নির্দ্বিধায় যারা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে প্রতিটি স্তরে।

এক অনাবিল আনন্দ চল্লিশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ের, খেলোয়াড়দের নিয়ে ইচ্ছানুযায়ী খেলবে সে। এ আনন্দের অনুভব কজনার হয় জীবনে? দলের সবাইকে ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝালাম। ঐক্যবদ্ধ শক্তির আনন্দ কতখানি তাও বোঝালাম। আমার ভূমিকার কথাও জানালাম। বাইরের প্রভাবের সম্পর্কে সাবধানবাণী দিলাম—বললাম তাতে সাময়িক লাভ হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি পেতে গেলে নিজের দেশের জন্যেই ভাবতে হবে।

তারা এটা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করবে এটা নিজেও ভাবিনি। খেলার দিক থেকে আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলাম। দলের ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারটা আমার চেয়ে কেউ-ই ভাল জানে না, তবু, আমাদের দলের চারিত্রিক এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো যা আস্থার ভাব এনেছে। নতুন ছেলেদের কারু কারু শ্রমের পরীক্ষা হয়তো

হয়নি তখনো, তবু বাকিদের কথা তো জানি—জানি প্রায়োগিক দিক থেকে আমরা আগের সফরকারী দলের তুলনায় অনেক উন্নত।

বারনেস আর মরিসকে প্রথম জুটি রাখা হয়েছিলো—এঁদের পয়লা জন ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতে অসাধারণ খ্যাতি অর্জনকারী খেলোয়াড়, অন্যজনও প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহনকারীরূপে পরিচিত। এঁদের একজন ন্যাটা বোলার।

অতিরিক্ত ওপনিং ব্যাট হিসেবে ছিলো বিল ব্রাউন—যে ইংল্যাণ্ডের খেলায় স্বদেশের চেয়ে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলো।

তারপর ছিলাম আমি, হ্যাসেট আর হ্যামেন্স, দুজনই সোজা ব্যাটের লোক, আর নীল হার্ভে। এই ন্যাটা বোলারটির ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল মনে হয়েছে।

অল-রাউণ্ডার ছিলো লিমার আর লক্সটন—আগের জন ক্ষিপ্র ফাস্ট বোলার। ভালো ফিল্ড করে এবং ওপনিং ব্যাট হিসেবেও খ্যাত। পরের জন রান-আউটের ব্যাপারে মাঠে ভীতির কারণ হয়েছিলো। আরো কয়েকজনকে এই পর্যায়ে রাখা যায়—ইয়ান জনসন, ম্যাককুল আর লিণ্ডওয়াল। কিন্তু এদের দলে প্রাথমিক প্রয়োজন ছিলো বোলিংয়ের জন্যেই, যথাক্রমে—অফস্পিন, লেগস্পিন আর ফাস্ট হিসেবে।

আর একজন লেগস্পিনারের উল্লেখ প্রয়োজন—সে হচ্ছে ডাগলাস রিং। তারপর বিল জনস্টন—ন্যাটা, ফাস্ট কিংবা স্লো বল দুই-ই চালাতো। টস্যাকের খ্যাতি মিডিয়াম বলের জন্যে, সেও ন্যাটা।

বাকি দুজন উইকেটের লোক—ট্যালন আর স্যাগার্স। এরা ভালো ব্যাটও করতো।

এদের সম্বন্ধে এতো কথা বললাম আমাদের দলগত শক্তির আন্দাজ দেবার জন্যে।

এদের সঙ্গে ক্রিকেটের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছি অবসর সময়ে, দোষ-ত্রুটি শুধরে দিয়েছি—অপরাজেয় দল হিসেবে সফর শেষ করবো এই ভাবনাও ঢুকিয়েছি মাথায়। আমাদের ভাগ্যের ওপর আস্থাশীল হতে হবে, টসে জিততে হবে—আবহাওয়ার আনুকূল্য পেতে হবে—কিন্তু সবার ওপরে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস।

সফরের পয়লা দিনেই কিন্তু এ সব জুটলো না—ক্রমে ক্রমে চললো আমার খেলার রূপবদল। সবই চললো আমার সহযোগীদের অগোচরেই। কিন্তু আমার মনে আছে স্মরণীয় দিনটা—বাড়ি ছেড়ে আসার। তারিখটা তেসরা মার্চ, উনিশশো আটচল্লিশ। প্লেনে চড়তে আমি পছন্দ করি না, তবু দলীয় স্বার্থে আমাকে উঠতে হয়েছে উড়োজাহাজে। হোবার্ট পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে, তারপর সেখান থেকে পার্থ। কাজেই চৌঠা মার্চই আমরা সরকারীভাবে যাত্রা করেছি হোবার্টের উদ্দেশ্যে। পরের দিন পড়লো আমাদের প্রথম খেলা।

আমার পক্ষে এ যাত্রা আরো অস্বস্তির হলো, কারণ ভারতের সঙ্গে খেলার চোট তখনো সারেনি। এটাকে বাড়তে না দিয়ে ইনিংস ছেড়ে দিলাম। পরের খেলা ছিলো লন্সটনের সঙ্গে—এ খেলায় বিশ্রাম নিলাম।

তাসমানিয়ার সঙ্গে খেলাগুলোর খুব গুরুত্ব ছিলো। এসব খেলাগুলোর কিন্তু কিছু উন্নয়নমূলক ছিলো না। তবু এগুলোতে কিছু নতুন মুখের সন্ধান মেলে। জ্যাক ব্যাডকক এরকমই একজন—তাসমানিয়ার লোক।

মেলবোর্নে ফেরার পর আমাদের বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হলো ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট সংস্থা থেকে। এই সভায় দলের স্বাস্থ্য কামনা করলেন স্বয়ং ভিক্টোরিয়ার রাজ্যপাল মাননীয় স্যর উইনসটন ডুগান। পরের দিনটা আকাশপথেই কাটলো, সন্ধ্যে সাতটায় পৌঁছলাম পার্থে। যাত্রায় ক্লান্তি অনুভব করেছি। সফরে বেরোবার আগে খেলতে হয়েছে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। শেফিল্ড শীল্ডে তাদের প্রথম খেলা সেটা। এবং সেই খেলাতেই জয়ের মুকুট পরেছিলো তারা।

পার্থের মানুষ স্বদেশপ্রেমের এক অভাবনীয় নজির রেখেছে। এটা স্বাস্থ্যকর—কারণ পরবর্তীকালে এখান থেকেই অস্ট্রেলীয় একাদশে নতুন খেলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্তি হতে পারবে হয়তো। এঁদের সম্মানার্থে আমাকে চোট নিয়েই নামতে হলো খেলায়। ভেবেছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে এটাই আমার শেষ প্রথম শ্রেণীর খেলারূপে চিহ্নিত হবে—যাই হোক সেঞ্চুরীও হলো এ খেলায়, স্বদেশের মাটিতেই। মরসুমের অষ্টম সেঞ্চুরীও হলো—

আমার এ বই লেখার সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলীয় মরসুমে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী সংখ্যা। জানি এ রেকর্ড থাকবে না, স্বল্প সময়েই এটা অতিক্রান্ত হবে।

এ খেলায় এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো যা লেখা দরকার, কারণ এর সঙ্গে নীতির প্রশ্নও জড়িত, এবং পাঠকদের জানানোও দরকার এ সম্পর্কে আমার মনোভাব কি। এই আমার শেষ প্রকাশ্য খেলা—অপেশাদার চরিত্রের, শিক্ষণমূলকই বলতে হয়। শেষদিনে স্থানীয় ব্যাটসম্যানরা অ-পর্যাপ্ত আলোকের জন্যে আবেদন জানালো, ঘড়িতে তখন চারটে বেজে চল্লিশ মিনিট হয়েছে। বল করছিলেন দুই 'স্লো' বোলার ম্যাককুল আর জনসন। এর দুটো কারণ আছে মনে হলো আমার—এক, নিজেদের উইকেট বাঁচানো সেদিনের জন্যে, আর দুই, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচানো।

খেলা বন্ধ হলো—পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ভুল করলো, কারণ খেলা চলতে থাকলে তাদের শেখবার অনেক ছিলো। দর্শকেরাও বঞ্চিত হলেন মোটামুটি উত্তেজনাকর একটা খেলা দেখার আনন্দ থেকে। আর একটা কারণ অনুমান করা যায়—ফাস্ট বলের ভীতি, কিন্তু শুধুমাত্র এই জন্যেই আমি ফাস্ট বোলারদের হাতে সেদিন বল দিইনি।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আগের বারের ইংল্যাণ্ড সফরের কথা। অ্যাবারডিনে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় পর্যাপ্ত আলোর অভাবে আবেদনের ব্যাপারটা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিলো। ব্যাটসম্যানদের একজন এ সম্পর্কে আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আম্পায়ার কথা বললেন স্কটিস অধিনায়কের সঙ্গে। অধিনায়ক জানালেন তাঁর দল স্পষ্টতই পরাজিত, 'কেউই বিপদের সম্মুখীনও নন দলের—কিন্তু তাঁরা খেলা শিখতে চান। এও জানালেন লোকে অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখতে এসেছেন, কাজেই খেলা চলুক।

তফাতটা এ জন্যেই চোখে পড়ে—কেউ দলের স্বার্থই বড় করে দেখেন, আবার অন্যে চান পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী খেলতে। খেলাটাই তাঁদের কাছে বড়, জয়পরাজয়ের ব্যাপারটা গৌণ। কিন্তু পরিষ্কার করে একটা কথাই বলতে চাই—এ সবই অপেশাদার খেলার ফসল—পেশাদারী

ক্রিকেটে অন্য প্রশ্ন দেখা দেয়। পার্থ ছাড়ার আগে দুটো কাজ সারলাম। প্রথম কাজ ওখানকার বিকলাঙ্গ ছেলে-মেয়েদের হাসপাতাল পরিদর্শন। ওইসব হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে যেটুকু সময় দিতে পেরেছি তাই আমার জীবনে এক অমর স্মৃতি। দ্বিতীয় কাজটা হলো, ওখানকার দাঁতের হাসপাতালে রোগী হিসেবে পদার্পণ—একটা আক্কেল দাঁতের অপসারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো।

উনিশে মার্চ, শুক্রবার আমরা স্ট্রাথহার্ড জাহাজে চড়ে বসলাম—গন্তব্য ইংল্যাণ্ড। শেষবারের সফর। জাহাজে আর্থার মেইলির কথা কানে এলো, বলছে: 'এটাই আমার শেষ সফর।' নেভিল কার্ডাসেরও একই কথা, 'এটাই শেষ।' তারই মধ্যে কানে এলো এক মহিলার স্বর, সম্ভবতঃ স্বামীর উদ্দেশেই বলছেন তর্কের প্রয়োজনে, 'আমি আর কি করতে পারতাম?'

মজার কথা—আমার কানে কথাগুলোর অনুরণন হলো—'আমি আর কি করতে পারতাম?' ইংল্যাণ্ড যাত্রায় আমারও শেষ কথা এই-ই। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও ফিরে এসেছি ক্রিকেটের মাঠে—প্রবীণ বয়সে ইংল্যাণ্ড চলেছি, নিজের বিচারবোধের বাইরেই। ব্যর্থতা তো আসবেই।

কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি নিরপরাধ। খেলার জন্যেই তো আমার এতো সব—যে খেলা আমার প্রাণের চেয়েও দামী। সফর সম্বন্ধে বলার কমই আছে, তবু কলম্বোর একদিনের একটা খেলা স্মরণীয় হয়ে আছে—মাঠ দর্শকদের ভীড়ে উপচে পড়ছে, সংখ্যায় পঁচিশ হাজারের কম নয়ই। তিন হাজার পাউণ্ড তাঁরা একদিনের খেলা দেখতে খরচ করেছেন। বৃষ্টির জন্যে অবশ্য খেলা অল্পক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু আর একটা ঘটনা খারাপ লেগেছিলো, পিচের দূরত্ব আইনানুগ মনে হয়নি। মেপে দেখা গেলো দৈর্ঘ্যে প্রায় দু গজের মতো কম। ফলে মিলারের মোকাবিলা করা ওঁদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়লো। আবার অন্যদিকে মনে হলো ওঁদের বোলাররা যেন পিচে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছেন। এ ধরনের ব্যাপার হয়তো অন্য কোথাও ঘটে থাকতে পারে,

তবে আমি যে সব খেলায় অংশ নিয়েছি তার কোনোটায় এটা চোখে পড়েনি আর।

কলম্বোর স্কোরবোর্ডটির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি—অন্যান্য দেশের কোথাও যা পাইনি, স্থানীয় মানুষের উৎসাহ যোগাতে অনেক বাড়তি সন্দেশ। কলম্বোতে তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, যা আমাদের বিপদের কারণ হয়েছে মাঝে মাঝে। আমাদের উইকেটরক্ষক বারনেসকে অসুস্থাবস্থায় মাঠ ছাড়তে হলো। খেলাশেষে আমিও অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ডাক্তার ডাকতে হলো। বম্বে পৌঁছনো পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিলো আমাকে। কিন্তু বম্বেতে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো—ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সভাপতি মিঃ ডি'মেলো এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন—অনুষ্ঠানে নানা উপহারও আমাদের জন্যে। তিনি, পিটার গুপ্ত আর বিজয় মার্চেণ্ট বক্তৃতাও করলেন। হাতে অল্প সময় থাকায় আমাদের প্রত্যুত্তর সংক্ষিপ্ত হলো।

পোর্ট সৈয়দে পৌঁছলাম। ভ্রমণকারীদের স্বর্গ বলে বন্দরটির খ্যাতি আছে। অনেকে কেনাকাটা করলেন, একজন খেলোয়াড় একজোড়া জুতো কিনে খুব জিতেছেন বলে বড়াই করলেন,—শেষে দেখা গেলো ছোট বড় হয়েছে জোড়া—একটা আট সাইজের, অন্যটা ন'। পোর্ট সৈয়দের বিক্রেতাদের মোকাবিলা করতে আপনাকে যথেষ্ট চালু হতে হবে। জিব্রাল্টারের বাজারে বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ্য করা গেলো—এখানে আমাদের ছবি তুলে লণ্ডনে পাঠানো হচ্ছিলো। আধুনিক ক্রিকেটে দিকপালদের এটাই বাড়তি লাভ—জনসাধারণের কাছে আগাম পৌঁছে যাওয়া। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে সবই হয়।

ষোলোই এপ্রিল, সেদিনটাও শুক্রবার ছিলো—আমরা পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। আর অভ্যর্থনার পুরোভাগে পেলাম ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া, দু দেশেরই জনপ্রিয় মানুষটাকে, তিনি হলেন—আর্ল অফ গাউরি—এম. সি. সি'র সভাপতি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফরের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়ে গেলো।

ক্যামেরা, টেলিভিশান আর বেতারের আবিষ্কারকরা নিঃসন্দেহে মানব-সেবার একটা অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তার প্রচারের এমন মারাত্মক যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছেন জানলে কি করতেন কে জানে। আমাদের—মানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষদের কাছে এটা ভয়ের ব্যাপারই বটে।

চলচ্চিত্রজগতের মানুষের কাছে এটা আত্মতৃপ্তির ব্যাপার হলেও, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে ঠিক উল্টো। টিলবারিতে যে জনারণ্য দেখেছিলাম তা সত্যিই ভয়াবহ—ক্যাঙারুর দেশ থেকে লোকগুলো এসেছে তাদের দেশের মানুষের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়, কেমন মানুষ বটে এরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের কাছে এটা আশা করা যায়নি।

আমি, অধিনায়ক হিসেবে তো জানি, পরের কটা দিন কাটবে আমার দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার আগে থেকেই এ ভাবনা মাথায়।

যে মানুষ সাধারণ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাকে সব সময়ে সমাজের নামী-দামী মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে, সভা-সমিতিতে মালা কুড়োতে হবে এ যেন এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আমার উত্তরসূরীরা যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে পারেন, এ জন্যেই এ কথা বলছি।

প্রথম সভার আয়োজন হয়েছিলো পরের দিন সকালে অস্ট্রেলিয়া হাউসে। হাই-কমিশনার সভার উদ্যোক্তা। রাইট অনারেবল জে. এ. বেসলে সাহেব ছাড়া আরও দুশো অভ্যাগতের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে ; মনে হলো ওরস্টারের সঙ্গে খেলার আগে বোধ হয় ডান হাতটা কর্মক্ষমই হবে না।

ক্যামেরাওলারা বোধ হয় আগের দিনের ছবিগুলো সংখ্যায় অকিঞ্চিৎকর মনে করেছিলেন, তাঁদের কার্যকলাপও বেড়ে গেলো দ্রুত আকস্মিকতায়। লর্ডসের অনুশীলনে নেমে রেহাই পেলাম। আমাদের নতুন ছেলেরা এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের উইকেটে পা রাখলো।

অস্ট্রেলীয় বোর্ডের সংযোগকারী অফিসার মিঃ রোবিন্স সপ্তাহশেষে গল্‌ফ্‌ খেলার সুযোগ করে দিলেন। আমরা বিরাট স্বস্তি পেলাম। গল্‌ফের এই ছোটখাটো প্রমোদ আয়োজনগুলো ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আনন্দের উৎস।

অবিরাম শ্রমের থেকে দূরে সরে থাকা—সাধারণ মানুষ বনে যাওয়া—অন্যের খেলার দক্ষতায় ঈর্ষান্বিত হবার নেই অস্বস্তি—এবং সবার ওপরে মানসিক বিশ্রাম, যা একমাত্র গল্‌ফ্‌ খেলাতেই মেলে। নিয়মিত গল্‌ফ্‌ খেলোয়াড় ছাড়া অন্য যে কোনো ক্রীড়ামোদীই আমার এ বক্তব্য সমর্থন করবেন। তবে এর কোনো ব্যাখ্যা চাইলে দিতে পারবো না। বার বার একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, 'গল্‌ফ্‌ খেললে ক্রিকেটের ক্ষতি হয় না আপনার?' উত্তর প্রতিবারই একটাই দিয়েছি—'না।'

কিন্তু, ক্রিকেট খেললে গল্‌ফের ক্ষতি হয়—কারণ গল্‌ফে 'কভারে' বল পাঠাতে হলে বাঁ হাতটাকে বেঁকাতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ছে—ইংল্যাণ্ডের এক নামকরা গল্‌ফ্‌ মাঠে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম আগের এক সফরে। আমাদের পৌঁছনোর ঠিক আগেই হেনরি কটন এক প্রতিযোগিতায় আশ্চর্য ভাল খেলেছিলেন।

আমরা পৌঁছলে খেলার ছোট ছোট বাক্স দেওয়া হলো, কিন্তু আমাদের একটা ছেলে পঞ্চদশ পর্যায় পর্যন্ত এদিক-ওদিক করলো সর্পিল গতিতে, তারপর 'রাফে' নিখোঁজ হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করাতে উত্তর পেলাম, 'আমি নিজে বড় একটা এদিকে আসি না, সাহেবের জন্যেই বাক্স বই তো!'

পরের দিন সকালে অনুশীলনে নামতে হলো। পরিষ্কার মনে আছে ফিল্ড মার্শাল লর্ড অ্যালেকজাণ্ডার মাঠে এসেছিলেন তাঁর ছেলের অনুশীলন দেখতে। অ্যালেকজাণ্ডারকে ক্যানাডায় ফিরে যেতে হলো টেস্টের আগে। খেলা না দেখতে পারার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। ভদ্রলোক ক্রিকেটামোদী ছিলেন এবং পুত্রের দক্ষতা যাচাই করার ইচ্ছে পোষণ করেই এসেছিলেন।

এরপর রাজকীয় এম্পায়ার সংস্থায় লাঞ্চের নিমন্ত্রণ জুটলো। আর্ল অফ ক্ল্যারেনডন সভাপতির আসনে ছিলেন, সুন্দর ভাষণে স্বাগতও

জানালেন। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক সি. বি. ফ্রাইও ভাষণ দিয়েছিলেন সেই সভায়।

বিকেলে কলসিয়োম থিয়েটারে নাটকে নিমন্ত্রিত হলাম, সরকারী অতিথি হয়ে। 'অ্যানি গেট ইওর গান' নাটকটি অভিনীত হচ্ছিলো সেদিন। নাটকের পর রাতের খানাও হলো। এখানে এক বিখ্যাত রাজপুরুষের সঙ্গে দেখাও হলো, মিঃ আর্নেস্ট বেভিন—ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র সচিব। যুগপৎ বিস্ময় আর আনন্দের দিন। নৌবাহিনীর প্রধান মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডারও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ছিলেন ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাকগাউয়ান। ইনি নাটকের দর্শকও ছিলেন সেদিন।

বেভিন সাহেব সুরসিক মানুষ। একটা আমুদে গল্প বলেছিলেন বলে মনে পড়ছে—গল্পটা এক সাম্যবাদী, পুঁজিপতি, ফ্যাসিস্ট আর ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে নিয়ে। নৌকোয় চলেছে তারা, হঠাৎ নৌকো ডুবে গেলো। ওরা তীরের দিকে সাঁতরে চললো—কিন্তু পুঁজিপতি লোকটি নৌকোডুবির আগে মালপত্তর পিঠে বেঁধেছিলেন, ডুবে গেলেন। সাম্যবাদী ভদ্রলোক এতো চিৎকার করলেন যে প্রচুর জল গেলো পেটে, তিনিও গেলেন। ফ্যাসিস্ট লোকটি একটি হাত সেলামের ভঙ্গিতে রাখাতে সাম্য হারিয়ে তলিয়ে গেলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীটি বেশ সাঁতরে আসছিলেন ডাঙার দিকে, কিন্তু হাওয়াতে তিনিও ডুবলেন। বেভিন সাহেবের রাজনৈতিক পটভূমিকার জ্ঞান আমাদের সেদিন হাসাতে পেরেছিলো।

পরের দিন স্যাভয় হোটেলে ব্রিটিশ স্পোর্টসম্যান্স ক্লাবের তরফ থেকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। জমজমাট অনুষ্ঠান। চারশো তিরিশজন অতিথির আসন পড়লো খাওয়ার টেবলে। লর্ড অ্যাবারডেয়ার ছিলেন সেদিনের সভাপতি। লেফটেনাণ্ট কর্নেল অ্যাব. স্ট্যানিফোর্থ অস্ট্রেলীয় দলের স্বাস্থ্যপান করলেন। তিন ঘণ্টা চললো অনুষ্ঠান আনন্দের বান ডেকে, কিন্তু 'অধিনায়কত্বে'র বিপদ এখানেও, বড় কঠিন ব্যাপার। অনুশীলন চলতে থাকলো, কোনোদিন সকালে, কোনোদিন বা বিকেলে। পরের দিন লাঞ্চ খাওয়া গেলো গ্রসভেনার হাউসে, উদ্যোক্তাদের সাংবাদিক

সংস্থা। লাঞ্চে এক কাকতালীয় ব্যাপার হলো। অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে আসার আগে আমার পারিবারিক চিকিৎসক আমাকে একটা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন—জন গর্ডনের নামে। ভদ্রলোককে কোথায় কি করে খুঁজে বের করবো ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। লাঞ্চে যে ভদ্রলোক সভাপতিত্ব করলেন, জানা গেলো সেই ভদ্রলোকই জন গর্ডন, আমি যাঁকে খুঁজে ফিরছি।

পাঠকদের শুধু খাওয়ার বিবরণ দিয়ে আর বিরক্ত করবো না—ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিস্টসের 'জার্নাল' পত্রিকার এক সংক্ষেপিত খবর দিয়ে শেষ করছি :

"অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট দলের সংবর্ধনায় এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ইনস্টিটিউটের লণ্ডন জেলা শাখা। গত চারটে সফরের মতো এবারও হৃদ্যতার পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। স্মৃতিচারণের অনেক-গুলো ঘটনাও মনকে নাড়া দেয় : উনিশশো আটত্রিশের ঘটনাবলী, মিউনিখের বছর—ডন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে আসর জমিয়েছেন।

জন গর্ডন সভাপতির আসন থেকে উপভোগের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়েছেন।

প্রাক্তন দিকপাল ফ্রাইয়ের কাছেও খুবই উপভোগ্য হয়েছে অনুষ্ঠান, বিশেষ করে পুরনো সময়ের উল্লেখে তাঁর মুখে ফুটেছে আত্মতৃপ্তির হাসি। ব্র্যাডম্যান অবশ্য তাঁর পরিহাসের সুর পাল্টে মূল প্রসঙ্গে এসেছেন—গ্রেট ব্রিটেনের সংবাদপত্র-জগতের কাছে আবেদন জানালেন খেলার একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির। অনেক ঘটনাই, বললেন ব্র্যাডম্যান—খেলোয়াড়দের অগোচরেই ঘটে। তারা বন্ধুভাবেই থাকতে চায় এবং থাকেও। কাজেই ইন্ধন যেন না যোগানো হয়।

অস্ট্রেলীয়রাই ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেয় বলে যে চারদিকে গুজব এটার কোনো ভিত্তি নেই। ইংল্যাণ্ডই বরং এ ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী বলে একটা ঘটনার উল্লেখ করেন। মাত্র তিনজন অস্ট্রেলীয় এ পর্যন্ত টেস্টের খেলায় লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করেছেন। লীডসের উনিশশো ত্রিশের খেলায় তিনি নিজে যে ওই তিনজনের একজন বলে চিহ্নিত, এ কথা বিনয়ের খাতিরে আর বলেননি ডন।

ব্র্যাডম্যান সুবক্তা হয়েছেন, পত্রিকার একটা ভুল খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন মিঃ ফ্রাই, 'ক্রিকেটের সংবাদদাতা'রা নাটকের সমালোচকদের মতো কখনো কখনো অনেক দেরিতে 'আবিষ্কার' করেন— নানা ব্যাপারেই এটা ঘটে। ডন ব্র্যাডম্যান বহুদিন ধরেই গুণী বক্তারূপে পরিচিত, আজ সে গুণের এমন একটা স্ফুরণের ইঙ্গিত পেয়েছি যাতে তাঁকে অনায়াসে সাম্রাজ্যের একজন রাষ্ট্রদূত বানিয়ে দেওয়া যায়।"

সংসদসদস্য মিঃ অলিভার লিটল্‌টনও ছোট্ট অথচ একটা সুন্দর বক্তৃতা করেছিলেন—অস্ট্রেলীয়দের স্বাস্থ্য কামনা করে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর পিতা অ্যালফ্রেড লিটল্‌টনের কথাও বললেন—টেস্টের একটা খেলায় যিনি নায়করূপে পরিচিতি পেয়েছিলেন। আঠারোশো চুরাশিতে তিনি ইংল্যাণ্ডের উইকেটরক্ষক ছিলেন, এবং একটা দীর্ঘ ইনিংস শেষে প্যাড খুলে বল করতে শুরু করেছিলেন। শেষ চারজন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানকে মাত্র উনিশ রানে নামিয়েছিলেন। খেলায় বলের গড় তাঁরই সর্বোচ্চ ছিলো।

ব্র্যাডম্যান উত্তরে তাঁর ভাষণ শেষ করার পর তাঁকে গাইল্‌সের আঁকা এক ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত মেনু কার্ড উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়। তাতে দেখানো হয়েছে হ্যাসেট থেকে হার্ভে পর্যন্ত সবাইকে।

সভাশেষে 'অল্ড ল্যাং জাইন' গানটি গাওয়া হয় সমবেত কণ্ঠে।

পিকাডেলীর পাবলিক স্কুল ক্লাব-ঘরে পরের দিন ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ এলো। আয়োজন করেছেন ক্রিকেট লেখক সংঘ। যতগুলো অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি এই সফরে তার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে— বক্তৃতাগুলো অত্যন্ত রসালো হয়েছিলো বলেই বোধহয়।

শুরু করলেন 'জিম' সোয়ানটন, তারপর বললেন 'ক্রিকেট ইতিহাসে'র লেখক এইচ. এস. অলথাম, কিন্তু সবার বেশি কৃতিত্ব বোধহয় দাবী করতে পারেন ধর্মযাজক গিলিংহ্যাম আর স্যার নরম্যান বারকেট।

ডিনারোত্তর বক্তৃতার খ্যাতি ধর্মযাজকের বহুদিনের, কিন্তু আমার এই প্রথম সুযোগ হলো তাঁর ক্ষুরধার রসাস্বাদনের। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের নিয়ে গল্পগুলো আমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দিয়েছে। প্রচুর হেসেছি সেদিন।

আমার বক্তৃতায় বললাম—গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইংরেজরা কোনো অস্ট্রেলীয় দলকে হারাতে পারেনি ক্রিকেটে। উনি সঙ্গে সঙ্গে চুপিচুপি কোথা থেকে এক বিস্ময়কর গোপন খবরের বাণ্ডিল বের করে তার থেকে এক উদ্ধৃতি দিলেন—তাঁর জেলা এস্টেটের হাতেই পরাজয় বরণ করেছে অস্ট্রেলিয়ার এক দল, তেতাল্লিশ বছর আগে!

অনুষ্ঠান থেকে বিদায় নেবার আগে স্যর নরম্যানের একটা দারুণ রসিকতা হজম করা গেলো। ক্রিকেট লেখক সংঘকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন তাঁর মার্কিণ দেশের এক অভিজ্ঞতার কথা। তিনি সে অনুষ্ঠানের খাদ্য-তালিকার প্রশস্তি শুরু করতেই নাকি বাধা দিয়েছিলেন এক অভ্যাগত, 'এ কিছু না স্যর, আমাদের ওকলাহোমাতে পানীয়ের মাঝেই পানীয় গ্রহণ করি।'

আর একজন তৎক্ষণাৎ বলে উঠেছিলেন, 'স্যর, ওটাও কিছুই নয়, আমাদের এরিজোনাতে কোনো বিরাম নেই এ ব্যাপারে।'

মাননীয় ডিউক অফ এডিনবরার সঙ্গেও কেটেছিলো এক মধুর সন্ধ্যা। সেখানে বলেছিলাম—ডিউকের অনেক ছবি দেখেছি আমি, খেলার মাঠে। ওঁকে সালের উত্তম অফ-স্পিনার মনে হয়েছে আমার। এ কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করলাম ইংরেজ নির্বাচকদের।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডিউক ক্রিকেটের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক।

সেই সপ্তাহেই আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো আমাদের জন্যে। শনিবার দিন ওয়েম্বলিতে নিমন্ত্রিত হলাম ফাইনাল খেলায়। ব্ল্যাকপুলকে চার-দুই খেলায় হারালো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। রাজপরিবারের সংরক্ষিত আসনের পাশে আমরা বসেছিলাম। ওঁরা খেলায় খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন সেদিন।

আমি সাকুল্যে চারটে টাই-ফাইনাল দেখেছি ওদের দেশে, নিঃসন্দেহে এই খেলাটাই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে। স্ট্যানলি ম্যাথুজের একজন গুণমুগ্ধ জানালেন তাঁর গুরুই ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়। আমি এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে শুধু বলবো ম্যাথুজের বলের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আমাকে অভিভূত করেছে সেদিন।

নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ স্তর ব্রুস ফ্রেসারের সঙ্গে পরিচয়লাভের সৌভাগ্যও হয়েছে সেদিন।

পরের দিনটা ছিলো ঘটনাবহুল। সকালেই অস্ট্রেলীয় দলের পরিচালক মিঃ কিথ জনসন আমাকে নিয়ে চললেন মণ্টেগু হাউসে। সেখানে খাদ্যমন্ত্রী স্ট্রেসি সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হলো অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উপহার—খাদ্যসামগ্রী। মন্ত্রীমহোদয় সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন উপহার।

পরের অনুষ্ঠান সেণ্ট পলস গির্জায়। রাজা ও রানীর বিবাহ-বার্ষিকীর রজতজয়ন্তী উৎসব। টিকেট ছিলো আমাদের, স্ট্রেসি সাহেব তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন আমাদের।

গির্জার বেশ কিছু দূর থেকেই নজর পড়লো শুধু মানুষের মাথা।

গাড়ি আর এগোয় না। স্ট্রেসি সাহেব এক পুলিসের সাহায্য নিলেন—ফল হলো আরও চমৎকার—আমরা আর স্ট্রেসি-দম্পতি রাস্তার মাঝে পড়লাম, দু ধারে সঙ্গীনধারী সান্ত্রীর মেলা। অস্বস্তি বাড়লো—কিছু লোক আমাকে চিনে ফেলে তাদের উল্লাস প্রকাশ করছিলো থেকে থেকে। কিন্তু মূল অনুষ্ঠান? ভোলার নয়। কতদিন বাঁচবো জানি না, কিন্তু আজও প্রায় প্রতিদিনই আমার কানে বাজে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-সঙ্গীতের রেশ—'গড সেভ দ্য কিং।' গির্জার অরগ্যান আর রাজকীয় সিঙ্গাদারদের মিলিত বাদ্যভাণ্ডের মূর্ছনা আজও অমৃত বর্ষে চলেছে কানে।

সেদিন অনুশীলনের মধ্যেও বার বার মনটা উধাও হয়েছে সেণ্ট পলসে। সেদিন রাতেও এক অবিস্মরণীয় ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিলো, আয়োজক লণ্ডনের লর্ড মেয়র। ম্যানসন হাউসের সেই অনুষ্ঠানে চোখ ঝলসে গেলো লণ্ডনের সোনার স্তূপ দেখে। বের করে দেখানো হলো সেগুলো আমাদের। অনুষ্ঠানের মধ্যেই এক ভদ্রলোক প্রস্তাব দিলেন, 'মিঃ ব্র্যাডম্যান, আপনি এই খাদ্য-তালিকাটিতে আপনার সই দিলে আমি আপনার নির্দেশিত যে কোনো সাহায্য-প্রতিষ্ঠানে পঁচিশ পাউণ্ড দান করতে রাজি আছি।'

এতোদিন তো জেনেছি অটোগ্রাফ নেবার ব্যাপারটা অধিকারগত

তাই তাঁর প্রস্তাবটা রহস্যের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। যাই হোক প্রস্তাব গ্রহণ করলাম—নাম করলাম স্প্যাস্টিক সেণ্টারের। এটা এডিলেডের বিকলাঙ্গ শিশু-হাসপাতালের অঙ্গীভূত। আমার মেয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে এঁদের কাছে ঋণী ছিলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার। পরের দিন সেখান থেকে প্রাপ্তি-রসিদ পৌঁছলো আমার কাছে।

আর একজন সমাজসেবীর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পরে লর্ডসের এক খেলাশেষে একটা খাম পেলাম, তাতে দশ পাউণ্ডের একটা চেক। লেখা আছে, 'আনন্দদানের জন্যে ধন্যবাদ। চেকটা আপনার খুশিমতো কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিন।' এটাও গেলো এডিলেডের সেই হাসপাতালে।

ইংল্যাণ্ডে উদারহৃদয় এমন অজস্র মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে এগিয়ে আসেন পরোপকারের মহান সদিচ্ছা নিয়ে, অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যহীনদের সাহায্যেও।

কিন্তু নেপথ্যে কি ঘটছে তা নিয়ে কি সাধারণ মানুষ ভেবেছেন কখনো? যেমন স্যাভয়তে আমি চারশো বিদগ্ধ মানুষের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে পারবো কিনা? বিনা প্রস্তুতিতে বক্তৃতা করেছিলাম মনে করেছেন কি! যদি করে থাকেন তো ভুল করেছেন, কারণ ওগুলো ক্বচিৎ হলেও গল্পের বইতেই উল্লিখিত হয়। আমি অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার মুহূর্তে বারবার এ নিয়ে ভেবেছি—বক্তৃতা করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলবো না তো? ভুল কথাটা বলে ফেলবো না তো? কিংবা পুনরাবৃত্তিদোষে দুষ্ট করবো না তো কথাগুলো?

সুবক্তা হিসেবে যাঁদের পরিচিতি আছে তাঁদের কাছে এগুলো কোনো সমস্যা নয়, কিন্তু আমি বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে অন্য যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।

তবু, যেহেতু আমি অস্ট্রেলীয় একাদশের প্রধান হিসেবে চিহ্নিত, ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে এগুলোর মোকাবিলা করতে হবেই। এই জন্যেই অদ্ভুত সব ঘটনার প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে রেখেছি, হয়তো কোথাও কোনো

সময়ে ঝাঁপি খুলে বসতে হতে পারে ভেবে। এতে কোনো লজ্জা নেই আমার।

এবার শুরু হলো অনুশীলনের শেষ অধ্যায়—প্রতি মাঠে ঘুরে ঘুরে তদারক করতে হবে প্রতিটি খেলোয়াড়ের, চলবে উপদেশ আর উৎসাহ-দানের পালা। বোলিং পালটে পালটে ব্যাটসম্যানদের খেলার সুযোগ বাড়ানো। এ ছাড়া ব্যক্তিগত ব্যাপারের অজস্রতা তো আছেই। সবার ওপর রয়েছে চিঠির তাড়া। এমনিতেই ভারী তাড়া ছিলোই, তারপর দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধান—আর প্রচারের কৃপা। রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত বসে উত্তর দেওয়া চললো। শেষ হলো না—ওরস্টার রওনা হলাম বাসভর্তি না-পড়া চিঠির বোঝা নিয়ে।

ট্রেনের তিনটে ঘণ্টা—লণ্ডন থেকে ওরস্টার চললো চিঠি পড়া। খাবার টেবলে বসার আগে আরো একটা ঘণ্টা, দলের একজন সাহায্য করতে লাগলেন—তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর দু' ঘণ্টা! শুধু পড়া!

অধিকাংশই সই-চাওয়া চিঠি, কিন্তু তারই মধ্যে আছে নিমন্ত্রণের বার্তা, অবিলম্বে উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে সেগুলো।

সই করেছি। জাহাজেই পাঁচ হাজার, এক সপ্তাহের খোরাক। অনুরোধের বন্যা বইলো—বই, ব্যাট, ছবি—সব রকমই এলো, তবে—প্রায় ক্ষেত্রেই ফেরত ডাকটিকিট ছাড়া।

সফরের প্রায় সমস্ত সময়টায় গড়ে একশো চিঠি পেয়েছি দিনে, তাহলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বুঝুন।

ওরস্টারে এসেছিলেন স্থানীয় মানীরা, গাড়িতে চললাম হোটেলে। পথে এক মহিলা গাড়ি থামিয়ে ফুলের তোড়া গুঁজে দিলেন গাড়ির মধ্যে। না, তোড়া নয়—ফুলের তৈরী ক্রিকেট ব্যাট। সাদা আর সবুজের সমারোহ। এ দুটো রঙই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পতাকার। 'ডন' কথাটাও লেখা ফুলে ফুলে।

প্রস্তুতি তো শেষ—আমরাও ওরস্টারের মাটিতে।

ক্রিকেট শুরু এবার।

উনিশশো আটত্রিশের ইংল্যাণ্ড সফরের প্রত্যেকটি খেলাতেই আমি টসে 'টেল' ডেকেছি, অবশ্য টেস্টের খেলাগুলো ছাড়া। এখন ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর মনে হয়, কারণ টেস্টের খেলাগুলোয় উল্টো ডাক দিই যেহেতু মফস্বলের খেলাগুলোয় সাফল্য পেয়েছি আগে।

কিন্তু উনিশশো আটত্রিশের প্রত্যেকটি টেস্টের টসে হেরেছি।

এ অভিজ্ঞতা থেকে আবার 'হেড' ডাকা শুরু করলাম আটচল্লিশের টেস্টগুলোতে। শুধু তাই নয়, অন্য খেলাগুলোতেও তাই করলাম। ওরস্টারের খেলায় হারলাম টসে, আর ভয়ও পেয়ে গেলাম—চার্লি পামারের খেলা দেখে মনে হলো সে লাঞ্চের আগেই শতখানেক তুলে বসবে।

ওর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছে দেশের মানুষে, এবং এই জনপ্রিয়তার সুযোগে এম. সি. সি.-র সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার দলে স্থান পেলো সে।

আমাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ভালো ব্যাটিং দেখা গেছে কিন্তু মারের এমন সুন্দর প্রদর্শনী শুধু সেই বিদ্যালয় শিক্ষকের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিলো।

এই উদ্বোধনী খেলায় আমি এক নতুন অভিযানে নামলাম, যেটা রে লিণ্ডওয়ালের আগামী সাফল্যের পথনির্দেশক হয়েছিলো। ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের ইংল্যাণ্ড সফরে লিণ্ডওয়ালের বিরুদ্ধে এক কানাকানি অভিযান শুরু হলো—সে নাকি লাইন পেরিয়ে বল দেয়।

সমালোচকেরা এ ধরনের বলকে 'নো-বল' বলে নাকচ করার দাবী রাখলেন। জানি না কে এটা প্রথম শুরু করেন। আমি নিশ্চিত ইংরেজরা এ ব্যাপারটা গোপনে রাখেননি। ওঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন ফাস্ট বোলিং তাঁদের না-পছন্দ। লিণ্ডওয়ালের এই ফালতু গতি রোখা গেলে ওঁদের সুবিধে বাড়বে এ মনোভাবও প্রকাশিত হলো। যাই হোক, অস্ট্রেলিয়া ছাড়বার আগে লিণ্ডওয়ালের বল দেওয়ার একটা চলচ্চিত্রও নেওয়া ছিলো। এডিলেডে সেই সময় আমি ছিলাম, দেখেওছি সেটা।

ধরা পড়লো, বল দেবার সময় লিগুওয়ালের পেছনের পা-ও বোলিং ক্রিজ ছাড়িয়ে যায়, এবং বল হাতছাড়া হবার আগেই। এই জন্যেই তাকে অনেকটা দৌড়তে হতো না। ভাগ্যক্রমে, একই ফিলমে দেখা গেলো লারউডও সেই অপরাধে অপরাধী। অবশ্য ততোটা নয় যদিও।

এই চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই আমাদের আগেই ইংল্যাণ্ড রওনা হয়ে যাবে—দেখানোও হবে সেখানে। ইংরেজ আম্পায়ারদের প্রভাবিত করার কাজেও লাগানো হবে।

এই পদ্ধতি কিন্তু আমার মতে নির্ভুল নয়, কারণ সমস্ত ব্যাপারটা বেশ খানিকটা দূর থেকে নেওয়া হয়, আর পাশ থেকে। হাত এবং পায়ের নিখুঁত সামঞ্জস্য ধরা পড়ে এতে, কিন্তু আম্পায়ার তো বোলারের কাছে দাঁড়িয়ে, তাঁর পক্ষে হাত আর পায়ের কাজ একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়।

ক্যামেরার নিয়মে আমার মনে হয় প্রতি দশজনের একজন ফাস্ট বোলার সঠিক বল দিতে পারবেন, যদি তিনি বল দেবার মুহূর্তে বোলিং ক্রিজের ঠিক পেছনে পা রাখেন। তাঁর দৌড়নো এবং শারীরিক আন্দোলন তাঁকে লাইনের বাইরে নিয়ে আসতে বাধ্য, বল ছাড়ার আগে। আমার মতে, পা যদি লাইনের আগে থাকে তাহলে আইনের ছাড়পত্র পাওয়া উচিত। লিগুওয়াল যদি সফরের গোড়াতেই 'নো-বলে'র গ্যাঁড়াকলে পড়ে যান তাহলে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হবে ভেবে উদ্বিগ্ন হলাম। যে সব আম্পায়ার তাঁকে দেখেননি তাঁদের প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করলাম। এ সম্পর্কে তাঁদের কেউ কিছু পড়ে থাকলে হয়তো পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হতে পারেন। এ কথা মনে রেখে আমি তাঁকে দুটো ব্যাপারে নিশ্চিত হতে রাজী করালাম:

(ক) পেছনের পা ক্রিজের যথেষ্ট ভেতরে রাখতে, এবং

(খ) বেশ কয়েকটা খেলা প্লেয়ার না করে ফাস্ট বল না করতে, বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক চেস্টারের তীক্ষ্ণ চোখ এড়িয়ে।

প্রথম খেলায় আম্পায়ার ছিলেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ফ্রেড রুট আর ডি. ডেভিস। ওঁরা খুব মনোযোগের সঙ্গে লিগুওয়ালকে দেখলেন, সন্তুষ্টও হলেন মনে হলো। একটা ফাঁড়া তো কাটলো। খেলা

চলতে লাগলো। লিগুওয়াল একটু স্বস্তি পেলো, কারণ ওর পক্ষে যেমন বল করার ব্যাপারে অসুবিধে—অন্যদিকে আম্পায়ারদেরও একই সময়ে হাত আর পায়ের কাজ দেখারও অসুবিধে হচ্ছিলো, তাই একটা মাঝামাঝি রফা হলো—লিগুওয়ালকে বারো ইঞ্চি ছাড় দেওয়া হলো।

লিগুওয়াল ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে 'নো-বলে'র রায়গুলো আমি যথার্থ বলে মেনে নিতে পারিনি। আমাদের ধারণা হলো কোনো আম্পায়ারের চোখে একটা 'নো-বলে'র নজির এড়িয়ে গেলে পরের বলে সেটার ঘাটতি তোলার প্রবণতা আছে। অস্ট্রেলিয়াতেও এটা লক্ষ্য করেছি।

এটা আমার কল্পনা হতে পারে কিন্তু সত্যিও হতে পারে ব্যাপারটা। কোনো আম্পায়ারের চোখে একটা 'নো-বলে'র ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে সেটার দায় পরের বলে চাপানো উচিত নয়।

যাই হোক লিগুওয়াল এতে উপকৃত হয়েছে, আম্পায়াররাও। এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে, খেলোয়াড়দের বল দেওয়ার ভঙ্গিও ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে তাঁদের।

অন্যান্য বারের মতো এবারও ওরস্টারের সঙ্গে খেলার প্রথম দিনের শেষে ডিনারের আয়োজন। সভাপতি লর্ড কবহ্যাম আমাদের শারীরিক অবসাদের কথা চিন্তা করে বক্তৃতার বাহুল্য রাখলেন না।

খেলা যতোই এগিয়ে চললো, আমার মনে হলো—আমাদের ছেলেদের অনুশীলনে ফাঁক থেকে গেছে। তবু, ওরা খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করেছে এবং আর্থার মরিস প্রথম ব্যাট হিসেবে নেমেও সেঞ্চুরী করলো।

এই ওরস্টারের মাঠেই আমি ডবল সেঞ্চুরী করি উনিশশো তিরিশে, চৌত্রিশে, আবার আটত্রিশের সফরগুলোতে। প্রশ্ন উঠলো—আর একবার করতে পারবো কি? সত্যি বলতে কি, হয়তো পারতামও—কিন্তু করিনি। কারণ দলে অনেকগুলো নতুন ছেলে ছিলো। ইংল্যাণ্ডের মাঠে ওদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর কথা মনে রেখে ছেড়ে দিলাম। আমার শরীর ভালোই ছিলো, শুধু ব্যথাটা তখনো যায়নি। এসবও চিন্তা করেছি।

খেলায় অবশ্য জিতলাম। কিন্তু জ্যাকসন অপূর্ব অফ-স্পিন করে প্রমাণ করলো ইংল্যাণ্ডের মাঠ 'স্পিন' বোলারদের স্বর্গ। আমি যেন মানসচোখে

দেখছি আজও—কলিন ম্যাককুলের 'লেগ' স্টাম্প উড়ে যাচ্ছে তার বলে।
কলিন ব্যাটই চালায়নি।

লিস্টারের সঙ্গে পড়লো পরের খেলা। প্রচণ্ড শীতে খেলা হলেও কিথ মিলার দুশোর ওপর রান করলো, অপরাজিত থেকে। ওই অবস্থায়ই ইয়ান জনসন আর রিং অসাধারণ বল করেছিলো। জয়ের পথ ওরাই সুগম করেছে। সিডনির দুটো ছেলে ওয়ালস আর জ্যাকসনও প্রশংসা পেয়েছে। এরা দুজনই লিস্টারের নিয়মিত খেলোয়াড় এখন। জ্যাকসনের 'অফ-স্পিনে'র জবাব নেই। মেলা রানও করে সে। ওয়ালসের ক্লিটউড-স্মিথ'-মার্কা ন্যাটা হাতের গুগলি আরো ভীতিকর। প্রচুর উইকেটের অধিকারী হয়েছে সে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরাও তাঁর বোলিংয়ের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সবই ভালো চলতে থাকলো। কাজেই ব্র্যাডফোর্ডে ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে খেলায় বিশ্রাম নেবো ঠিক করলাম। পরেই আবার খেলার কথা ছিলো ওদের সঙ্গে।

মাঠে উপস্থিত ছিলাম না, কাজেই শোনা কথার ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে। শুনলাম যে ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়েছিলো। স্যাঁতসেঁতে মাঠে 'স্পিনে'র কাজ ভালোই হলো। মিলার আর জনস্টন জুটিই আক্রমণের পুরোভাগে ছিলো। জনস্টন প্রমাণ করলো যে তার শুকনো মাঠের 'স্পিন' 'ফাস্ট মিডিয়ামে'র চেয়ে কম যায় না।

লক্সটন পায়ের পেশীতে চোট পাওয়ায় খেলায় ক্ষতি হলো। ব্যাট করতে পারেনি সে। অস্ট্রেলিয়ার একজন ব্যাটসম্যান আর একজন বোলার কমে গেলো। খেলায় এর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য।

আমাদের 'বাচ্চা' নীল হার্ভে ইয়র্কশায়ারের লোকগুলোকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিলো, ছটা উইকেট নিয়ে। এতোটা নিশ্চয়ই আশা করেনি তারা।

ইয়র্কশায়ার কোনোদিনই কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপের সম্ভাব্য বিজেতা বলে গণ্য হয়নি, কিন্তু, তবু—ওদের হারাতে বেগ পেতে হয়েছে। ভালো দলের সঙ্গে যোঝার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ইয়র্কশায়ারের এবং স্থানীয়

মানুষ যে অহংকার করে তাদের দল ইংল্যাণ্ডের নির্বাচিত একাদশের মোকাবিলাতেও পেছপা নয়, তারও একটা মানে পাওয়া যায়।

অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফিরলো এই খেলা থেকে। সফরের প্রথম দিকেই মফস্বল দলের এই দৃঢ়তা উপকারই করেছে আমাদের। অন্ততঃ আত্মপ্রসাদের রাস্তাটি মেরে দেয়। আমাদের দল আরো উত্তরে গেলো খেলতে, আমি লণ্ডনে আছি। এমনি সময়ের এক রোমাঞ্চকর সন্ধ্যার কথা বলবো। আমার এক বন্ধু স্যাভয়তে নিমন্ত্রণ করলেন ডিনারে। তাঁর পরিবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বিখ্যাত বাদক ক্যারল গিবন্স কয়েক হাত মাত্র দূরে বসে, তাঁর 'স্যাভয় অরফিয়ানস'দের নিয়ে বাজাচ্ছেন।

পিয়ানো-বাদক গিবনসের আমি একজন অকৃত্রিম গুণগ্রাহী। কিন্তু এতো কাছে বসে স্বকর্ণে শোনা এই প্রথম। উনি আমাকে বিশ্রামের ঘরে নিয়ে তাঁর দলের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এ ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত অ-ক্রিকেটীয় অভিজ্ঞতার সুযোগ কমই হয়, কারণ সব সময়েই তো ব্যস্ত আমরা।

সারের বিপক্ষে পরের খেলায় নামলাম। 'ওভাল' যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো, তারই স্বাক্ষর চতুর্দিকে ছড়িয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার পিচের অবস্থা আটত্রিশ সালের চেয়ে উন্নতই মনে হলো।

সারের সম্পাদক ব্রায়ান ক্যাস্টরের দেখা পেয়ে বড় আনন্দ হলো, ওঁকে দেখে মনে হলো না জাপানী বন্দীশিবিরে বেশ কয়েকটা অস্বচ্ছন্দ বছর কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কোনো মানসিক বা শারীরিক বিকৃতি নেই। ঘটনাক্রমে আমাদের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক বেন বারনেটও তাঁর সঙ্গে ছিলেন সেখানে। বারনেটও মোটামুটি সুস্থাবস্থাতেই ফিরেছিলেন।

মিষ্টি ব্যক্তিত্বের এই ছেলেটি আমার দেখা অপেশাদার যাদুকরদের অন্যতম।

এবার অ্যালেক বেডসারের কথা বলি। স্বদেশের মাটিতে ভদ্রলোক কেমন বল করেন দেখবার প্রবল আগ্রহ ছিলো। অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে বেডসার আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন, মনে হয়েছে

নিজেদের মাটিতে আরো ভালো খেলা দেখাবেন। আমি সেঞ্চুরী করেও তাঁর হাতেই উইকেট হারিয়েছিলাম। বলটা লেগ-স্টাম্পে লেগে 'অফে'ও ঠেকলো—সাতচল্লিশে এডিলেডে ঠিক এই রকম বলেই আমি আউট হয়েছিলাম তাঁর হাতেই, শূন্য রানে।

সেই ইনিংসেই হ্যাসেটও সেঞ্চুরী করে, মনের আনন্দে খেলে ওর বলেই আউট হন। তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে—বেডসারকে সমীহ করে খেলা দরকার।

আমাদের ভাগ্য ভালো, মাঠের দ্রুত অবনতি ঘটলো এবং সারের ব্যাটসম্যানরা আমাদের 'স্পিন' বলে নাজেহাল হতে লাগলো। ব্যতিক্রম শুধু লরি ফিশলক, চুটিয়ে ব্যাট চালিয়ে গেলেন। তাঁর কতকগুলো মিড অফের মার সত্যিই মারাত্মক। সারাটা মরসুম ফিশলককে খেলতে দিয়ে বিচারবোধেরই পরিচয় দিয়েছিলেন নির্বাচকগোষ্ঠী।

খেলা শেষের কুড়ি মিনিট থাকতে অস্ট্রেলিয়া জিতলো সে খেলা। তার মধ্যেই নীল হার্ভে একটা 'আউট-ফিল্ড' ক্যাচ নিয়েছিলো, এমনটা আর দেখিনি জীবনে। বলটা নিশ্চিত ছক্কার মার ছিলো, কিন্তু নীল দৌড়ে মাথার বেশ কিছুটা ওপরেই লুফেছিলো ক্যাচটা। বলটা দড়ির বেশ খানিকটা ওপর দিয়ে চলে যেতো না হলে। অনেকটা সময় নিয়েছিলো সবার ব্যাপারটা বুঝতে—কারণ এটা অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর।

আরও দুটো ডিনারের নিমন্ত্রণ জুটলো। প্রথমটার উদ্যোক্তা সারে প্রাদেশিক ক্রিকেট সংস্থা। লর্ড রোজবেরী সভাপতির আসনে ছিলেন। দিনটা আবার সংস্থার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক মিঃ লেভেসন-গাওয়ারের ৭৫তম জন্মদিনের সঙ্গে মিলে গেলো। ভদ্রলোক নানা উপহার পেলেন সবার কাছ থেকে। তাঁর বক্তৃতায় 'সর্বোচ্চ আম্পায়ারে'র (ভগবানের) কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিলেন, দীর্ঘ জীবনলাভের জন্যে। অন্যটা হলো হাউস অফ কমন্সের হারকোর্ট রুমে। এখানে সভাপতিত্ব করে স্যর স্ট্যানলি হোমস। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি উপস্থিত থেকে আমাদের স্বাস্থ্য কামনা করেছেন, এজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। এর পরের দুটো খেলা পড়লো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। আমি বিশ্রাম

নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির খেলার যথেষ্ট অবনতি লক্ষ্য করেছি, কারণ এর আগে কখনো খেলা জিতবোই এ কথা জোর গলায় বলতে পারিনি। কেন, জানি না—কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে এটা স্বাস্থ্যকর নয় নিশ্চয়ই।

কেমব্রিজের খেলা পড়লো প্রথমে। আমি লণ্ডনে থেকে গেলাম, কিছু কাজও সারলাম এই ফাঁকে। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের পরিচালকমণ্ডলী আর লর্ড ম্যাকগাওয়ান এক ভোজসভায় ডেকেছিলেন আমাকে। সেখানে নানা রসের কথাবার্তা হলো, তারই একটা মনে পড়ছে। বলেছিলেন মিঃ এ. ভি. অ্যালেকজাণ্ডার। গল্পটা শ্বশুর আর হবু জামাইয়ের। শ্বশুর প্রশ্ন রাখলেন, 'বাবা, তোমার সঙ্কল্প কি? মোটামুটি মর্যাদাসূচক কিছু তো, না কি?' কি বলছে না বলছে, না ভেবেই জামাই জানালো, 'স্যর, জানতাম না আমাকে এ সম্বন্ধে আদৌ কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে!'

লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান আর কমিটির সঙ্গে ভোজে ডাক পড়লো। সর্বনাশ! ওখানে অফিসেই ক্রিকেটের পিচ পড়েছে! অনুষঙ্গও রয়েছে সব, সদস্যদের একজন ডব্লিউ. জি. হয়ে লড়তে নামছেন আমার সঙ্গে।

মজা হলো এই যে বোলারের দিকে হুইস্কি আর সোডা চললো। গ্রেস সাহেবের যুগে চলতো বোধহয় এটা, জানি না—আজ এর কোনো চল নেই জানি।

যাই হোক আমিও অনুষ্ঠানের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম, বলটা পিটিয়ে দিলাম বাড়ির এমন এক কোণে, যেখান থেকে, যতদূর মনে পড়ছে, বলটা আর ফেরেনি।

ব্রিটিশ শিল্পমেলায় হাজির হলাম একদিন এরপর। কিন্তু যাত্রায় অনেকটা সময় চলে যাওয়ায় মেলাটা ভালো করে দেখা হলো না। লণ্ডন প্রবাসেই জানলাম কেমব্রিজের বিপর্যয়-বার্তা। স্কটল্যাণ্ডে এসেক্সের সঙ্গে পরের খেলা। সুন্দর নীল আকাশ ওপরে, নীচে পিচের অবস্থানও অনুকূল —খেলা তো নয়, যেন পিকনিক! একদিনের ব্যাটিংয়েই অস্ট্রেলিয়ার রান উঠলো সাতশো একুশ। প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসে এটাই সম্ভবতঃ বিশ্ব-রেকর্ড। সমস্ত ব্যাপারটাই আজগুবি মনে হয় আজ।

একের পর এক রুদ্ধশ্বাস দ্রুততায় রান করে চলেছে আমাদের ছেলেরা। ফিল্ডিংয়ের মানুষগুলো যেন পাথর। তবু দেখুন, যে লোকটা রানের হল্লা তুলতে পারতো সেই কিথ মিলারকে শূন্যহাতে শিবিরে ফিরে যেতে হয়েছে।

কেউ বলবেন ওদের আক্রমণভাগ দুর্বল, আবার কেউ যুক্তি দেবেন খেলা আমাদের অনুকূলে ছিলো। কিন্তু, মাঠ অন্যান্য মাঠের তুলনায় বরং বড়ই ছিলো, তাছাড়া ওদের নেতৃত্ব করছিলেন টম পিয়ারস—অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। চারজন বোলারের মধ্যে ট্রেভার বেইলি ছিলো কেমব্রিজের সর্বোত্তম বোলার এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতিশ্রুতিবান ফাস্ট মিডিয়াম বোলারদেরও একজন। উনপঞ্চাশে ইংল্যাণ্ডের হয়ে খেলেছিলো ট্রেভার। দ্বিতীয়জন রে স্মিথ—এও ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, লেগে ইন-সুইংয়ের যম। ওর বলে রান তোলা খুব সোজা ছিলো না।

পিটার স্মিথকে (উনিশশো ছেচল্লিশের শ্রেষ্ঠ পাঁচজনের একজন—উইসডেনের বিচারে) অস্ট্রেলিয়াতে পাঠানো হয়েছিলো ছেচল্লিশ-সাত-চল্লিশের মরসুমে। ইংল্যাণ্ডের 'স্লো' বোলার তালিকার দু নম্বরে নাম ছিলো পিটারের, আর ছিলো প্রাইস—ন্যাটা বোলার। আগে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছে এবং বোলিং গড়ে যার নাম সবার ওপরে ছিলো। প্রাইস ইংল্যাণ্ডের টেস্ট নির্বাচনীতে সদস্য হিসেবে ছিলো, সেই বছরেই।

এইবারই আমার প্রথম মনে হলো, আমার দল অসাধারণ ব্যাটিংয়ের অধিকারী হতে পেরেছে। যে কোনো বোলিং চাবকাতে পারে এমন ব্যাট।

উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বইকি। সবটুকু কৃতিত্বই নবীন অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়দের। মিনিটে দু রান করেছে এরা।

এসেক্সের দলকে একদিনে দুবার আউট করে আমরা প্রমাণ করলাম যে শুধু ব্যাটের কায়দা-সর্বস্ব দল আমরা নই।

লণ্ডনে ফিরে গ্রসভেনার হাউসে নিমন্ত্রণ পেলাম—খানা স্যর নরম্যান আর লেডী ব্রুক্সের সঙ্গে।

লিফ্‌টে যখন খাবার ঘরের দিকে উঠছি এক কেচ্ছা হলো—মাঝপথে লিফট গেলো বিগড়ে। সশব্দে নেমে আসতে হলো একতলায়। অস্ট্রেলিয়ার

হাই-কমিশনার বিসলে সাহেবও সস্ত্রীক ছিলেন লিফ্‌টে। কারুর আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি, এই রক্ষে।

তবু, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, নয় কি?

অক্সফোর্ডের সঙ্গে খেলাতেও তেমন উদ্বেগ ছিলো না, কিন্তু লর্ডসে এম. সি. সি.-র সঙ্গে খেলাতেই শক্তি যাচাইয়ের প্রথম সুযোগ হলো। টসে জেতার পর কোনো খেলায় যদি আমরা কোনো সুবিধে পেয়ে থাকি, তো এই খেলাতেই পেয়েছি। পিচ ভালোই ছিলো এবং ইয়ার্ডলে রান না তুলতে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও হাল ছেড়ে দিলো। হুড়হুড় করে রান বেড়ে চললো—মিলার সেঞ্চুরী করলো, আমি আটানব্বই। বারনেস আর হ্যাসেটও ভালো রান করেছিলো।

সপ্তাহশেষে বৃষ্টি নামলো এবং তাতে পিচ সঙ্গে সঙ্গে খেলার অনুপযুক্ত না হলেও ধীরে ধীরে খারাপ হতে লাগলো। এবার ভাগ্য আমাদেরই পক্ষে।

তা, সোমবার সকালে নেমেই আমাদের ছেলেদের রান বাড়াতে বললাম। লর্ডসের দর্শকদের কাছে এ এক অভিনব দৃশ্য—মিলার, লিণ্ডওয়াল আর জনসন মিলে চুটিয়ে ব্যাট করতে শুরু করলো। লাঞ্চের আগেই অন্ততঃ বারোটা ছক্কা গিয়ে পড়লো দর্শকদের মধ্যে।

বিকেলে টশ্যাক তার অনবদ্য বোলিং দেখালো—সফরের শ্রেষ্ঠতম। দুটো পনেরো থেকে পাঁচটা কুড়ি পর্যন্ত একদিকের বোলিং চালিয়ে সাতাশ ওভারে একান্ন রান দিলো, ছটা উইকেটের বিনিময়ে। কম্পটন আর টশ্যাকের ব্যাটবলের লড়াই দর্শকদের হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দিলো, এ বলে আমায় দেখ্…।

জয় হলো টশ্যাকেরই শেষে। সে খেলায় ট্যালন এক অনবদ্য ক্যাচও নিয়েছিলো।

'ফলো-অন' করালাম, পরের দিনও লাঞ্চের আগে আবার আউট করলাম ওদের। আস্থা বেড়ে গেলো নিজেদের ওপর—এবার যে কোনো দলের মোকাবিলা করতে পারি আমরা।

এবার ল্যাঙ্কাশায়ারের মোকাবিলা, আবহাওয়ার শত্রুতায় আমাদের

রীতিমতো অসুবিধে হলো এই খেলায়। প্রথম দিন বৃষ্টি নেমে খেলা বাতিল হলো। দ্বিতীয় দিনে ওদের অধিনায়ক কেন্ ক্র্যানসটন টসে জিতে নির্দ্বিধায় আমাদের হাতে ব্যাট তুলে দিলো। অনেক পরিশ্রম করে ওই ভেজা মাঠে দুশো চার রান উঠলো।

পরে ওদের আরো কম রানে ফেলে দিলেও খেলার মীমাংসা হলো না। এই খেলায় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমার আউট হওয়া। দুটো ইনিংসেই হিলটন তার প্রথম খেলায় আমাকে বসিয়ে দিলো। উনিশ বছরের এই স্যাটা 'স্পিন' বোলারটি নিখুঁত বল করেছে। মাথাও খাটিয়েছে যথেষ্ট।

কাগজওলারা কিন্তু ছেলেটার কৃতিত্বটাকে বড় করে দেখলো না, আমাকে নিয়ে পড়লো তারা। কয়েকটা পত্রিকা অবশ্য তার টেস্টে অবিলম্বে অন্তর্ভুক্তি সুপারিশ করলো। ভাল প্রচার হলো হিলটনের।

এ ধরনের ঘটনাগুলোতে, আমার মতে, কাগজওলাদের সঠিক সংবাদ পরিবেশন করাটাই যুক্তিবহ হবে।

হিলটনের খেলার কায়দা অনেকটা ছিলো হেড্‌লে ভেরিটি ধরনের, অর্থাৎ যে মাঠ বোলারদের সম্পূর্ণ উপযোগী সেই দলের। ভালো ব্যাটিংয়ের উপযোগী মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার মতো অনভিজ্ঞ আর অল্প বয়সের ছেলেকে ঠেলে দেওয়া উচিত হয়নি।

তবু, দারুণ খেলেছে ছেলেটা এবং তার প্রতিভা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতেও সুযোগ করে দেওয়াই হতো বুদ্ধিমানের কাজ।

হিলটন কেন যে সেই মরসুমেই ল্যাঙ্কাশায়ার দল থেকে বাদ পড়েছিলো তা আমার কাছে আজও রহস্য।

ইংল্যাণ্ডের বৈশিষ্ট্যই হলো—কোনো তরুণ খেলোয়াড়কে খ্যাতিমান হতে গেলে অনেক কঠিন রাস্তা হাঁটতে হবে তাকে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের অধ্যায়ে ছেদ টানার আগে দুটি তরুণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়, তারা হলো নীল হার্ভে আর স্যাম লক্সটন। প্রভূত উন্নতি করেছে এরা কালে। লক্সটনের অবশ্য পায়ের দোষ ছিলো। হার্ভের অসুবিধে পরিবর্তনশীল উইকেটে খেলার। অবশ্য এটা কাটিয়ে উঠেছে সে পরে।

পরের খেলা পড়লো নটিংহ্যামের সঙ্গে। ওরা শুরু করলো খেলা,

হার্ডস্টাফ আর সিম্পসনকে ব্যাট করতে দিয়ে, মনে হলো অনেক রান উঠবে। কিন্তু লেগের প্রথম বলেই ক্যাচ উঠলো হার্ডস্টাফের। উইকেট-রক্ষক তৈরীই ছিলো। শুরু হলো বিপর্যয়—লিগুওয়াল পনেরো ওভারে চোদ্দ রানে ছটা উইকেট নিয়ে নিলো। বাহাদুর ছেলে।

সফরের এই পর্যায়ে এক মজার চিঠি পেলাম। ভদ্রলোক লিখেছেন, 'আমার এক কাকা—ব্রাউন, উনিশশো সাত সালে অস্ট্রেলিয়া রওনা হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ সিডনি বা মেলবোর্ণ ছিলো তাঁর গন্তব্য। খামার করার ইচ্ছে ছিলো তাঁর।' প্রশ্ন ছিলো—উনি কি খামার করতে পেরেছিলেন এবং করে থাকলে উন্নতি করেছেন কি না।

কত বিদঘুটে মানুষই না আছে পৃথিবীতে।

খেলার মাঝের রবিবারটা খুব আনন্দের মধ্যেই কাটলো। ওয়েলবেক্ মঠে পোর্টল্যাণ্ডের ডিউক আর ডাচেস আমাদের ভোজে আপ্যায়িত করলেন। এই জায়গাটা সম্পর্কে আমার দুর্বলতা ছিলো, কারণ উনিশশো চৌত্রিশের সফরে আমি সস্ত্রীক এখানে ছিলাম—তখন ডিউক ছিলেন বর্তমান ডিউকের পিতৃদেব। আলোচনা প্রসঙ্গে ডিউক জানালেন যে এই ব্যয়বহুল মঠের পরিচর্যা করা তাঁর ছেলের পক্ষে সম্ভব নয় তাই অপেক্ষাকৃত ছোট একটা মঠ তৈরী করিয়ে রেখেছেন যাতে ছেলের অসুবিধে না হয়। আর, আজ উনিশশো আটচল্লিশে স্বচক্ষেই তো দেখছি পটবদল। পুরনো মঠ আজ মিলিটারীর দখলে। খাবার ঘরের দেওয়ালে রেমব্র্যাণ্ডটয়ের ছবির জায়গা নিয়েছে মানচিত্র। সামরিক অফিসারদের মেস—মেঝেয় নারকোল দড়ির পাপোশ পাতা। বাগানের সমারোহ আজ আগাছার ঝোপ। একটা অংশ শুধু অপরিবর্তিত—যেখানে দিন কাটাচ্ছেন ডিউকের বিধবা পত্নী। ঘুরে ঘুরে তিনি আমাকে দেখালেন সব। দেখলাম—ডি লাজলো আর সারজেন্টের আঁকা তাঁরই প্রতিচ্ছবি,—যৌবনের।

বয়সেও লাবণ্যের ঘাটতি নেই মুখে, বুদ্ধির দীপ্তি অম্লান।

অনেক ভাবিয়েছে আমাকে এই পরিবর্তন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই এর কারণ যদিও, তবু, ইংরেজ ঐতিহ্যের অভাব ক্ষেত্রবিশেষে বেদনাদায়ক। তীব্র অনুশোচনা অনুভব করেছি।

বিকেলে বেড়াতে গেলাম শেরউড বনের দিকে—এখানেও সেই পরিবর্তনের ছবি। বেড়ানোর সময়ে এক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটলো। আমাদের গাড়িটা একটা লজের গেটে থামলো। অনেকক্ষণ হর্ন দেবার পরও কোনো সাড়া না পেয়ে ডিউক নিজেই নামলেন। ডিউক ভেতরে ঢুকতে আমাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। তত্ত্বাবধায়কের আজ দিনটা খারাপ যাবে। খানিক পরে দেখা গেলো এক বৃদ্ধকে, লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে গেট খুললো সে। ডিউক গাড়িতে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছিলো ব্যাপারটা। তাঁর উত্তরে বাসসুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়েছিলো। ডিউক লোকটাকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, 'কি হে, গেট খোলবার কি হবে?' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এসেছিলো, 'আমার জানলার একটা ভাঙা কাঁচ পালটানোর কি হলো—ওটা তো আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

ডিউক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি বোঝা গেলো।

স্মরণীয় দিনই বটে!

নটিংহ্যামের সঙ্গে খেলাটা শেষ হলো মঙ্গলবারে। জো হার্ডস্টাফ দারুণ সেঞ্চুরী করলো একটা। আমাদের বিরুদ্ধে এই প্রথম সেঞ্চুরী। সিম্পসনও সুন্দর ব্যাটিং করলো, দুটো ইনিংসেই। আমাদের ভাবনা বাড়লো: 'এই তো ইংল্যাণ্ডের আর একজন ভাবী ব্যাট!'

আমাদেরও একটা বিপদ হলো।

টেস্টের আগে ম্যাককুলকে তৈরী করার চেষ্টা চললো, কিন্তু তার ডান হাতের মধ্যমাতে সাড় নেই। অদ্ভুত ধরনের জখম—কারণ 'স্পিন' করতে হলে ওই আঙুলের কাজই হয় সবচেয়ে বেশী। একটা 'কড়া' জাতীয় ব্যাপার হয়ে, কিছু চামড়াও ছড়ে গেছে। হয়তো তাড়াতাড়ি সারবে এটা, কিন্তু টেস্টের মধ্যে কোনো অসুবিধে দেখা দিলে তো গেছি। সফরে ক্ষত সেরেছিলো ঠিকই, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বল করলে ব্যথা হতো।

কলিনকে ধন্যবাদ, এতো অস্বস্তির মধ্যেও সে দলের ঐক্যে ফাটল ধরতে দেয়নি।

'স্পিন' বোলার মাত্রেরই এ ক্ষতের সম্মুখীন হতে হয়, কাজেই গবেষণার বিষয় এটা।

হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে পরের খেলায় আবার বিশ্রাম গেলাম। লণ্ডনের উপকণ্ঠে নির্ভাবনায় ছিলাম সময়টা, কারণ হ্যাম্পশায়ার কোনো ভীতিজনক প্রতিপক্ষ বলে মনে হয়নি আমার।

দিনের শেষে যখন খবর নিলাম খেলার, বিস্মিত হলাম।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কানে আসতে মনটা চলে গেলো ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে খেলার দিনে।

শেষে হারার অবস্থা দেখা দিতে হ্যাসেটকে তার করে দিলাম, 'ব্রাডফোর্ডেও মাঠের অবস্থা খারাপ ছিলো, কিন্তু এ তো সহ্য করা যায় না।'

শেষ খেলার দিন লাঞ্চের খবর এলো ; অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে এক উইকেট হারিয়ে তিন রান করেছে। ভয় পেয়ে গেলাম। পরে স্বস্তি পেয়েছি, কারণ অস্ট্রেলিয়া শেষে জিততে পেরেছে।

ইয়ান জনসন নাকি অসাধারণ ব্যাট করেছে, জানলাম। জনসন প্রমাণ করলো যে বোলার ব্যাট ধরলেও তার মর্যাদা রাখে।

টেস্টে খেলতে নামার আগে মাত্র একটা খেলা আছে হাতে—হোভে সাসেক্সের সঙ্গে। সাসেক্সের আক্রমণভাগ খুব শক্রভাবাপন্ন ছিলো না, তবুও, আমাদের ব্যাটসম্যানদের বৃহস্পতি তুঙ্গে তখন। খুব সরল খেলা খেললো না অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা।

আর্থার মরিস শুরু করলো—সেঞ্চুরী। পরে আমি যোগ দিলাম দলে, সবশেষে নীল হার্ভে।

হার্ভে টেস্টে খেলার অধিকার পাকা করে আনছে মনে হলো।

বল করলো রে লিণ্ডওয়াল। সঙ্গে লক্সটন। পরে আবার পায়ের গোলমাল হতে প্রথম টেস্টের তালিকা থেকে বাদ পড়লো সে।

রন হ্যামেন্সের ভাগ্যটা খারাপ। আমি কেবল বিপক্ষের অধিনায়ককে ইনিংস শেষের সঙ্কেত দিতে যাচ্ছি, বেচারা এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে গেলেন ওভারের শেষ বলে।

তারপর আবার নটিংহ্যাম—ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম পর্যায়ের সাক্ষাৎকার, দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে।

ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়ামোদীরা বুঝি এরই দিন গুনেছে এতোদিন।

খুব ভেবে-চিন্তেই দল গঠনে মনোযোগ দেওয়া হলো। কি কায়দায় এগোলে জেতা যাবে তা নিয়েও শলা-পরামর্শ হলো।

ম্যাককুল আর লক্সটন খেলতে পারছে না, একজন উইকেটরক্ষক বাদ যায়। হ্যামেন্স ফর্মে নেই, হার্ভেও প্রস্তুত নয়—শেষে ডাক পড়তে বাকি দুজন—জনস্টন আর রিং।

আকাশে অশুভ মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। আর সবদিক বিবেচনা করে 'স্পিন' ছেড়ে অন্য রাস্তায় গেলাম—গতি। অবস্থা সেরকম হলে আবার জনস্টন 'স্পিনে' ফিরতে পারবে।

ভাগ্যিস এ রাস্তা নিয়েছিলাম! নরম্যান ইয়ার্ডলে টসে জিতে ব্যাটিং নিলো। বিশ্রামের ঘরে ফিরে বলেছিলাম মনে পড়ে, 'জীবনের সবচেয়ে বেশী ভাগ্যবহনকারী টসে হারলাম বোধ হয়।' এই উক্তি আনন্দের না দুঃখের প্রকাশ ছিলো মনে নেই।

নাটকীয়ভাবে ইংল্যাণ্ডের উইকেট পড়তে লাগলো। প্রথম গেলেন হাটন, মিলারের বলে। মিডল স্টাম্প গেলো একটা পুরো লেংথ বলে। প্রচণ্ড গতিশীল ছিলো বলটা।

এডরিচকেও যেতে হলো একই বলে। ঝড়ের মতো বল দিয়ে চললো জনস্টন। মিলার এবার নিলো কম্পটনের উইকেট—লেগ স্টাম্পে।

এভাবে আউট হওয়ার আরো একটা দৃষ্টান্ত বিল পনসফোর্ড। তাকেও ফাস্ট বোলিংয়ের শিকার হতে হয়েছিলো।

ওয়াশব্রুককে একটা অনবদ্য ক্যাচে আউট করলো ব্রাউন, কিন্তু তাতে আমাদের ফিল্ডিং অকলঙ্ক এ কথা কখনোই বলবো না, কারণ পরমুহূর্তেই ইয়ান জনসন একটা সহজ স্লিপের ক্যাচ ফেলে দিলো। আমি তো কেচ্ছা আরো বাড়ালাম—একই ওভারে গডক্রে ইভান্সের দুটো ক্যাচ ফেলেছি, তার মধ্যে একটা কভারের। এর সংশোধন অবশ্য পরে হয়েছে—শর্ট-লেগে ইভান্সের একটা জোরালো মারে ক্যাচ উঠলো মরিসের হাতে।

লিণ্ডওয়ালের ওপর অনেক আশা-ভরসা ছিলো, কিন্তু দেখা গেলো সেও

ভুল করছে ক্রমাগত—শেষে তো পায়ের পেশীতে টান পড়লো তার। পেছলা মাঠে পা ফসকে পড়ে তাকে মাঠ থেকে বিদায় নিতে হলো। ফলে মিলার আর জনস্টনের ওপরই চাপটা পড়লো। এই একটা খেলায় লিণ্ডওয়ালের অনুপস্থিতিতে মিলারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছি। সে অবশ্য ডোবায়নি।

উনপঞ্চাশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে মিলার বাদ পড়ার জন্যে আমাকে কেউ কেউ দায়ী করেন। বলা হলো ইংল্যাণ্ডে আমি তাকে বেশি খাটিয়ে তার সুযোগ নষ্ট করেছি।

সম্পূর্ণ বাজে কথা।

আটচল্লিশে চারশো উনত্রিশ ওভার বল করেছিলো মিলার, এর মধ্যে অনেকগুলো বলই অফব্রেকের। ছাব্বিশ বার ব্যাট করে রান করেছে এক হাজার অষ্টআশি। টেড ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে তুলনা করা যাক—আটশো চুয়ান্ন ওভার বল করেছেন তিনি। আরনি জোনস করেছেন আটশো আটষট্টি ওভার। এঁরা দুজনেই মিলারের চেয়ে অনেক দ্রুত হাতের বোলার। একটা সফরে সি. টি. বি. টারনার তো আট বলের এক হাজার দুশো পঁচানব্বই ওভার বল করেছেন। জ্যাক গ্রেগারী করেছেন ছশো একাশি ওভার, উনিশশো-একুশে। পঁয়ত্রিশ বার ব্যাট করে এক হাজার একশো একাত্তর রান।

আর্মস্ট্রং তাঁর তিনটে সফর মিলিয়ে আটশো একাশি ওভার বল করেছেন, সাতচল্লিশটা ইনিংসে রান হয়েছে এক হাজার পাঁচশো তেইশ। ফাস্ট বোলার না হয়েও তাঁর বিশাল চেহারাতেই এটা সম্ভব করেছেন আর্মস্ট্রং।

মিলারের প্রশংসা অবশ্যই করবো আমি—কিন্তু সমালোচকদেরও সৎ হওয়া উচিত। আটচল্লিশে তাকে তার ক্ষমতার বেশী খাটানো হয়নি বলেই মনে করি আমি—সত্যি বলতে কি, এক নটিংহ্যামের টেস্ট খেলাটি ছাড়া তাকে সব সময়েই সাবধানে খেলানো হয়েছে।

যাক যা বলছিলাম—নামী ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে গিয়ে রইলেন লেকার আর বেডসার। তাঁরা সুনাম অনুযায়ীই খেললেন। ছটা পনেরোতে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট শুরু করলো, ভয় আস্তে আস্তে কমলো।

টসে হার হয়েও ভাগ্য বিরূপতা করেনি।

প্যাভিলিয়ানের দিকের একটা আলোকস্তম্ভের অভাবেই ইংল্যাণ্ডের এই বিপর্যয় হলো। খেলার উপযুক্ত আলো হয়তো ছিলো, আবার অনুপযুক্তও বলা চলে, কারণ বলের গতি ধরা শক্ত হয়ে পড়েছিলো। তার ওপর এ ধরনের ফাস্ট বোলিংয়ের মুখোমুখি হবার মানসিক বা দৈহিক কোনো প্রস্তুতিও ছিলো না তাদের। মনে রাখতে হবে—শুধু একটা বল ফসকালেই কাম ফতে।

নটিংহ্যামে আবহাওয়া ভালো হওয়া সত্ত্বেও প্যাভিলিয়ানের দিকের বল দেখতে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো।

আলোর এই অসুবিধে শুধু নটিংহ্যামেই নয়, লীডস (সেখানে তো আলো একেবারেই নেই), ওভাল আর লর্ডসেও। কিছু বেশী দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পান এতে, কিছু বাড়তি টিকিটও বিক্রি হয়—কিন্তু তাতে মাথা ফাটলে বাঁচানোর উপায় নেই!

অস্ট্রেলিয়ার সব প্রথম শ্রেণীর খেলাতেই দুদিকেই আলোকস্তম্ভ থাকে। দ্বিতীয় দিনে দু-পক্ষই অনেক কায়দা-কানুন করলেও খেলা জমেনি। ইয়ার্ডলে তাঁর দলকে ড্রয়ের দিকেই নিয়ে চলেছেন বোঝা গেলো। তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করলো ইংল্যাণ্ড নতুন বল দিয়ে, এবং পরক্ষণেই বেডসার লেগ-স্লিপে আমাকে হঠাৎই ধরে ফেললো। হঠাৎ বলছি এ জন্যে যে বলটা খেলার কোনো দরকারই ছিলো না আমার। সংশোধিত লেগ ফিল্ডে নতুন কায়দায় বল—আমার একেবারেই পছন্দ নয়, তবু মারতে চেষ্টা করেছিলাম বলটা। দ্বিতীয়তঃ, বলটা এত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিলো যে হাটনের বুকে গিয়ে লাগে সেটা, ধরে ফেলেন তিনি। কয়েক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলেই ব্যাপারটা অন্যরকম হতো।

আগামী খেলাগুলোয় ইংরেজরা আমার বিরুদ্ধে এই কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করেছে, আমার দুর্বলতার সুযোগে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে, ইংল্যাণ্ডের দুটো ব্যাট পড়ে যেতে হাটন আর কম্পটন খেলা ধরে রাখলেন। এই অবস্থাতেই এক বিশ্রী ব্যাপার হলো। মিলারের একটা শর্টপিচ বল লাগলো হাটনের কাঁধে—বোলারের

দোষ নেই, কারণ হাটন সরতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটান। আর যাবে কোথায়—শুরু হলো জনতার গর্জন। মাঠ ছাড়া পর্যন্ত চললো চিৎকার।

নটিংহ্যামের মানুষের আজও ধারণা লারউডের ক্রিকেট খেলা ছাড়ার জন্যে আমিই দায়ী। এটা সত্যি নয়, এবং সে সম্বন্ধে তো বডিলাইনের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ফলে আটচল্লিশের খেলায় একটা ঝাঁকি বল পড়তেই চিৎকার উঠলো, 'লারউড থাকলে এটা করতে পারতে না...'

সভাপতি পরে অবশ্য আমাকে ডেকে এর জন্যে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পরের সোমবারে খেলা শুরু হবার আগে সম্পাদক মাইকে এ সম্পর্কে দর্শকদের সাবধানও করে দিলেন। বৃষ্টি আর আলোর অভাবে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হতে লাগলো। আমাদের খেলোয়াড়রা তো এ অবস্থায় খেলে না কোনোদিন; তবু, একজন বোলার কম থেকেও, ইংরেজদের মান রেখেছিলো সেদিন কম্পটন।

আর এরই মধ্যে দুটো স্লিপ ফসকেছে তার, উইকেটের পেছনে। অল্পের জন্যে এল. বি. ডব্লিউও বাঁচালো, একবার স্টাম্পও। তা সত্ত্বেও খেলে চলেছে কম্পটন।

অনেক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে খেলা শেষ হলো। কম্পটনের ডবল সেঞ্চুরী করা হলো না—মিলারের বল 'হুক' করতে গিয়ে আউট হলো কম্পটন। সাড়ে ছ' ঘণ্টার খেলায় দুটি ঝাঁকি বল দেওয়া হয়েছে, তারই একটাতে গেলো কম্পটন।

ইভান্সের অমূল্য অবদান সত্ত্বেও আমাদের জয়ের জন্যে মাত্র আটানব্বই রানের দরকার ছিলো।

ইংল্যাণ্ডকে শুধু বাঁচাতে পারতো বৃষ্টি, এবং তারও আশঙ্কা দেখা গিয়েছিলো। বারনেস আর হ্যাসেট অবশ্য সেই অবস্থাতেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কিন্তু তার আগে আমি, বেডসারের লেগ-ফাঁদের শিকার হয়েছিলাম। রান আমি করতে পারিনি খেলায়, কিন্তু তাতে আনন্দ কিছু কম হয়নি।

ইংল্যাণ্ডে এক ইনিংসে এগিয়ে থাকা মানে অস্ট্রেলিয়াতে এক ইনিংসে এগোনোর অনেক বেশি।

ইংল্যাণ্ডকে রাবার পেতে হলে আরো একটা খেলায় জিততে হবে। আমি আশবাদী নই, তবু মনে হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের সুযোগ এবার কম।

আরো খেলা

এবারও বিশ্রাম নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। নর্দাম্পটনের সঙ্গে খেলা—শরীর মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু স্নায়বিক একটা ব্যাপার হচ্ছিলো। টেস্টের গোড়ার দিকের মানসিক উদ্বেগ একটা, সব খেলাতে নয়—নিষ্পত্তি-মূলক খেলাগুলোতেই হতো এটা।

যাক, নর্দাম্পটনের বিরুদ্ধে কোনো বেগ পেতে হলো না। তারপর ফিরতি খেলা ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে। উনিশশো আটত্রিশের কথা মনে পড়লো—ইয়র্কশায়ার ভালো ইনিংস খেলেছিলো। এবার কোনোরকম ঝুঁকি নিলাম না, আমাদের পুরো দলটাই মাঠে নামলো। সারা ইংল্যাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের সমঝদার যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে তা ইয়র্কশায়ারে। মেঘলা আকাশে মানুষ আটকায়নি, মাঠ জনাকীর্ণ—পরিবেশ তৈরী। টেস্ট খেলার মতোই ভীড়—তবে অনেক অন্তরঙ্গ, অনেক গাঢ়ও। এবারও টসে জিতলাম এবং উইকেটের অবস্থা দেখে মনে হলো আমাদের সুবিধেই হবে।

হলো না। কারণ সিড বারনেসের মাঝের স্টাম্প উড়ে গেলো অচিরাৎ। বল করেছিলো অ্যাসপিন্যাল।

আমি নামলাম। জনতার গুঞ্জন কানে এলো—তড়িতাহত দর্শককুল। উপমা কি দেবো—প্রাচীনকালে মুক্ত ষাঁড়ের গহ্বরে মল্লযোদ্ধার প্রবেশ-দৃশ্যটা স্মরণ করুন, অনেকটা তাই।

মাঝারি বৃষ্টি আর অবসন্ন আবহাওয়ার মধ্যেই খেলা এগিয়ে চললো—ওদের ফিল্ডিং অত্যন্ত সতর্ক, আক্রমণাত্মক বোলিং—দুশো উনপঞ্চাশের মোট রানে পৌঁছতে প্রতিটি ইঞ্চি লড়তে হয়েছে।

গোড়াতে তো মনে হয়েছিলো আমাদের ইনিংস ছুশো রানের মধ্যে থাকবে, কিন্তু তা হলো না—এজন্য ধন্যবাদার্হ হ্যামেন্স আর হার্ভে।

ভেরিটির উত্তরসূরী ওয়ার্ডসের সঙ্গে এই খেলাতেই প্রথম মোলাকাত। ওর খেলা খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি—বোলিং আকর্ষণীয়।

খেলার ধরন ভেরিটির চেয়ে রোডসের কথাই বেশি মনে করিয়ে দেয়। ওভাবে বল মারতে গিয়ে ক্যাচ উঠলো আমার। ওয়ার্ডসের চেয়ে ছুশ্চিন্তার কারণ অন্য কোনো বোলার আর সাম্না সফরে হননি।

বৃষ্টির জন্যে দ্বিতীয় দিনে এমন অবস্থা হলো যে আমাকে সারাটা খেলায় জনস্টন আর টশ্যাককে লাগাতে হলো। ওরা চালিয়ে গেলেও, ফিল্ডিংয়ে গোলমাল হলো—ক্যাচ ফেলতে লাগলো ছেলেরা।

এ সত্ত্বেও ছুশো রানের কিছু বেশিতে ইয়র্কশায়ারের ইনিংস নামালাম, শতকরা বিশ রান হাতে আমাদের।

মাঠের অবস্থানুযায়ী ইয়র্কশায়ারের রান প্রায় আমাদের সমানই ধরা যেতে পারে।

টশ্যাক সাতটা উইকেট পেয়েছিলো—ঐতিহাসিক ঘটনা নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয় ইনিংসে আবার বারনেস বসে গেলো গোড়াতেই। এবার ইয়র্কশায়ারের ছেলেরা ক্যাচ ফেলতে লাগলো।

খেলা অমীমাংসিত হলেও এটা অনস্বীকার্য—ইয়র্কশায়ার ক্রিকেটে বাড়ছে। লেল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ভেরিটি প্রমুখদের শূন্যস্থানগুলো পূরণ না হলেও, তাদের লড়াকু মনোভাব রয়েছে ঠিকই।

দক্ষতার সঙ্গে এটা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

জয়ের টিকা নিয়ে ফিরলেও, দ্বিতীয় টেস্টের ছুশ্চিন্তা রইলো।

টসের আগে আমি আর ইয়ার্ডলে মাঠ পরিদর্শন করলাম—মাঠ সবুজ, এখনো শুকোতে দেরি আছে। ছুজনের ভাবনা মনের মধ্যেই আছে আমাদের, কিন্তু একই আশঙ্কা মাথায় বোধ করি। টসে জিতলে প্রতিপক্ষকে ব্যাট করতে দেওয়ার অনীহাও রয়েছে।

টস হলো—আমি জিতলাম, ইংল্যাণ্ডের টেস্টে প্রথম ও শেষ বার। আটত্রিশ আর আটচল্লিশের টসের আনুপাতিক হারও বোধহয় এই প্রথম।

অনিচ্ছায় ব্যাট করতে নামলাম। ভয় বাড়লো, ইয়র্কশায়ার থেকে নয়া সংগ্রহ ফক্সন বারনেসকে শূন্যহাতে শিবিরে ফেরত পাঠালো। আরো একবার বিপদের সম্মুখীন হলাম—বল বিভিন্ন উচ্চতায় আর ভঙ্গিতে আসতে লাগলো। লাঞ্চের সময় পর্যন্ত আমি আর মরিস উইকেটে থাকলেও, কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আমাদেরই নয় বোধহয়।

লাঞ্চের কিছু পরে আমার উইকেট পড়লো, কিন্তু মরিস আর হ্যাসেটকে ধন্যবাদ—অস্ট্রেলিয়াকে বিপর্যয়ের হাত থেকে তারাই রক্ষা করলো। আর্থার মরিস সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলি—লর্ডসের আগে সহজ ব্যাটিং করেছে সে, কিন্তু উইকেটের প্রকৃতি পাল্টানোয় অসুবিধে হচ্ছিলো তার। কিন্তু লর্ডসের খেলা চলাকালীন ব্যাটিংয়ের প্রভূত উন্নতি হয়েছে তার, আমাদেরই চোখের ওপর। চোখের কাজ' আর স্বাভাবিক প্রতিভার যুগপৎ মিলনেই সম্ভব হয়েছে এটা।

তবু, খেলার শেষে ইংল্যাণ্ড আমাদের ওপরেই রইলো, স্থানীয় মানুষও খুশী। কিন্তু পরের দিন অস্ট্রেলিয়া প্রতিশোধের ভঙ্গি নিলো। ট্যালন, লিণ্ডওয়াল, জনস্টন, এমনকি টশ্যাক সবাই সাড়া-জাগানো খেলা খেললো।

ফিল্ডিংয়ে হলো বিপদ—মিলারের পিঠে ব্যথা, আর লিণ্ডওয়ালের পায়ে চোট। লিণ্ডওয়ালকে তো কোনোরকমে মাঠে নামানো হলো। চালিয়ে গেলো ছেলেটা, ওই অবস্থায়।

জনস্টন ফাস্ট বোলিংয়ের উপযোগী মাঠ পেয়ে মনের আনন্দে বল করতে শুরু করে দিলো।

হতভাগ্য ডলেরির কথা মনে পড়ছে। চালু ব্যাটসম্যান হয়েও সুবিধে করতে পারলো না সে, চোখের জন্যে। নির্বাচকদের মনে রাখা উচিত ছিলো—যে খেলোয়াড়ের চোখ নেই তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সিম্পসনকে খেলানো যেতো—কারণ সে আমাদের আক্রমণের মোকাবিলা করেছে আগেও। প্রথম বলেই যেতো ডলেরি, কিন্তু সোজা বল না হওয়ায় বেঁচে গেলো। দ্বিতীয় বার লিণ্ডওয়াল আর ভুল করেনি।

শনিবারে অবস্থার উন্নতি হতে লাগলো। আমরা জয়ের আশা দেখলাম। রবিবার বিকেলটা কাটলো উইণ্ডসর প্রাসাদে আর্ল অফ গাওরির

আতিথ্যে। প্রাসাদে রাখা পুরনো স্মৃতিচিহ্নগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনটা পিছিয়ে গেলো সেই যুগে।

বর্মগুলো দেখতে দেখতে আমাদের ছেলেরা বডিলাইন বলের আত্মরক্ষার অস্ত্র পেয়েছে বলে উৎসাহিত হলো। কিন্তু তাদের জানানো হলো ঘোড়ায় চড়ে ক্রিকেট খেলার প্রচলন যে আজও হয়নি। সুতরাং—

ক্লগমোরে রানী মেরী সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। ওখানেই পরিচয়ের সৌভাগ্য হলো লর্ড এবং লেডী টেডারের সঙ্গে। লর্ড সুরসিক মানুষ, কাঁধে তোয়ালে ফেলে চা পরিবেশন শুরু করলেন।

আমাদের একটি ছেলে, যে পূর্বে বিমানবাহিনীর সাধারণ বৈমানিক ছিলো, এয়ার মার্শাল লর্ডকে বকশিশ দিয়ে বসলো। হাসির বন্যা ছোটালেন লর্ড এই সরল অস্ট্রেলীয় রসিকতায়।

লণ্ডনে ফেরার আগে এটন কলেজে সস্ত্রীক প্রধান শিক্ষকের আতিথ্য খুব উপভোগ্য মনে হলো। পুরনো বিদ্যালয়টিও ঘুরে দেখা হলো।

আবার লর্ডসে পরের দিন—ভেজা মাঠে।

বিকেলে ইনিংস শেষ করলাম, ইংল্যাণ্ডকে ন' ঘণ্টায় প্রায় দুশো রান তোলার সুযোগ দিয়ে। খাতায়-কলমে এটা অসম্ভব নয়, তবে কোনোদিন হয়নি।

তবু, লড়াকু কায়দায় আক্রমণ শুরু করা গেলো, ফিল্ডিংয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই। ইয়ান জনসন নেমেই স্লিপে এডরিচকে প্যাভিলিয়ানে ফেরাবার ব্যবস্থা পাকা করলো। ট্যালন অল্প পরেই ওয়াশব্রুককে উইকেটের পেছনে এক অনবদ্য ক্যাচে আউট করলো। বল করেছিলো টশ্যাক—ফুলটস বল। ওয়াশব্রুক চারের মার মারতে গিয়ে এই বিপত্তি হলো। এ ক্যাচ ভোলার নয়।

পরের দিন সকালে কম্পটন গেলো মিলারের দ্বিতীয় বলে, স্লিপে ক্যাচ তুলে।

অপ্রতিহত গতিতে খেলা এগিয়ে চললো, বল করছে লিণ্ডওয়াল আর টশ্যাক। রাইট আর ইভান্স অনমনীয় দৃঢ়তায় লাঞ্চ পর্যন্ত খেলা রাখলো। লাঞ্চের পরে বৃষ্টি নামলো, কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে।

কোনো ওজর খাটে না—যারা জেতবার জিতেছে। বাকি তিনটে টেস্টের একটাতে ড্র করতে হবে, অ্যাসেস রাখার জন্যে। কোনো অলৌকিক ঘটনায় একমাত্র এর অন্যথা হওয়া সম্ভব! এই অধ্যায়ে আম্পায়াররের কাজ সম্পর্কে একটা কথা বলতে হয়। আমি বরাবরই ইংরেজ আম্পায়ারদের একজন নির্ভেজাল সমর্থক। অস্ট্রেলীয় প্রতিরূপদের তুলনায় এঁদের কৃতিত্বও বেশি এ কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছি।

কিন্তু উনিশশো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে অস্ট্রেলীয় আম্পায়ারদের সমালোচনার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। ইংরেজ সাংবাদিকরা আক্রমণ চালিয়েছিলেন। আটচল্লিশে এ ধরনের অর্থহীন সমালোচনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য ছিলো আমার। আনন্দের কথা—তা হয়নি।

প্রথম দুটো টেস্টে আম্পায়ারদের দুটো নিশ্চিত ভুল সম্পর্কেই আমার বক্তব্য। এ ছাড়া অন্যান্য ক্রটি-বিচ্যুতিও ঘটেছে।

পরিষ্কার করেই বলি—আম্পায়ারদের কোনোভাবেই কাগজওলাদের কথামতো চলা উচিত নয়, নয় এমন কোনো ভুল করা যা থেকে পাল্টা অভিযোগ আসতে পারে।

আম্পায়ারদের কাজটা আদৌ সহজসাধ্য নয়, তবু তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ ব্যাপারে খেলোয়াড়দের সহযোগিতা তাদের কাছে নিঃসন্দেহেই মূল্যবান।

ম্যানচেস্টার: রাবার নিরাপদ

টেস্টের সমাপ্তিরেখা টানার আগে আবার সারে আর গ্লস্টারশায়ারের সঙ্গে খেলতে হলো। সারের সঙ্গে খেলার দিনটা রোদঝলমলে হবে ভেবেছিলাম—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হলো না; অঝোরে বৃষ্টি নামলো।

তবু, মাঠ খেলার অনুপযোগী হয়নি। টসে জিতে সারে দলকে ব্যাট ছেড়ে দিলাম, মনে দ্বিধা নিয়েই।

ওদের ব্যাট ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছিলাম, কারণ ভিজে মাঠের এক

কোণে একটা 'আলি' থাকায় ওদের আরো বিপদ হলো। গুড লেংথ পিচের কিছু আগে আলিটা, লক্সটন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বল দিতে লাগলো। লরি ফিশলক তো মাথায় চোট খেয়ে বসলো, এবং আরো কয়েকজনও অল্পের জন্যে রক্ষে পেলো।

এরকম অসমান পিচ মাঝে মাঝে নজরে পড়েছে, কিন্তু কেন তা আজো জানি না। যুদ্ধের সময় মাঠগুলোর কিছু কিছু ক্ষতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ রকম একটা অসংগতি কারো চোখে পড়লো না, এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। মোটামুটি ফাস্ট বোলারের বল এসব মাঠে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। লিণ্ডওয়াল খেলতে পারলো না ভেবে স্বস্তি পেলাম, সারের ব্যাটসম্যানদেরও নিশ্চয়ই একই উপলব্ধি হয়েছিলো—কারণ কেউ দেহে মারাত্মক চোট পাক এটা আমার একেবারেই অপছন্দ। লক্সটনের মতো বোলারের বলও খুব নিরাপত্তার আশ্বাস বহন করলো না।

মাঠের পরিচর্যা যাঁরা করেন তাঁদের প্রাথমিক কাজ হলো মাপা মাঠে খেলার আয়োজন করা, যেটা হয় না সব ক্ষেত্রে।

ছশোর কিছু বেশী রানে সারের খেলা শেষ হলো। ওদের পার্কারের সম্পর্কে উল্লেখ করতেই হয়, মাঠে স্লিপের কাজও প্রশংসনীয় তার। দিনের আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের অবস্থারও উন্নতি হলো। পরের দিন আমি আর হ্যাসেট সেঞ্চুরী করে খেলা ছেড়ে দিলাম দলের তরুণদের অনুশীলনে সাহায্য করতে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ছ' উইকেটে সারে মাত্র ছ রানে এগিয়ে রইলো। শুক্রবার দিনটা তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে দিতে চাইলাম, কারণ উইম্বলডনে টেনিস খেলা দেখার আমন্ত্রণ এসে গেছে—খেলছে আমাদের জন ব্রমউইচ, ফকেনবার্গের সঙ্গে।

কিন্তু মিলার ছটো সহজ স্লিপের ক্যাচ ফেলে দিয়ে দেরী করালো। এই ভুলের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো পার্কার। এরোল হোম্স্‌ও পুরনো দিনের কিছু নমুনা দিলেন। যুদ্ধ-পূর্ব দিনে হোম্স্‌ ইংল্যাণ্ডের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাটসম্যান।

একশো বাইশ রানের মাথায় আমরা খেলা পেলাম। এ সংখ্যা

অতিক্রম করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি—লক্সটন আর হার্ভে আটাশ মিনিট চুটিয়ে খেলে ছাড়িয়ে গেলো সেটা।

হ্যাঁ, আমরা উইম্বলডনের সেই ঐতিহাসিক খেলা দেখতে পেরেছিলাম, রাজকীয় সংরক্ষিত আসনেই বসেছিলাম আমরা—আমার সামনে বসেছিলেন ডাচেস অফ কেন্ট, পেছনে স্যর নরম্যান ব্রুকস।

লক্ষ্য করলাম মানুষের সহানুভূতি ব্রমউইচের দিকেই, যদিও খেলাটা অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। এর পেছনে ভাবপ্রবণতার প্রশ্রয় থাকতে পারে কিংবা ফকেনবার্গের বিগত দিনের অপকৌশলও এর জন্মে দায়ী হতে পারে। জনতা ওর বিরোধীই, মনে হলো।

উত্তেজনায় কঠিন খেলা। ব্রমউইচ্ পঞ্চম সেটে তিন পয়েণ্টে এগিয়ে গেলো। স্যর নরম্যানের সঙ্গে আমি একমত—খেলা ব্রমউইচেরই, কিন্তু ভুল করেছিলাম। পবাজয়ের সম্মুখীন হলো ব্রমউইচ শেষটায়।

তার মুখে হতাশাব প্রতিফলন দেখেছি, কারণ খেলোয়াড় হিসেবে আমাব তো অজানা নয় যে সব দিয়েও যখন প্রতিযোগীকে অন্যের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে হয়, তাব মানসিক অবস্থা কি হয়। ফেরার আগে আর এক অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়ের হার চোখে দেখে আসতে হয়েছে—সে হার্পার, সুইডেনের বারজেলিনের সঙ্গে জুটিতে হেরেছিলো আমেরিকার ব্রাউন আর মুল্লয়ের কাছে।

টেনিসের র‍্যাকেটে এ যাদু কেমন করে সম্ভব এইটাই ভেবেছি শুধু—অবশ্য এ ভাবনা তাদেরও, ক্রিকেট সম্পর্কে—যারা আমাদের খেলা দেখে। অবশ্য এ বিনয় সর্বস্তরের খেলোয়াড়দের—নিজেদের সম্পর্কে। পরের দিন দল গ্লস্টারের সঙ্গে খেলতে গেলে আমি আর একটা বিশ্রামের দিন কাটালাম বন্ধুবর বোরিনের সঙ্গে।

লাঞ্চেও খবর এলো, অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করে চলেছে। মিলারের অপরাজিত সেঞ্চুরীর খবরও পেলাম।

বিপক্ষের খবরও এলো, কিন্তু আমাদের জয় অনিবার্য মনে হলো। এই একটা লোক মিলার—যে কুক আর গডার্ডের বল ছাতু করে

দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার একঘেয়ে সময়হীন খেলার প্রতিবাদে ইংরেজ সমালোচক নেভিল কার্ডাস লিখলেন, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দেশে এক ধরনের সমালোচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—অস্টেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের খেলায় নাকি উল্লাসের অভাব দেখা যায়। আর আজকাল যখন কোনো ইংরেজ টেস্ট খেলোয়াড় 'স্লো' খেলার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তাঁরা নির্বিবাদে বলে দেন, 'আরে, আমরা অস্ট্রেলীয়দের মতেই খেলছি।' সেইজন্যেই বোধহয় এ ধরনের খেলা চলে প্রধানতঃ ওয়ার-উইকশায়ার আর লিস্টারশায়ারের মধ্যে। কোনো নামী ব্যাটসম্যানকে আজ পর্যন্ত আলগা বল ছেড়ে দিতে দেখা যায়নি।"

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানেরা ইংরেজদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি রান তোলে এটা আমি এবং আরো অনেকেই স্বীকার করবেন। এতে খেলা জেতা যায়—উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে, ব্রিস্টলের একটা খেলায় গডার্ড হাতে চোট পেয়ে আমাদের একটি ছেলেকে প্রশ্ন করেছিলো —তার ওপর এ ধরনের খেলার কোনো নির্দেশ ছিলো কিনা—উত্তরে জেনেছিলো এ ধরনের কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় না কাউকে এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে এটা। হতবাক হয়েছিলো গডার্ড এ কথা শুনে।

যাক সে খেলায় মরিস দুশো নব্বই করে ব্যাট ছাড়ার আগে, এবং এই অপরাজেয় মনোভাব তার খেলার জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিলো। এই খেলাও অনুশীলনধর্মী মনে হয়েছে, যদিও ওদের ক্র্যাপ সেঞ্চুরী করে পরে ইংল্যাণ্ডের হয়ে টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে। ম্যানচেস্টারে আমাদের তৃতীয় টেস্টের খেলা পড়েছিলো, ক্র্যাপ সে দলে ছিলো।

ম্যানচেস্টারের খেলাটা আমাদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছে। যদিও ওদের দলের বিপক্ষে দেখা গেলো হাটনের নাম নেই। এ নিয়ে মৃদু চাঞ্চল্যও দেখা গিয়েছিলো। সম্ভবতঃ লর্ডসের খেলায় হাটন আমাদের ফাস্ট বোলিং যেভাবে খেলেছে তাই নিয়েই সূচনা এর। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: নির্বাচকেরা, ভাল খেললেও কি কোনো খেলোয়াড়কে বাদ দিতে পারেন?

আমি বিনা দ্বিধায় বলবো, হ্যাঁ, পারেন।

হাটনকে কিন্তু চতুর্থ আর পঞ্চম টেস্টে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে আবার। হাটনের অনুপস্থিতিতে এমেটের একটা বড় সুযোগ হয়েছিলো, কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি সে। দ্বিতীয় ইনিংসে ট্যালনের হাতে এক অনবদ্য ক্যাচে আউট হয়েছিলো এমেট। টেস্টে এ ধরনের ক্যাচ বিরল।

টসে হারলাম। দিনটাও খুব শুকনো না থাকায় আবার ভয় হলো। কিন্তু আমাদের বোলাররা অসাধ্য সাধন করলো। কিন্তু তার মধ্যেও ভুলের মাসুল গুনতে হয়েছে—ট্যালন হেন মানুষ, দু-দুবার কম্পটনকে ধরতে পারলো না উইকেটে। কম্পটন সে খেলায় আঘাতও পেয়েছিলো। একটা নো-বল হুক করতে গিয়ে সেটা কপালে লাগে তার। অনেক রক্ত পড়েছিলো সেদিন।

কম্পটন কিন্তু পরে আবার খেলতে নেমেছিলো।

বল গোনার ব্যাপারেও কিছু অসংগতি লক্ষ্য করেছি ইংল্যাণ্ড সফরে। পরীক্ষামূলকভাবে আমরা ছ' বলের পঞ্চান্ন ওভার পদ্ধতিতে খেলছিলাম। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে অধিনায়ক এবং আম্পায়ারদের সুবিধার্থে আমাদের সাদা চাকতিতে পঁয়তাল্লিশ ওভার এবং হলদে চাকতির খেলা খেলতে হলো পঞ্চাশ ওভার। দুটোই পঞ্চান্ন ওভারের পর।

আমার হিসেবে পঞ্চাশ ওভারের পরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এ ব্যাপারে, ক্র্যাঙ্ক স্কোরারের জায়গায় গেলেন ব্যাপারটা বুঝতে। এবং তাঁর ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাদা চাকতি বেরোলো।

আর এক ওভারের পর হলদে চাকতিও। দুটো ওভার পরে দুরকমই। আমি তো হতবুদ্ধি!

আমার কাহিনীতে একটু এগিয়ে যাচ্ছি, লীডসের সঙ্গে পরের খেলায় স্কোরার বসলেন স্কোর-বোর্ডের বিপরীত দিকে। আমি তো মুহুর্মুহুঃ তাকাচ্ছি সেদিকে। এমন সময়ে আমার এক সতীর্থ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অত্যন্ত অনিচ্ছায় যেন একটা হলদে চাকতির আবির্ভাব ঘটছে।

এটা ফিল্ডিং ক্যাপ্টেনের কাছে গুরুত্বের ব্যাপার, কারণ বোলারদের দাঁড়াতে হয় এই চাকতির আবর্তে।

অস্ট্রেলিয়াতে আমরা কিন্তু এক অভ্রান্ত বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ করেছি—স্কোর-বোর্ডে এক, দুই, তিন ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ থাকে। অধিনায়ক এক নজরেই বুঝতে পারেন ক' ওভার বল দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ডেরও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত, মনে করি।

ম্যানচেস্টারের দ্বিতীয় দিনটা আমাদের 'কালা' দিন গেছে। ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি বাড়তে লাগলো। কম্পটন সেঞ্চুরী করার আগে ট্যালন দুবার ফসকালো তাকে। তবু, কম্পটন সুন্দর খেলেছে, চোট খেয়েও। বেডসারও আউট হবার কোনো লক্ষণই দেখালো না, তাই তাকে নিয়ে আমি আর লক্সটন একটা সস্তা মজা করলাম। আমরা দুজনেই বলের দিকে দৌড়ে, সেটা না ধরে বেরিয়ে গেলাম ওদের রান তোলার সুযোগ দিয়ে, আর ওরা দৌড়তেই লক্সটন ক্ষিপ্রগতিতে ফিরে বল তুলে বেডসারকে রান আউট করলো।

দিনের সবচেয়ে বিপদ ডেকে আনলো পোলার্ড। জনসনের একটা বল প্রচণ্ড গতিতে হাঁকড়ে বারনেসের বাঁ দিকের পাঁজরায় ফেললো। বারনেস ব্যাটের মুখেও ছিলো না, অন্তত: আট গজ দূরে ছিলো সে। অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পড়লো বারনেস। মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হলো তাকে। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—একশ্রেণীর দর্শক কিন্তু এতে উল্লসিত হয়েছিলেন। শর্ট-লেগে বারনেস অতুলনীয়, তবু, তারই জন্যে আমাকে এক খোলা চিঠিও দেওয়া হয়েছে: 'অস্ট্রেলীয় দলের শুভেচ্ছা সফরের ওপর কটাক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ চিঠি লেখা হচ্ছে না, কিন্তু ক্রিকেটের পরিপন্থী এক ধরনের খেলা দেখা যাচ্ছে ইদানীং—ব্যাটসম্যানদের অত্যন্ত কাছে একদল ফিল্ডার রাখা হচ্ছে। সিড্ বারনেস তো বস্তুত: ব্যাটসম্যানের খেলার জায়গাটাই বেছে নিয়েছেন। উইকেটের এক পাশে পঁয়ত্রিশ ফুটের মধ্যে পা রেখে অনাবশ্যক ঘোরাফেরা, স্বেচ্ছায় নয় হয়তো। এটা হচ্ছে বোলার বল দিতে দৌড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এ সম্পর্কে আম্পায়াররা কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগেই আপনাকে অনুরোধ করছি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের।'

এই নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যেরা লিখলেন, 'ব্র্যাডম্যান ক্রিকেটের নিয়মানুসারে ইংরেজদের উইকেট নিয়ে চলছেন, চলবেনও!'

বুঝলাম, সাংবাদিক ভদ্রলোক আমার মুখ খোলাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমি খুলিনি, কারণ সাংবাদিকদের অধিকাংশই ক্রিকেটের আইন-কানুন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। 'ফেয়ার অ্যাণ্ড আনফেয়ার প্লে' বইটির চার (এক)-এর ধারায় স্পষ্ট নির্দেশ আছে : 'আম্পায়ারদের, 'অন্যায়' খেলায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে, আবেদন ছাড়াই।' তাহলে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাঁদের মতে কোনো 'অন্যায়' সংঘটিত হয়নি খেলায়।

বারনেস কখনোই এক পায়ে খাড়া থাকেননি, ওই অবস্থায়। কিন্তু কেচ্ছা যা হবার তা হলোই—যাঁরা ওই নিবন্ধটি পড়েছিলেন তাঁরা সকলেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছিলেন।

বিশ্বের অন্যতম সেরা শর্ট-লেগের ফিল্ডসম্যান ছিলেন বারনেস, এবং যে অবস্থায় খেলেছেন তিনি সে সৎসাহস আর কারো হয়েছে বলে জানি না। তবু তাঁকে এ দুর্নামের ভাগীদার হতে হয়েছে। তবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অনেক পৃথিবীতে, তাই বারনেস অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে খেলতে পেরেছেন পরে।

কিন্তু, আমাদের পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাতেই হলো, বারনেসের জায়গাটা ছেড়ে দিতে হলো ইয়ান জনসনকে—মানে প্রথম ব্যাট হিসেবে নামলো জনসন, এবং নতুন বল আসার আগেই আমাদের দুজনকেই প্যাভিলিয়ানে ফিরে যেতে হলো।

শনিবার পর্যন্ত এই চললো। তার ভেতরেই মরিস একটা হুকের ভুল মারে বাউণ্ডারীতে ফেঁসে গেলো। বারনেস জোর করে খেলা চালিয়ে যেতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো, এবারও হাসপাতালে যেতে হলো তাকে। পাঁজরার চোট ছাড়া বাঁ চোখেও জখম হয়েছিলো সে। সময়ে অবশ্য সবই সেরেছিলো।

আমাদের শেষ জুটি প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলো ফলো অন থেকে দলকে বাঁচাবার জন্যে। ইয়ার্ডলে হয়তো তাতে বাধ্য করতো না আমাদের, কিন্তু সুযোগ না দেওয়াটাই ভালো।

ইংল্যাণ্ড আবার ব্যাট করতে নামলে আমাদের ফিল্ডিংয়ে গোলমাল শুরু হলো। কিন্তু ভাগ্য এবার হ্যাসেটের ওপর অপ্রসন্ন। না হলে ওয়াশব্রুকের হুক ফেলে দেবে কেন। পরে ওই একই জায়গায় আবার

সেই একই মার। বলটা শূন্যে উঠলে লিণ্ডওয়ালকে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, 'ধরো এটাকে।'

না। এবারও ধরতে পারলো না হ্যাসেট বলটা।

রসিকচূড়ামণি হ্যাসেট ওই অবস্থায়ই কাছের এক পুলিসের সিপাইয়ের কাছ থেকে তার শিরস্ত্রাণটি নিয়ে নিলো, তৃতীয় ক্যাচ ফেলার সম্ভাব্য পরিণাম চিন্তা করেই বোধ হয়!

ছোট ছোট ঘটনা থেকে কত কাণ্ডই না হয়! পরে শুনেছিলাম ল্যাঙ্কাশায়ারের এক ভদ্রলোক বাকি খেলা আর দেখবেনই না—তাঁর ধারণা হ্যাসেট নাকি ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলো ক্যাচ দুটো। বললেন—এ ক্যাচ ফেলে দেওয়াই শক্ত—এবং অস্ট্রেলিয়া অর্থ-প্রাপ্তির খাতিরে 'মৃত' খেলা খেলছে।

ভদ্রলোক যদি সেই মুহূর্তে আমাদের মুখের অবস্থা দেখতেন তাহলে হয়তো এ মনোভাব নিতে পারতেন না।

ক্রিকেট খেলাটা আসলে অত্যন্ত জটিল—ফরমায়েশী ঘটনা ঘটে না এ খেলায়। ওয়াশব্রুকের কিন্তু শাপে বর হলো, ক্যাচ পড়ে যাওয়ায় টেস্ট দলে আসার সুযোগ হয়ে গেলো তার। সেঞ্চুরী করতে পেরেছিলো ওয়াশব্রুক সে খেলায়।

আমাদের দলীয় সম্পদ পুরোপুরিই কাজে লাগানো হয়েছে, এমন কি কিথ মিলার—যে লর্ডসে বা এ খেলাতেও এতোক্ষণ বল দেয়নি, তাকেও লাগানো হলো। সবাই কঠিন পরিশ্রম করেছে।

আশার একটা ঝিলিক দেখা দিলো এডরিচ রান আউট হওয়াতে। অনুপ্রাণিত হলাম কম্পটনও শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াতে। ক্র্যাপ অল্পের জন্যে অনুরূপ বিপদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো। তবু, খেলা তখনো আমাদের অনুকূলে আসেনি।

সোমবার খেলা হলো না বৃষ্টির জন্যে। মঙ্গলবার লাঞ্চের পর শুরু হলো খেলা। ইয়ার্ডলে খেলা তাড়াতাড়িই শেষ করলো। জনসন ভিজে মাঠে নেমেই আউট হলো। তারপর, আমি আর মরিস বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে গেলাম।

বেডসারের ওই আক্রমণাত্মক বলের মোকাবিলা করলো মরিস এবারও। এটা বাইরের লোকের কাছে খুব প্রশংসনীয় মনে হয়নি বুঝলাম, কিন্তু আমি তো জানি রান তোলার ব্যাপারে কোনো উত্তম ছিলো না আমাদের। বৃষ্টির কৃপায় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে তাতে আমি আনন্দ গোপন করার কোনো চেষ্টাই করিনি। বিশ্রামের ঘরে এ নিয়ে মজাও হলো—লম্পটন সমানে বলে যেতে লাগলো, 'চিন্তার কারণ নেই।'

খেলার মীমাংসা না হলেও খেলা আমাদের ভুগিয়েছে, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে বৃষ্টিই বাঁচিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে।

দুদিক সমান সমান, অ্যাশেসের দড়ি টানাটানি চলছে, তবু লীডসের ব্যাপারে আমার একটা নীরব আস্থা আছে, পূর্ব-অভিজ্ঞতা-প্রসূতও বলতে পারেন।

এর বাস্তব রূপ দেখা দিলো যথাসময়ে।

লীডস: একটি বিরাট জয়

লর্ডসে পরের খেলায় শক্তির যাচাই হলো মিডলসেক্সের সঙ্গে। কাগজে-কলমে অবশ্য তাদের বড় দল বলে মনে হলো—কম্পটন, এডরিচ, প্রমুখদের নাম উঠলো তালিকায়। টেস্ট বোলার ইয়াংয়ের নামও পড়লাম। স্লো লেগ-স্পিনার ইয়ান বেডফোর্ডও খেলছে। বেডফোর্ড তখন বিদ্যালয়ের গণ্ডিও পেরোয়নি। পয়লা-নম্বরী ব্যাট রবার্টসন—যার নাম টেস্টের তালিকাতেও উঠবে জানা গেলো, আর—অপেশাদার বোলার হুইটকোম্বের নামও পাওয়া গেলো।

জর্জ ম্যান অধিনায়কত্ব করছেন দলের। ম্যান পরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম. সি. সি.র নেতৃত্বও করেছেন।

খেলার সম্বন্ধে অবশ্য বলার বেশি কিছু নেই—কারণ দশ উইকেটের ব্যবধানে জিতেছিলাম খেলা।

মিডলসেক্স টসে জিতে ব্যাট করতে নামলো, মাঠও পরিষ্কার ঝকঝকে। কিন্তু আমাদের বোলিংয়ের মোকাবিলা করতে পারলো না। প্রথমে তিন

রানে সব উইকেট পড়ে গেলো তাদের। এই সংখ্যা স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে যাওয়া গেলো, কারণ লক্সটন আর মরিস দুজনেই সেঞ্চুরী করলো। মরিস বরাবরই রান বেশি তুলছিলো, কিন্তু লক্সটনের ব্যাটিং প্রভূত উন্নত এখন, তার পায়ের চোটও সেরেছে। স্বস্তি পেলাম। মিডলসেক্স দ্বিতীয় বারের ব্যাট পেলো সোমবার পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে। কম্পটন আর এডরিচকে নিয়ে চারজন স্টাম্প আউট হলো। রবার্টসন ভালোই খেলছিলো, কিন্তু লিণ্ডওয়ালের একটা বল হুক করতে গিয়ে চোয়ালে আঘাত পেলো।

জনতার চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই দৌড়ে গেলাম সকলে। রবার্টসনের প্রথম কথাই হলো, 'ওদের চিৎকারে কান দেবেন না, আমারই দোষ।' যে মানুষের চোয়াল ফেটেছে, তার এ কথাগুলোয় মনে হয়েছে সৎসাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি অননুকরণীয়।

শেষ দিন খেলা দ্রুতই শেষ হলো।

দীর্ঘদেহী হুইটকোম্ব তার দেহের উচ্চতার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে, অদ্ভুত ভালো বল করেছে সে। আর মাঠে সামান্যতম আর্দ্রতা থাকলেই স্পিন আর লেগে বল করেছে হুইটকোম্ব। ওরই একটা বলে আমাকে আউট হতে হয়েছে।

হুইটকোম্ব কতটা উন্নতি করবে জানি না, তবে খেলার সময় তার বলের দুটো চোট সামলাতে হয়েছে, পায়ের গোছে আর কাঁধে।

ইয়ান বেডফোর্ডও প্রথম দিকে নিখুঁত বল করেছে, কিন্তু পরে মরিসের হাতে তাকে নাজেহাল হতে হয়েছে।

এবার লীডসে। ইয়ার্ডলের দলবল অপেক্ষা করছে সেখানে—করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে মনোভাব নিয়ে। এর ওপর ঠাণ্ডা আবহাওয়া স্বাগত জানালো। হাটনকে আবার দলে নেওয়া হয়েছে দেখলাম, দলটা মোটামুটি ভালোই মনে হলো, ব্যতিক্রম শুধু—লেগব্রেক বোলারের অভাব। আমরা মুশকিলে পড়লাম সতেরোজন খেলোয়াড় নিয়ে—কাকে বসিয়ে কাকে খেলাই। ট্যালনের আঙুলে চোট। ওর বদলে স্যাগারসকে নামানো ঠিক হলো। স্যাগারস ভালোই খেলেছিলো।

নীল হার্ভে তো কব্জির জোরেই তার জায়গা করে নিয়েছে। তাকে বাদ দেওয়া অন্যায় হবে।

সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হলো। বারনেস ম্যানচেস্টারের আঘাত থেকে তখনো সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেনি, তাই তার বদলে হার্ভে আর হ্যাসেটকে ইনিংস শুরু করতে পাঠানো হলো।

এবার নিশ্চয়ই টসে আমার জিত হওয়ার কথা, কিন্তু—না। টসে ইয়ার্ডলের পক্ষেই রায় দিলো মুদ্রা। ইয়ার্ডলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট হাতে নিয়ে নিলো। হাটন এবার আর নির্বাচকদের বিরুদ্ধবাদী হবার কোনো আগ্রহ দেখালো না, যদিও ওয়াশব্রুক তার বোলিংয়ের সমস্ত কায়দা-কানুন ছাড়তে লাগলো। কিন্তু কিছুই হলো না, শেষে লিণ্ডওয়াল দ্বিতীয় বলে (নতুন) অফ-স্টাম্প ওড়ালো। তারও পর আছে, পরের উইকেট নিতে আমাদের খেলার শেষ ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

আমাদের বোলারদের কোনো ত্রুটি ছিলো না, ফিল্ডিংও অনবদ্য। কিন্তু তবু, ব্যাটিং যেন সব ছাপিয়ে গিয়েছিলো সেদিন। প্রথম জুটিই এ প্রশংসার দাবীদার। ইংল্যাণ্ড এর মধ্যে একটা ভুল করেছিলো—ওরা রান তোলার দিকে নজর না দিয়ে উইকেট সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এই দিনের খেলা অবশ্য প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দুঃখজনক কার্যকলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—ওঁরা কাগজের লেখক হয়ে যেন পরিমিতিবোধও হারিয়ে ফেলেন; পরের দিন ও'রিলী কাগজে লিখলেন:

"কোনো খেলায় ব্যাটের কাজ অসাধারণ হয়ে দেখা দিলে বোলিংয়ের নিন্দা করাই রেওয়াজ—অষ্ট্রেলিয়ার আজকের প্রচেষ্টা এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয় মনে হলো। প্রথম কয়েকটা ওভার এলোমেলো বল দেওয়ার পর আক্রমণভাগ স্তিমিত হয়ে গেছে—আশাতীতভাবে। কোনো বোলারকেই এই নিন্দাবাদ থেকে ছাড় দেওয়া যায় না—তথাকথিত কিছু কিছু আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছে, কি লক্ষ্যে, কি মাপে।"

অসাফল্যের প্রশ্নে বলবো—হ্যাঁ, অর্থহীন? না। নীতিগতভাবে আমার কিছু বক্তব্য রাখা উচিত এই প্রসঙ্গে: 'আউট ক্রিকেট' বলতে বোলিং এবং ফিল্ডিং দুই-ই বোঝায়—আর অধিকাংশেরই মতে এর চেয়ে ভালো

ফিল্ডিং দেখা যায়নি। পিচের ক্রমাবনতি সত্ত্বেও ওই মাঠেই রান উঠেছে যথাক্রমে ছশো একানব্বই, তিনশো চুরানব্বই, তিনশো তেষট্টি আর চারশো সাত, তাহলে প্রথম দিনে ছশো আটষট্টি রান ধরলে বলতে হয় খেলার বাকি সময়টা 'আউট ক্রিকেটে'র কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

চারশো ছিয়ানব্বইতে ইংল্যাণ্ডের সেই খেলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিলো। আমার মন উনিশশো আটত্রিশের ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে—ও'রিলী তখন বিশ্বের সেরা বোলার খেতাবধারী, এবং অন্যান্য সার্থক বোলারদের সমর্থনপুষ্টও, তবুও হাটন-কম্পটনের দল যে রান তুলেছিলো তার হিসেব দিলাম :

নটিংহ্যামে আট উইকেটে ছশো আটান্ন।

লর্ডসে চারশো চুরানব্বই।

ওভালে সাত উইকেটে নশো তিন।

চৌত্রিশ সালে ইংল্যাণ্ড ও'রিলী কোম্পানীর বিরুদ্ধে ন' উইকেটে ছশো সাতাশ করেছিলো প্রথমে এবং তারপর কোনো উইকেট না হারিয়ে একশো তেইশ রান। ম্যানচেস্টারেই খেলা হয়েছিলো।

জানি না আমাদের আক্রমণভাগকে তখনকার হিসেবে 'আশাতীত-ভাবে অর্থহীন' বলা চলে কিনা এবং এও জানি ও'রিলী তখনকার খবরের প্রতিবাদ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন ফলাও করে উইকেটের দুরবস্থার। আশা করবো সমালোচকরা ক্ষতিকর আলোচনা থেকে বিরত থাকবেন। ক্রিকেটের উন্নতি মাত্র একটি উপায়ে সম্ভব—অন্যের গুণানুসন্ধান করে। খেলার কঠিনতম সময়েই তো খেলোয়াড়েরা প্রেরণা খোঁজেন। ও'রিলী সুলেখক বলে স্বীকৃত এবং খেলোয়াড়দের প্রকৃত নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করবেন-এটাই কামনা করবো।

যাক, শুক্রবার খেলা শুরু হলো। এডরিচ আর বেডসার জুটি প্রশংসনীয় খেলার স্বাক্ষর রাখলেন—একশো পঞ্চান্ন রান করে। বেডসার প্রমাণ করলো তার ব্যাটও ভালোই চলে। ওই উইকেটে, চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে প্রথম আধ ঘণ্টায় মাত্র তিন রান সংগ্রহ করা গেলো।

শেষ দিনে আমি মরিসের সঙ্গে নামলাম, পাঁচ দিনের পুরনো মাঠে

চারশো রানের ঘাটতি—প্রথম আধ ঘন্টায় রান হলো বাট। হায়—অস্ট্রেলীয় ভাই ব্রাদাররা, তোমাদের ভয়ানক একগুঁয়েমির জন্যে…

সবিনয়ে একটা কথা এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি, টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র তিনটে মানুষ লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করেছে—ট্রাম্পার, ম্যাকারটনি আর আমি—তিনজনই অস্ট্রেলিয়ার লোক।

ওদিকে এডরিচ-বেডসার, জুটি ভাঙার আগে চারশো তেইশ রান করে বসে আছে, দুটো উইকেট হারিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার আক্রমণভাগ স্বভাবতঃই ভেঙে পড়া উচিত ছিলো—দেড়-দিনের এই হাড়-কালি-করা পরিশ্রমে, কিন্তু তা হলো না। টেস্টের ইতিহাসে 'আউট ক্রিকেটে'র এক বিরল নজীর সৃষ্টি করলো। চারশো তেইশ থেকে চারশো ছিয়ানব্বইতে উঠে ইংল্যাণ্ডের সকলে আউট হয়ে গেলো, অর্থাৎ তিয়াত্তর রানে আটটা উইকেট পড়েছে—আমাদের বোলারদের বলেই তো!

আমার দলের ছেলেদের তুলনা নেই। আমি এখনো সেই দৃশ্য ভুলতে পারি না—স্যাম লক্সটন অনেকক্ষণ বল করার পর ফিল্ডিংয়ে একটা বল ধাওয়া করছে বাউণ্ডারীর কাছে। লক্সটন এতো জোরে ছুটেছিলো যে দর্শকদের মধ্যে পড়ে একটা বিশ্রী কাণ্ডও ঘটাতে পারতো। বল ধরতে না পেরে টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো, এইভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি লক্সটনকে।

বিকেলে ব্যাট করতে নেমেই প্রথমে আউট হলো মরিস। তারপর আমি নামলাম—দর্শকদের উল্লসিত অভিনন্দন কানে নিয়ে। আমার খেলোয়াড়-জীবনের সবচেয়ে সোচ্চার অভ্যর্থনা সম্ভবতঃ। মাঠে নামার কিছু পরে কমে গেলো উল্লাসধ্বনি, তারপর ব্যাট নিয়ে ক্রিজে দাঁড়াতেই আবার শুরু হলো চিৎকার—কান ফাটানো।

শাবাশ ব্র্যাডমান, সার্থক জীবন তোমার…

লীডসের মাঠে আমার হাত বরাবরই খোলে—উনিশশো ত্রিশ আর চৌত্রিশে তিনশোর ওপর রান হয়েছে এই মাঠেই, আটত্রিশেও সেঞ্চুরী করেছি—অবিস্মরণীয় সেঞ্চুরী—তবু, প্রবাসে এ অভ্যর্থনা জোটে না সকলের। এ স্মৃতি তো মোছা যায় না।

কি করে টিকে গেলাম উইকেটে নিজেই জানি না, কিন্তু ছিলাম এবং সেদিন আর কোনো উইকেটই পড়েনি।

পরের দিন 'গুণমুগ্ধ'দের চিঠি এলো অনেক, তার মধ্যে একটা পড়ে মজা পেয়েছিলাম—আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠিটা শুরু করেছেন ভদ্রলোক :

> দেশের আবহাওয়া নিয়ে আমরা তিন বন্ধুতে বাজি ধরেছিলাম। তিনটে ঝরঝরে সাইকেলে করে রাস্তার ওপর ভরসা করে লীডসে রওনা দিয়েছিলাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা দেখতে। ফেরার পথে একজনের গিয়ার ভাঙলো, আমারটার ভাঙলো মাডগার্ড, এবং পরিশ্রান্ত বন্ধুটিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়েছে বাকি পথ, কিন্তু এটা গায়ে লাগেনি—যা দেখেছি তাতে মন ভরেছে।
>
> ইতি আপনার একান্ত অনুগত
> একজন আশাবাদী ক্রিকেট খেলোয়াড়
> একজন ততোটা আশাবাদী নয়
> এবং
> একজন যে একেবারেই খেলতে জানে না।

রাতে বৃষ্টি হলো, পরের দিন সকালেও—তবে অল্পই। সেদিক থেকে ভালোই হলো—উইকেট বাঁধতে সাহায্য করলো তা। কিন্তু প্রথম আধ ঘণ্টা ইংল্যাণ্ড বৃষ্টির সুযোগ নিতে পেরেছিলো।

উইকেটের অবস্থা থেকে মনে হলো আমাদের খেটে খেলতে হবে কারণ বল এলোপাতাড়ি চলতে লাগলো। বেডসারের একটা বল তো আমার শরীরের এমন জায়গায় লাগলো যে বক্সিং হলে আমি ফাউল বলে চেঁচিয়ে উঠতাম।

ক্রিকেটে আহত মানুষের ভাগ্যে শুধু সহানুভূতিই জোটে, তাও সব সময়ে নয়।

হ্যাসেট এতোক্ষণ ভালোই চালাচ্ছিলো এবং মনে হলো অনেক দূর যেতে পারবে, কিন্তু—পোলার্ডের একটা গুড লেংথ বল ওর খেলার শেষ করে দিলো।

মিলার প্রথম বলে অবশ্য তিন মেরে ফাঁক ভরাবার চেষ্টা করলো।

হ্যাসেটের অবস্থা থেকে মনে হলো আমারও ওইরকম কিছু হতে পারে। কিন্তু, তা হলো না, আউট হয়ে গেলাম অফ-স্টাম্পে।

জনতার উল্লসিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিলো, যেহেতু ইংল্যাণ্ড প্রতিশোধের মনোভাব নিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের অধিকাংশ নিয়মিত খেলোয়াড়ই অসুস্থ।

এই অবস্থায় আমাদের নীল হার্ভে নামলো—ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার এই প্রথম টেস্ট খেলা। মনে মনে প্রার্থনা জানালাম ছেলেটার শুভার্থে। তারপর যা ঘটলো তার জন্যে ওই বিরাট জনতার কেউই বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না।

হার্ভে আর মিলার তো চুটিয়ে খেলতে লাগলো, বিশেষ করে মিলার—সুন্দর মার মেরে চলেছে সে। খানিক পরেই ঘটলো দুর্ঘটনাটা, লেকারের একটা বল ঠেঙাতে গিয়ে কেলেঙ্কারীটা হলো—বল উইকেটরক্ষক ইভান্সের গায়ে পড়ে শর্ট লেগে ক্যাচ উঠলো। এডরিচ প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে বল ধরলো।

হার্ভের সঙ্গে নামলো লক্সটন। চললো স্কোয়ার কাট আর কভার ড্রাইভ। ইয়ার্ডলের ছেলেরা অবিশ্রাম চারের মারে জেরবার হলো—শেষে হার্ভের নামের পাশে স্কোর-বোর্ডে শতকের সেই বহুপ্রত্যাশিত সংখ্যাটি দেখা দিলো।

লক্সটন এতো উত্তেজিত হয়েছিলো বন্ধুর সাফল্যে যে ক্রিজ থেকে আগে বেরিয়ে প্রায় রান আউট হবার দাখিল হলো। হার্ভের সঙ্গে হাত মেলাতেই ছুটছিলো সে। হার্ভেও কিন্তু পড়লো লেকারের হাতেই।

উনিশশো আটাশ-উনত্রিশের দুঃসময়ে আর্কি জ্যাকসনের সঙ্গে জুটি-ছিলাম,—মনে পড়লো সে কথা। জ্যাকসন এডিলেডে সেঞ্চুরী করেছিলো। টেস্টে সেই প্রথম সেঞ্চুরী। জ্যাকসন হার্ভের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট ছিলো সে সময়ে।

জ্যাকসন ডান হাতের খেলোয়াড়, হার্ভে ন্যাটা।

প্রথমজন ছিলো লম্বা ঢ্যাঙা, কিছুটা গেঁতোও। ক্রিকেট খেলাটা ছিলো তার কাছে সুন্দরতার. নৃশংসতার ছায়ামাত্রও ছিলো না তাতে।

কিন্তু হার্ভে উল্টোটা—ছোট্ট মানুষটার পিটিয়ে খেলাই ছিলো অভ্যেস। তবু, হার্ভে যেভাবে অবস্থার মোকাবিলা করেছে জ্যাকসনের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিলো না।

ছেলেটা অকালেই চলে গেছে। আমারও এটা ভাগ্য বলতে হবে, এদের দুজনের সঙ্গেই খেলতে পেরেছি। কিন্তু এসবের মধ্যে লক্সটনকে ভুললে চলবে না—সেও প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেছে তিরানব্বই করে।

তার একটা ছক্কার মার গ্যালারীর বেশ কিছুটা ভেতরে গিয়ে পড়েছিলো। সুন্দর মার—কার্ডাস লিখেছেন, ওটা দেখতে গিয়ে আমার গলায় এক শিহরন অনুভব করেছি।

আমার পাশেই ছিলেন ইংরেজ নির্বাচকদের একজন—রোবিন্স। তাঁর মুখে যে অবিশ্বাসের অভিব্যক্তি দেখেছিলাম তা আজো আমার মনে গাঁথা আছে। পরাজয় এড়াতে যে দল ব্যস্ত, তাদেরই কারুর পক্ষে সম্ভব কি এটা!

পাঁচ-পাঁচটা ছক্কা মারার পর লক্সটনের সময়ও ফুরিয়ে এলো। ছ' নম্বরেরটা মারতে গিয়ে ইয়ার্ডলের বলে ধরা পড়লো সে।

লক্সটন গেলো, এলো লিণ্ডওয়াল। স্ট্রোক মারের জুড়ি নেই তার। এদিকে টশ্যাকের হাঁটু ফুলে গেলো বোলিংয়ে। ব্যাট করার সময় ওর জন্যে একজন বিকল্প লোক চাওয়া হলো রানার হিসেবে। জনস্টন আউট হয়ে গিয়েছিলো, তাকেই লাগানো হলো রানারের কাজে।

টশ্যাকের মাঠে নামতে একটু দেরীই হয়েছিলো, তারপর হতচকিত জনতার চোখের ওপর দিয়ে উইকেটের দিকে হেঁটে গেলো সে।

জনস্টন তো রসিক, জানেনই—এখানে-সেখানে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে সে—আম্পায়ার আর ফিল্ডসম্যানদের সঙ্গে গল্পগুজব করছে। লোকের ধারণা সে নিজের আউট হওয়া নিয়ে ওকালতি করছে। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জনও উঠেছে, এমন সময়ে দীর্ঘদেহী টশ্যাককে বেরোতে দেখা গেলো।

এর মধ্যে আমরা তো একপেট হেসে নিয়েছি।

টশ্যাককে কায়দা করতে হিমসিম খেলো ইংরেজ বোলাররা। সেদিনের মতো ক্ষান্তি, অস্ট্রেলিয়ার হাতে একটা উইকেট—রান করতে হবে উনচল্লিশটা।

এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে আমাদের শেষের ব্যাটসম্যানরা—মানে জনস্টন, টশ্যাক প্রমুখরা একাধিকবার সঙ্কট মুহূর্তে শক্ত হাতে ব্যাট ধরেছে।

দুজনই ছ'ফুটের ওপর লম্বা, মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। শেষের ব্যাটরা রক্ষণাত্মক খেলায় এল. বি. ডব্লিউ. হয় প্রায়ই, বা কঠিন কোনো মারে খতম হয়ে যায়। ওদের কাছে ডেকে বললাম, 'তোমাদের নাগাল বেশি, কাজেই খুব শর্ট বল না হলে সোজা লাইনে খেলে যাও—'

অল্পক্ষণের মধ্যেই চালু হলো এটা। রেকর্ডে বলে এ খেলায় টশ্যাকের ব্যাটিং গড় ছিলো একান্ন, জনস্টনের কুড়ির বেশি। অন্য সকলের কুড়ির তলায় ছিলো।

কাগজে আমাকে আর ইয়ার্ডলেকে অসমাপ্ত খেলা সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দেওয়া হলো—কিন্তু আমরা খুব পাত্তা দিইনি সেসবে। উনচল্লিশ রানের মাথায় আমাদের ইনিংস শেষ করতে বলা হলো—এটা বোকামি ছাড়া আর কি বলা যায়। কিন্তু লিণ্ডওয়াল এক রান করে মাঠ ছাড়তে প্রস্তাবটা তত ফেলনা মনে হলো না। চতুর্থদিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের শুরু সম্ভাবনাময় হলেও শেষরক্ষা করতে পারেনি—কারণ গোড়াতেই কয়েকটা উইকেট পড়লো। আমাদের হিসেবে একবার ব্যাট জমে গেলে, রান বাড়তে না দেওয়াই একমাত্র পন্থা। তাই করলাম।

শেষদিনে অস্ট্রেলিয়ার হাতে সময় ছিলো তিনশো পঁয়তাল্লিশ মিনিট, রান করতে হবে চারশো চারটে।

টেস্টের ইতিহাসে এর ধারে-কাছে কিছু হয়েছে কিনা মনে হয় না। উনিশশো দুই সালে চতুর্থ ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে সর্বাধিক রান উঠেছিলো দুশো তেষট্টি, অস্ট্রেলিয়াতে তিনশো বত্রিশ। মরিস আর হ্যাসেটকে তো পাঠালাম মাঠে, যীশুনাম জপে। দুজনেই বেশ চালাচ্ছিলো, কিন্তু ইয়ার্ডলে অপ্রত্যাশিতভাবে কম্পটনের হাতে বল তুলে দিলো। স্পিন শুরু হলো কম্পটনের—এক-হাতে একটা ক্যাচও নিলো নিজের বলেই। হ্যাসেট গেলো। উন্মত্ত জনতার উল্লাসে অনুপ্রাণিত হয়ে শেষবারের মতো আমি ওই বিখ্যাত মাঠের ক্রিজের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভাবনা শুরু হলো আমাদের—জিততে হবে। হারা চলবে না, তাহলে? কি করবো?

উত্তর মিলে গেলো। ইয়ার্ডলে এবার হাটনকে বল করতে পাঠালো। লাঞ্চের তখনো আধ ঘণ্টা বাকি, মরিস আর আমাতে বাষট্টি রান তুললাম, অত্যাবশ্যকীয় রান।

বিকেলে শুরু হলো বুদ্ধির খেলা।

উইকেটের অবস্থা আদৌ আমাদের অনুকূলে নয়, জিম লেকার অফ-স্টাম্পের বাইরে বেশ কয়েকটা বল দিলো, সেগুলো লেগ-স্টাম্পের অনেক কাছ দিয়েই বেরোলো।

শুকনো, ধুলোভরা মাঠে এর অর্থ ক্রিকেটামোদীরা ভালোই জানেন। তাই, বিপদসৃষ্টিকারী বলগুলো সযত্নে এড়িয়ে, অসংযত বল পিটিয়ে চললাম, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো এই লড়াই—জীবন্ত, ঘটনার লড়াই।

মরিস আর আমি একাধিকবার অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম, প্রচণ্ড রোদে বল দেখতে কষ্ট হচ্ছিলো রীতিমতো—কিন্তু মরিসকে ধন্যবাদ, জবাব নেই তার খেলার।

বাঘের মতো খেলেছে—দুর্ভেদ্য। ওই অবস্থায় যে খেলা দেখিয়েছে সে তা তাকে অমর করে রেখেছে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যা হয়, জয়ের প্রান্তরেখায় তাকে বসে যেতে হয়েছে।

আমার শরীরও খারাপ হতে লাগলো—ভাবনা হলো, শেষরক্ষা বুঝি আর হলো না।

বিকেলের দিকে আরো অবনতি হলো, মনে হলো বুকের একটা পাশে কে যেন ছুরি চালিয়েছে—আবার পাঁজরায় কিছু হলো বোধ হয়। কিন্তু না, পরে জানা গেলো ফাইব্রোসাইটিসের পুনরাক্রমণ।

চালিয়ে গিয়েছিলাম, তারই ফাঁকে মিলারকে দিয়েছি মারের সর্ব-সুযোগ। মরিস সরে গেলে আমি আর মিলার খেলছিলাম। আর দুটো বাউণ্ডারী মারের দরকার শুধু আমাদের। ঠিক এমন এক মুহূর্তে মিলার এল. বি. ডব্লিউ. হয়ে বসলো।

জয় হলো। ইংল্যাণ্ডের গোঁড়া সমর্থকদের চোখের সামনেই। দলের সংগতি-বিনষ্টকারী কোনো সমালোচনা আমার না-পছন্দ, তবু বলবো— ইংল্যাণ্ড একটা বিরাট ভুল করেছিলো, সেটা হচ্ছে রাইট বা হলিসের মতো লেগ-স্পিনার না খেলিয়ে।

সেক্ষেত্রে আড়াইশো রানও করা সম্ভব হতো না আমাদের পক্ষে, বাইরের বল মারার চেয়ে বিপজ্জনক মার ক্রিকেটে নেই। অফ-স্পিনের বোলার যত সুবিধেই করুক দলের—লেগব্রেকের বল সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

এই জন্যেই সম্ভবতঃ ইয়ার্ডলে হাটনকে বোলিংয়ের কাজে লাগাতেন। কিন্তু তাতেই রান বেশি উঠেছে আমাদের। ইয়ার্ডলেকে কথাও শুনতে হয়েছে এ নিয়ে। রাবারের হারজিত ঘটলো একটা গৌরবময় খেলাশেষের সঙ্গে সঙ্গে। চার্লস ব্রে'র মতো কঠোর সমালোচককেও লিখতে হয়েছে, "আমার জীবনের স্মরণীয় টেস্ট খেলাগুলোর অন্যতমরূপে চিহ্নিত হয়ে রইলো এই খেলা।"

ওভালে : টেস্ট থেকে বিদায়

এই ঐতিহাসিক জয়ের পর অনেকেই ধরে নিয়েছেন বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু তার কিছুই হয়নি। বস্তুতঃ খেলার পর আমরা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় মাত্র পেয়েছি ডার্বির ট্রেন ধরার জন্যে। সারাদিন খেলে স্নান করার সময় পর্যন্ত পাইনি। ট্রেনে খাবার কামরাও ছিলো না। তার ওপর প্রচণ্ড গরম পড়েছে, ট্রেনও লেট চলছে। রাত এগারোটায় গন্তব্যে পৌছনো গেলো।

পৌছনো মাত্রই কিন্তু দেখি খানা তৈয়ার। হোটেলের ম্যানেজারকে ধন্যবাদ। অনেক চা খেয়েছি সেদিন, মনে পড়ে। মালপত্র যখন পৌছলো তখন রাতের প্রথম প্রহর শুরু হতে দেরী নেই।

পাঁজরার ব্যথা কষ্ট দিয়েছে রাতভোর, তাই নিয়েই খেলতে নেমেছি ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে।

প্রথম দিনের খেলার পর পরের দিনগুলোতে খেলার উন্নতি হয়, এটা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়, সব খেলাধুলোর ব্যাপারে। কিন্তু প্রথম দিনের অসাধারণ পরিশ্রমের পর বাকি খেলাগুলোতে উন্নতি কচিৎ নজরে পড়েছে আমার জীবনে। শরীর ও মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়াতেই এটা হয় বোধ হয়।

ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে খেলার দিন আমাদের অবস্থাও তাই হয়েছিলো। ভাগ্যক্রমে ওদের দলের তুজন খ্যাতিমান খেলোয়াড়—জর্জ পোপ আর কপসন খেলতে পারেনি।

তারপর খেলার গতি দেখে মনে হলো আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি করলাম বাষট্টি, মিলার পাঁচটা চার আর একটা ছক্কা করলো অল্প সময়েই।

ইনিংসের জয় হলো খেলায়। ওদের গ্ল্যাডউইন আর জ্যাকসন, তুটি নতুন ছেলে খুব ভালো বল করলো।

খেলার দ্বিতীয় দিনের শেষে—সন্ধ্যাবেলায় বিজয়োৎসবের আয়োজন হলো। অ্যাশেস বিজয়ের উৎসব। বাইরের কেউই যোগ দেননি, বড় আনন্দে কেটেছিলো দিনটা।

তারপর সোয়ানসি—লণ্ডন হয়ে অবিরাম ক্লান্তিকর যাত্রা। আমি লণ্ডনে থেকে গেলাম। কাউন্টির শীর্ষ দল গ্ল্যামরগ্যানের সঙ্গে রওনা হয়ে গেলো হ্যাসেট দলবল নিয়ে।

শেষদিনে বৃষ্টি হয়ে খেলা মাটি হলো।

পরের খেলা ওয়ারউইকশায়ারের সঙ্গে, যে দলের নিয়মিত খেলোয়াড়-তালিকায় রয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের প্রিচার্ড (আটচল্লিশ সালের শ্রেষ্ঠ বোলার ইংল্যাণ্ডের), হলিস, নিউজিল্যাণ্ডের ডনেলী (স্ন্যাটা), ডলেরী আর চৌকস ভারতীয় খেলোয়াড় কারদার।

সারা খেলাটাই ভিজে পিচে হলো, বিপজ্জনক না হলেও স্পিন বলের পক্ষে আদর্শ মাঠ।

এ খেলাতেও জিতলাম। তবে তুটো ব্যাপারে মতদ্বৈধ ছিলো—ম্যাককুলের একটা স্লিপের ক্যাচ আর আমাদের পয়লা জুটি ব্রাউন আর

মরিসের 'হিট উইকেটে' আউট হওয়া। এ রকম ঘটনা আর কোনো খেলায় ঘটতে দেখিনি।

খেলায় দেখবার ছিলো একটা ব্যাপার—হলিসের বোলিং। ক্রমাগত তেতাল্লিশ ওভার বল করে ছেলেটা একশো সাত রানে আটটা উইকেট নিয়েছিলো। পিচের সাহায্য পেলেও, লেংথ আর দিকনির্ণয়ের কাজ নির্ভুল তার।

ফিরতি খেলা ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে পড়লো, ওয়াশব্রুকের সাহায্যার্থে খেলা বলেই উল্লেখযোগ্য। ওয়াশব্রুকের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং সাহায্য চালু রাখার জন্যে যথাসাধ্য শক্তিশালী দল নামানো হলো। সন্দেহ ছিলো বারনেস আর টশ্যাককে নিয়ে। বারনেস পারলেও, টশ্যাক খেলতে পারেনি—সফরের বাকি খেলাগুলোতেও নয়, অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার আগে অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিলো হাঁটুতে। টসে জিতে ব্যাট শুরু করলাম, কিন্তু ওদের ন্যাটা স্পিনার রবার্টসের মোকাবিলা করা দুরূহ হয়ে পড়লো। ছাব্বিশ রানে পাঁচটা উইকেট নিয়ে বসলো ছেলেটা।

তাহলেও, তিনশো একুশ রান হলো আমাদের। ল্যাঙ্কাশায়ার প্রত্যুত্তরে মাত্র একশো ত্রিশ রানে ইনিংস শেষ করলো।

এর মধ্যে ওয়াশব্রুকের হাতে বারকয়েক চোট লাগলো, পরে আর খেলতেই পারেনি বেচারা।

প্রায় প্রতিটি ব্যাটসম্যানেরই চোট লেগেছে। আমার লাগলো বাঁ হাতের চেটোয়। জীবনে বাঁ হাতে চোট এই একবারই।

ফলো-অন করাতে পারতাম, কিন্তু আর্থিক ব্যাপার চিন্তা করে করলাম না। শেষ দিনে নট আউট থেকে একশো তেত্রিশ রান করেছিলাম। তার মধ্যে লাঞ্চের আগেই একশো আট।

লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার ভাগ্য অনেকেরই হয়নি। উনিশশো আটচল্লিশে লর্ডসে অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের খেলায় দলগত রান হয়েছিলো সাতান্ন, যে খেলায় অংশ নিয়েছিলো ইংল্যাণ্ডের বাছাই তরুণেরা।

তবু সমালোচনা হয়েছিলো—আমার খেলা নাকি 'ভোঁতা' হয়েছে। এসব সাংবাদিকদের কি করে যে খুশী করা যায়!

'ভোঁতা' খেলাই যদি খেলে থাকি তাহলে ওই মাঠে পোলার্ড, গ্রিনউড, আইকিন, রবার্টস আর ক্র্যানটনের মতো বোলারদের বলেই হয়েছে। তাহলে 'বড়' খেলা থেকে অনেক আগেই অবসর নিতে হতো আমাকে। ম্যাঞ্চেস্টার থেকে সাণ্ডারল্যাণ্ড—খেলা ডারহ্যামের সঙ্গে। আবার বৃষ্টি, খেলা বন্ধ। ফেরো লণ্ডন, শেষ টেস্টের জন্যে।

রবিবারের সন্ধ্যেটা কাটলো অস্ট্রেলীয় শিল্পী আইলিন জয়েসের একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। তবু, ফাঁক থেকে গেলো, কারণ জয়েস কদিন আগে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলেন, এবং দিনটা ছিলো প্রচণ্ড গরমের। অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণের মধ্যেই শিল্পী অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

শেষ টেস্টের আগে প্রবল বৃষ্টি নামলো লণ্ডনে। খেলা হলেও ভিজে পিচে হবে এটা ধরেই নিয়েছিলাম, ফলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের সুবিধেই হবে এতে।

কিন্তু তাঁরা শীগগিরই—বড় শীগগির হতাশ হয়েছেন।

ওয়াশব্রুক নেই, বদলে এলো তরুণ ডিউয়েস পয়লা জুটিতে, সঙ্গে লেকারের অনুপস্থিতিতে হলিস।

এই প্রথম আমাদের দলে লেগ স্পিনার অন্তর্ভুক্ত হলো। গোড়াতে মনে হয়েছিলো পিচ মোটামুটি শক্তই আছে। কিন্তু পরেও স্যাঁতসেঁতে ভাব থেকেই গেলো এবং রান তুলতে কি অবস্থা হবে অনুমান করে নিলাম।

আরও একবার 'হেড' ডেকে টসে হারলাম, এটা নিয়ে টেস্টে আটবার হার হলো।

ইয়ার্ডলে ব্যাট নিলো, ভালোই করলো— আমি জিতলেও তাদেরই ব্যাট দিতাম। কারণ একটাই—মাঠের অবস্থা।

ওভালে আমার প্রথম খেলায় জখম হয়েছিলাম, মাঠ থেকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিলো আমাকে, আর ইংল্যাণ্ড তার টেস্টের সর্বাধিক রান তুলেছিলো—সাত উইকেটে নশো তিন রান॥

এবার আমার অধিনায়কত্বের শেষ পালা—ইংল্যাণ্ড করলো বাহান্ন, স্বদেশের মাটিতে টেস্টের সর্বনিম্ন রানসংখ্যা।

নেতার কাছে স্বপ্নময় দিনই বটে।

ইভান্স টিমে ভালেই শুরু করেছিলো, তারপর মিলারের একটা বল ডিউয়েসকে বসিয়ে দিলো। এডরিচ এবার জনস্টনের বলে একটা আলগা 'পুল' করলো কিন্তু হ্যাসেট হুমড়ি খেয়ে স্কোয়ার লেগে ক্যাচ নিলো।

কম্পটন নামতেই আমি আর্থার মরিসকে স্কোয়ার লেগের পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

দশ বছর আগে লর্ডসে কম্পটনকে দেখেছি বল হুক করতে। বল কোন্‌দিকে ছুটেছিলো পরিষ্কার মনে রেখেছি, এই ভেবে যে আবার সেই মার দেবে কম্পটন।

দিয়েছিলোও সে। মরিস ধরেছিলো সেটা—দ্রুত নিশ্চিত ভঙ্গিতে। এবার ট্যালনের সুযোগ—ক্র্যাপকে ধরতে ভুল হলো না তার। এর পর বেশ কিছুক্ষণ আমাদের ফিল্ডিংয়ে লোকের দরকার হয়নি। কারণ লিন্ডওয়াল পরপর চার-চারবার স্টাম্প ওড়ালো এবং সবশেষে হাটন—যে এতোক্ষণ আমাদের আক্রমণকারীদের কলা দেখিয়েছে, লেগে বাউণ্ডারী মারতে গিয়ে নাকাল হলো ট্যালনের হাতে। বাঁ হাতে বল ধরে পড়ে গিয়েও সেটা মাথার ওপর বাড়িয়ে ধরে রেখেছিলো। উইকেটে এর চেয়ে ভালো ক্যাচ আমার চোখে পড়েনি।

দু ঘণ্টা দশ মিনিটে ইনিংস শেষ হলো।

বাহান্ন রানের মধ্যে ন'জন ব্যাটসম্যান মিলে করেছিলেন ন' রান।

হাটন একা তিরিশ।

লিন্ডওয়ালের বোলিং গড় ষোলোর বেশি ওভারে ছটা উইকেট, কুড়ি রানের বিনিময়ে। তার মধ্যে লাঞ্চের পরে আট রানে পাঁচটা।

তাহলে? ইংল্যাণ্ডের কি হলো এবার?

অন্ততঃ একবারের জন্যে বলতে দিন—খেলায় ফিল্ডিং আর বোলিং অসাধারণ হয়েছে।

ইংরেজরা ব্যাট করতে পারেনি, আর হাটন একা রক্ষণাত্মক খেলা খেলেছে। একশো তিরিশ মিনিটে একটা বাউণ্ডারী মারতে পেরেছে সে—তার শেষ রান তোলার মার।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ব্যাট শুরু করলো বারনেস আর মরিস। অনায়াসে ছাড়িয়ে গেলো ইংল্যাণ্ডের স্কোর, আধ ঘণ্টারও কম সময়ে। নিখুঁত, আদর্শ টেস্টীয় ভঙ্গিতে একশো সতেরো রান তোলার পর বারনেস হলিসের বলে ইভান্সের হাতে ক্যাচ আউট হলো।

সেদিনের বিরাট সংবর্ধনায় আমার মন আঠারো বছর পিছু হাঁটলো—একই মাঠে খেলা, টেস্টের চূড়ান্ত খেলা—জ্যাক হবসের কথা মনে পড়লো।

একই দৃশ্যের পুনরভিনয় হলো। ফিল্ডসম্যানরা ঘিরে দাঁড়িয়ে 'থ্রি চিয়ারস' দিলো, আমার শুভ কামনা করলো (আগামী দিনের অবশ্যই), আবার খেলা চললো।

আমি তো ভালো করে খেলতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু তা তো হলো না। সংবর্ধনার আবেগে দুলছি আমি তখন, ভাবনা বাড়লো—যে কোনো ব্যাটসম্যানের মানসিক স্থৈর্যের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট।

হলিসের প্রথম যে বলটা খেলেছিলাম, সেটা আদৌ দেখতে পেয়েছিলাম কিনা মনে পড়ে না।

দ্বিতীয় বল এলো, নিখুঁত লেংথের গুগ্‌লি। বোকা বনলাম এবার—ব্যাটের ভেতরের দিকটা কেবল ছুঁয়েছিলো বলটা—অফের বেল পড়ে গেলো!

প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেছি—মাথা মাটির দিকে।

শেষ টেস্টে শূন্য হাতে ফেরা।

লণ্ডনের এক কাগজে লিখলো :

> গতকাল সারা দিনটাই ছিলো টেস্ট নাটকের অংশ।
>
> ...যখন উইকেটে পৌঁছলেন তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংস খেলতে, বিপক্ষীয় খেলোয়াড়েরা তাঁকে অপার শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ফিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে জয়ধ্বনি করেছে তিনবার, উল্লাসে ফেটে পড়েছে জনতাও।
>
> কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে এ প্রত্যাশা অভাবনীয়!...
>
> কিন্তু অসংগতি দেখা গেছে—সব দিকপাল খেলোয়াড়দের শেষ খেলার যেভাবে সমাপ্তি ঘটেছে এটা তার ব্যতিক্রম। কিন্তু তবু প্যাভিলিয়ানে ফেরার সারা পথটাই জনতা জানিয়েছে তাদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি।
>
> প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেলো একটা মানুষ, দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে,

আবেগভরে। পথে যেতে যেতে হাত থেকে খুলে পড়েছে দস্তানা, তুলে নিয়েছেন—যেন স্বপ্নে হেঁটে চলা।

জনতার হল্লোড় তখনো চলছে—কে যেন বিদায়ও জানালেন—

মাঠের গেটটাতে একটা ছোট্ট আওয়াজ…মিলিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্যে, টেস্টের দৃশ্য থেকে।

আপনি হয়তো ভাবছেন ওভালে আমার শেষ ইনিংসের উদ্ধৃতি দিচ্ছি আমি। না, ভুল করেছেন—এটা জ্যাক হবসের তিরিশ সালের শেষ প্রস্থান-পর্ব (ওভালে আমার প্রথম প্রবেশ)।

কিন্তু এতো অদ্ভুত মিল আমাদের যে পুনরুদ্ধৃতির দরকার হলো। তবু ওয়াল্টার মারডোচের মতো পণ্ডিত মানুষও বলেন ইতিহাস নাকি পুনরাবৃত্ত হয় না।

এ ক্ষেত্রে তো হলো।

কিন্তু খেলা তো শেষ—ইংল্যাণ্ড সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

লড়াই ভালোই চালিয়েছিলো ইংল্যাণ্ড, আশাও হয়তো ছিলো—কিন্তু আর্থার মরিস ভেস্তে দিয়েছে। অনবদ্য খেলা খেলেছে সে। মরিস রান-আউট হয়েছিলো। এই ন্যাটা হাতের ছেলেটা শক্তি সঞ্চয় করেই চলেছে, একশো ছিয়ানব্বইতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে শেষে। তাকে বিশ্বের সেরা ন্যাটা ব্যাট হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। খেলার সম্পর্কে আর বলার বিশেষ কিছু নেই—অস্ট্রেলিয়া তার বল আর ফিল্ডিংয়ের যাদু আর একবার দেখাতে পেরেছে, লিণ্ডওয়াল তার সর্বব্যাপী হাতে কম্পটনকে অফে ধরেছে চোখের নিমেষে। হাটন এবারও অনেক সময় ছিলো উইকেটে, প্রায় সমস্তটুকুই রক্ষণাত্মক খেলায়—কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

শেষ তিনটে উইকেটের একটি কাহিনী আছে—টেস্টের খেলাগুলোতে লিণ্ডওয়াল সাতান্নটা উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাকডোনাল্ডের রেকর্ড ছুঁলো।

আরও কি পাওয়া সম্ভব ছিলো তার পক্ষে? হয়তো ছিলো, কিন্তু শেষ তিনটে উইকেট নিয়ে বিল জনস্টনও একই পর্যায়ে এসে গেলো।

মাঠেই প্রশস্তি শুরু করলেন লিভেসন-গাওয়ার আর ইয়ার্ডলে, আমিও উত্তরে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

জনতাও জানিয়েছিলো তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন, আমাকে—দলেরও সকলকে। ইংল্যাণ্ড যদি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে তাহলে তিপান্ন সালের ওভালের ইতিহাস লেখা হবে অন্যভাবে।

খুচরো খেলা

সফরের প্রাথমিক কাজ—টেস্ট খেলা তো হলো। বাকি থেকে গেলো পাঁচটা প্রথম শ্রেণীর আর দুটো দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলা।

এর প্রথমটা পড়লো কেণ্টের সঙ্গে, ক্যাণ্টারবেরীর মাঠে। প্রচুর লোকের সমাগম হলো খেলায়। অস্ট্রেলিয়া এ খেলাতেও তার প্রাধান্য বজায় রাখলো।

টসে জিতে ব্যাট শুরু করলাম আমরা। মোট রান হলো তিনশো একষট্টি, তার মধ্যে ব্রাউনের অবদান একশো ছয়।

কেণ্ট প্রথম ইনিংসে একান্ন রান করতে পেরেছিলো, ফলো অনে একশো চব্বিশ। এবারও বিপর্যয় ঘটালো লিণ্ডওয়াল আর জনস্টন। পমন আর ইভান্সের জুটিতে বত্রিশ মিনিটে অবশ্য একাত্তর হয়েছিলো, চাঞ্চল্যকর বইকি!

কভারে ডেভিসের ফিল্ডিংও অভিনব।

এর পর লর্ডসে খেলা হলো 'জেণ্টলমেন অফ ইংল্যাণ্ড' দলের সঙ্গে। ইংরেজ দলে ইয়ার্ডলে থাকলেও, অধিনায়কত্ব করলো রোবিন্স। রোবিন্সকে নেতৃত্ব দেবার দাবী সারা মরসুম ধরে চলেছিলো। ওর সমর্থকরা তার মিডলসেক্সের অনবদ্য অধিনায়কত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলো। অপ্রত্যাশিত কোনো কায়দায় বিপক্ষ দলকে নাজেহাল করারও নাকি ক্ষমতা আছে তার।

আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিলো না। টসে জিতে ব্যাট ধরলাম। তিন উইকেটে হলো চারশো আটাত্তর।

ব্রাউন করলো একশো কুড়ি, হ্যাসেট নট আউট থেকে একশো উনিশ। আমি মনের আনন্দে খেলে দেড়শো করে ছেড়ে দিলাম ব্যাট। ফলে ইংল্যাণ্ডের চারটে সফর মিলিয়ে ছ' হাজার রান করলাম; অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ এই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেননি।

খেলার তারিখটাও স্মরণীয়, কারণ সেদিনই আমার চল্লিশতম জন্মদিনও। এই উপলক্ষ্যে এক ভোজসভার আয়োজন হলো—একটা খোলা বইয়ের আকারে কেক তৈরী হলো। কেকের আয়তন চওড়ায় আঠারো ইঞ্চি।

একটা পাতায় লেখা ছিলো :

ডন ব্র্যাডম্যানকে
আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
লর্ডসের সকলে॥

আর এক পাতায় গোলাপের তোড়া, ওপরে ডান হাতের কোণে আমার একটা ছবি। তলার দিকে কোণায় কোণায় ক্যাঙারু একটা করে। এম. সি. সি.র সভাপতি গাউরির আর্লের উপহার এগুলো। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বললেন তিনি, একদিন আগেই অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো—খেলা তৃতীয় দিন পর্যন্ত গড়াবে না এই আশংকায়।

ওই দিনই আমরা ইনিংস শেষ করেছি। পাঁচ উইকেটে ছশো দশ রান করে। হ্যাসেট অপরাজিত ছশো করেছিলো।

সিম্পসন ছাড়া 'জেন্টলমেন'দের কেউই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি। ভদ্রলোক তাঁর নটিংহ্যাম আমলের কিছু ফর্ম দেখালেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে এডরিচ সেঞ্চুরী করলো। খেলা সে ধরে রাখলেও এক ইনিংস আর একাশি রানে জিত হলো আমাদের। তখনো হাতে পঁয়ত্রিশ মিনিট আছে। শেষ দিনে আমাদের ছেলেরা আমাকে ঘিরে 'শুভজন্মদিন' গানটি সমস্বরে গাইলো, লর্ডসের মাঠে অভূতপূর্ব ঘটনা। এটা খেলার আগে। এখানেই শেষ না, খেলাশেষে জনতা প্যাভিলিয়ানের সামনে একই গান গাইলো, সঙ্গে 'অল্ড ল্যাং জাইন'-ও। আমাদের অনেকেই বেরিয়ে হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছি তাদের কাছ থেকে।

দিন কতো বদলেছে আজ!

চল্লিশ বছর পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের সঙ্গে আমার মিতালির অবসান ঘটলো। আমার মনের মতো করে খেলার শেষ ঘটলো এক স্বস্থ পরিবেশে।

গর্ব আর বেদনার মিশ্র অনুভব নিয়ে মাঠ ছেড়েছি সেদিন। সামারসেটের সঙ্গে খেলায় আর নামিনি। দেহে আর মনে অসীম ক্লান্তি।

এখানেও অস্ট্রেলিয়ার সেই সার্বিক জয়। পাঁচ উইকেটে পাঁচশো ষাট। সামারসেটের দুটো ইনিংসে একশো পনেরো আর একাত্তর। হার্ভে আর হ্যাসেট করলো সেঞ্চুরী। রনিকে সেঞ্চুরী করাতে সকলে আপ্রাণ সাহায্য করলেও শেষরক্ষা হলো না—নিরানব্বইয়ের মাথায় তার প্রচণ্ড জোরের একটা মারে ক্যাচ উঠলো; দিনের শ্রেষ্ঠ বলও ছিলো সেটা। ইয়ান জনসনও করলো শত রান—তার প্রথম সেঞ্চুরী।

প্রথম শ্রেণীর শেষ খেলাটি হলো হেস্টিংসে, দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের এক সম্মিলিত একাদশের সঙ্গে। নেতৃত্ব করলেন ব্রায়ান ভ্যালেন্টাইন। সেই কাহিনী—সাত উইকেটে পাঁচশো বাইশ। সেঞ্চুরীর দলে হার্ভে, হ্যাসেট আর আমি। লক্সটনও হয়তো দলে জুটে যেতো কিন্তু তার আগেই খেলা ছেড়ে দিলাম আমরা।

বেশ খেলা-খেলা ভাব চললো সারা সময়—হালকা চালে। বিল ব্রাউন যোলো রানে চারটে উইকেট পেলো।

তারপর চললো বৃষ্টি আর হাওয়া। খেলা অমীমাংসিত রইলো। একটা অনুষ্ঠানের আয়োজনও হলো শেষে, উৎসব সমিতির তরফে স্যর পেলহ্যাম ওয়ারনার ডেনিস কম্পটনকে রূপোর স্মারকপত্র দিয়ে সম্মানিত করলেন। কম্পটন সেই মরসুমে সর্বাধিক সেঞ্চুরী আর রানের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলো।

লজ্জানম্র কম্পটন তার বক্তব্য রাখতে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করেছে। আর একবার স্কারবরোতে, যেখানে একাধিক অস্ট্রেলীয় দল ঘোল খেয়েছে। তার মধ্যে উনিশশো একুশের আর্মস্ট্রংয়ের দল আর আটত্রিশের সফরকারীরাও ছিলো।

এটাকে ষষ্ঠ টেস্ট খেলার আখ্যা দেওয়া হয়। আটত্রিশের পুনরাবৃত্তি

ঘটাতে ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দলটি অত্যন্ত শক্তিশালী, যদিও কম্পটন আর ওয়াশব্রুক খেলেনি।

রোবিন্স টসে জিতে খেলা শুরু করলো। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হলো ভেলকি। লিণ্ডওয়াল হাটনকে নামিয়ে দিলো।

ফিশলকের ব্যক্তিগত রান উঠলো সবার বেশি—আটত্রিশ। মোট রান একশো সাতাত্তর। লিণ্ডওয়াল ছটা উইকেট পেলো।

আমাদের হলো আট উইকেটে চারশো উননব্বই, খেলা ছাড়ার আগে। বারনেস করলো একশো একান্ন, শেষ একান্ন রান মাত্র পঁচিশ মিনিটে, তিনটে ছক্কা আর সাতটা চার মেরে।

আমার রান হলো একশো তিপান্ন, একশো নব্বই মিনিটে। তারপর খেলা ছেড়ে দিলাম।

লক্সটন আঘাত পেয়েছিলো খেলায়—নাক ভেঙে গেলো তার, লেগের একটা বল পেটাতে গিয়ে।

আমি জেতার চেষ্টা করিনি, কারণ বোলাররা পরিশ্রান্ত—বিশেষ করে লিণ্ডওয়াল আর জনস্টন।

এরই মধ্যে একদিন লাঞ্চের ফাঁকে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি সংস্থার সভাপতি এক ভোজসভায় আমাকে সংস্থার 'আজীবন সদস্য' ঘোষণার পর একটা রূপোর ট্রে উপহার দিলেন, সাদা গোলাপ বসানো মাঝখানে—লেখা রয়েছে :

ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাবের উপহার

ডন. জি. ব্র্যাডম্যানকে

লীডসের হেডিংলেতে তাঁর অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ :

উনিশো তিরিশ : তিনশো চৌত্রিশ

উনিশশো চৌত্রিশ : তিনশো চার

উনিশশো আটত্রিশ : একশো তিন আর ষোলো

উনিশশো আটচল্লিশ : তেত্রিশ আর একশো তিয়াত্তর নট আউট

এ সম্মানপ্রাপ্তি ইংল্যাণ্ডের বাইরে একমাত্র আমার ভাগ্যেই জুটেছে। এরপর ম্যানচেস্টার আর ল্যাঙ্কাশায়ার সংস্থার তরফ থেকেও আজীবন সদস্য হবার আমন্ত্রণ এসেছে। এ প্রসঙ্গে একটা চিঠির উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

আমাদের সংস্থার আজীবন সদস্য হবার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপনের জন্যে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

সমিতির পক্ষ থেকে বলতে পারি অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আপনার অবদান অতুলনীয়। শুধু তাই নয়—আপনার ব্যক্তিগত আকর্ষণ, সৌজন্যবোধ, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও বিনয়ের যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তারও তুলনা নেই।

একান্ত বিনীত

আর হাওয়ার্ড

সম্পাদক

হ্যাম্পশায়ার থেকেও সংবর্ধনা জানানো হলো।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া একটা ব্যক্তিগত কৃতিত্বের গর্বও আমার আছে—অস্ট্রেলীয় দলের অপরাজেয় সফরের নেতৃত্বের। পূর্বসূরীদের সকলের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরী করেছে আমার দল। টেস্টের বাইরে কোনো দলই তিনশোর বেশি রান করতে পারেনি আমাদের বিরুদ্ধে। আমাদের বিপক্ষে শুধু টেস্টের খেলোয়াড়রাই সেঞ্চুরী করেছে।

একত্রিশটা খেলার তেইশটায় জিতেছি (পনেরোটা ইনিংসে), আটটা খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

এর আগে শুধু দুটি অস্ট্রেলীয় সফরকারী দল শক্তিশালী বলে চিহ্নিত হয়ে আছে: একুশ সালের আর্মস্ট্রংয়ের দল শতকরা আটান্নটি খেলায় জিতেছে, গড় হিসেবে: ডারলিং—উনষাট।

আটচল্লিশের দলের গড় ছিলো বাহাত্তর।

তবে আবহাওয়ার তারতম্যও খানিকটা দায়ী এই হেরফেরের জন্যে। আমাদেরও অসুবিধে ছিল: ম্যাককুলের চোট, লিণ্ডওয়াল চালিয়ে গেছে পায়ের জখম নিয়ে, লক্সটনও তাই। লর্ডসে মিলারকে পাওয়া যায়নি বল করার জন্যে। লীডসে ঝামেলা হয়েছে টশ্যাককে নিয়ে। বারনেস বেশ কয়েকটা খেলায় যোগ দিতে পারেনি।

ওদেরও ওলটপালট হয়েছে—রাইট, ওয়াশব্রুকও খেলতে পারেনি।

এক ব্র্যাডফোর্ড ছাড়া কোনো খেলায় হারবার প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ সে খেলায় আমরা দশজনে খেলেছি।

আমাদের দল সফরকারী দলের সর্বোত্তম কিনা সে বিচার করবে ইতিহাস, কিন্তু আমি স্বস্তি পেয়েছি একটা ব্যাপারে—সেটা হচ্ছে দলের শক্তি। আমাদের সাতজন খেলোয়াড় হাজার রান সম্পূর্ণ করেছে সফরে। আটজনও হতে পারতো, লক্সটনের আরো সাতাশ রান যুক্ত হলে।

এদের অনেকেই খেলা ছেড়ে দিয়েছে স্বেচ্ছায়।

আমার পরেই সর্বোচ্চ রানের গড় ছিলো আর্থার মিলারের। মিলার এই প্রথম ইংল্যাণ্ড সফর করলো।

একশোটা উইকেট কিন্তু নিতে পেরেছে বিল জনস্টন।

রে লিণ্ডওয়াল সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকে গেছে—সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলীয় বোলার হিসেবে গণ্য করা চলে কি তাকে? জানি না।

তবে তাকে ম্যাকডোনাল্ডের সমকক্ষ বলে মনে করতে দ্বিধা নেই।

আবার খেলার কথায় আসি—স্কটল্যাণ্ডে দুটো খেলা হলো, এবং দুটোই জেতা গেলো বিরাট ব্যবধানে।

ভালো দলরূপে চিহ্নিত না হলেও স্কচদের আতিথ্য আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে।

অ্যাবারডিনে আমার শেষ ইনিংসে উনআশি মিনিটে একশো তেইশ রান করেছিলাম, অপরাজিত থেকে। স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণে যাবার আগে সম্রাট আর সম্রাজ্ঞীর অতিথি হয়েছি বালমোরালে। এডিনবরার ডিউক আর যুবরানীরা ছিলেন চায়ের টেবিলে। দিনটি লাল অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে আছে আমার জীবনে। তবে একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছিলো—অনেকগুলো ছবি তোলা হয়েছিলো অনুষ্ঠানের। তারই একটাতে আবিষ্কৃত হলো, আমি রাজপরিবারের সঙ্গে ঘুরছি প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

অশিষ্টাচার!

এ নিয়ে স্বপক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখিও হলো।

ইংল্যাণ্ডের মানুষেরা আমাকে সত্যিই ভালবাসেন এবং তারই

নিদর্শনস্বরূপ দিয়েছেন ঐতিহাসিক ওয়ারইউক ফুলদানী। এই ফুলদানী ঘিরে অনেক কাহিনী—অমূল্য বস্তু এটি।

ইংল্যাণ্ড আর তার মানুষকে আমিও ভালবেসেছি, অন্তর দিয়ে। থেকেছি সেখানে, এখনো থাকতে পারি—ইংরেজ বন্ধুদের অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়ায়।

কিন্তু, এবারের বিদায় অনির্দিষ্ট সময়ের, জানি না ফিরবো কিনা আর কোনোদিন।

ইয়ার্ডলে, রোবিন্স আর এম. সি. সি.-র সহ-সম্পাদক রনি এয়ার্ড এসেছিলেন টিলবারী পর্যন্ত—বিদায় জানাতে।

জেটি ছেড়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চললো জাহাজ, মানুষগুলো ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শুধু রুমালগুলো চোখে পড়ছে—কেউ কেউ চোখেও দিচ্ছেন রুমাল। অনেক প্রশংসাভরা পত্রও পেয়েছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটের রাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিপ নোয়েল বেকারের চিঠিটা—পঁচিশে সেপ্টেম্বর লেখা হয়েছিলো চিঠিটা :

> …অস্ট্রেলিয়ার কোনো দল ইতিপূর্বে এ ধরনের অবিচ্ছিন্ন বিস্ময়কর সাফল্য দেখাতে পারেননি।
>
> কিন্তু আপনার সার্থকতা তো শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ নয়—এতো জনপ্রিয়তা আর কোনো খেলোয়াড়ের ভাগ্যে ঘটেছে বলে জানি না।
>
> কোনো দল সখ্যতার রাখীবন্ধনেও বাঁধতে পারেনি এমন করে।
>
> অস্ট্রেলিয়া এবং আমার দেশ উভয়েই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, এবং আশা করি এ জন্যে আপনিও গর্বিত।

এক্ষেত্রে বলতে পারি, হ্যাঁ—'আমরা'।

অবশেষে

উনিশশো আটচল্লিশের সফর প্রবীণ-নবীনদের আলোচনার খোরাক হতে পারে। পূর্বসূরীদের সমকক্ষ কিনা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হতে পারে। রেকর্ড বইতে যে সংখ্যাগুলো গাঁথা হয়ে গেছে তা তো আর পালটানো যাবে না। কিন্তু খেলোয়াড়দের লড়িয়ে মনোভাব আর সাহসের কথা

কোনদিনই লেখা হবে না। তাদের কথা কিন্তু পৌঁছে দিতে হবে পরবর্তী যুগের তরুণদের কাছে। বই ছাড়া আর তো মাধ্যম নেই, তাই লিখে যাচ্ছি তাদের কথা। 'আটচল্লিশে'র কৃতী খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত নামচা দিলাম, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয় কিন্তু।

ডন ব্র্যাডম্যান

নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করাটা দম্ভের পর্যায়ে পড়তে পারে, কিন্তু উনিশশো ত্রিশের ব্র্যাডম্যান আর আটচল্লিশের ব্র্যাডম্যানের ফারাকটা জানা দরকার।

নেতৃত্বের দিক থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়িত হয়েছে—ফিল্ডিং আর বোলিংয়ের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছি। ক্রিকেট পুঁথির পরোয়া না করেই।

দলের আনুগত্য আমাকে অশেষ সাহায্য করেছে।

ফিল্ডিংয়ের দিক থেকে আমি কিন্তু পুরনো দিনগুলোর সঙ্গে তাল রাখতে পারিনি। বল সরাসরি এলে তা ধরেছি, কিন্তু তা নিয়ে জীবন বিপন্ন করার চেষ্টা করিনি। যৌবনে করেছি এসব—তার প্রতিফলও পেয়েছি, উনিশশো চৌত্রিশে উরুর পেশী ছিঁড়ে যাওয়ায় এক মাস মাঠের মুখ আর দেখা হয়নি।

আটচল্লিশে কোনো শারীরিক আঘাত পাইনি—চল্লিশের প্রৌঢ়ের যা কর্তব্য তাই করেছি, সফর সামলেছি।

প্রশান্ত চিত্তে ব্যাট করেছি—শক্তির চেয়ে মাথা খাটানোর কাজই করেছি বেশি। আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টা করিনি পারতপক্ষে, বরং একাধিকবার ইনিংস ছেড়ে দিয়েছি—শরীরকে সুস্থ রাখতে।

রক্ষণভাগে কিন্তু কিছু উন্নতি হয়েছে—সিদ্ধান্ত নিয়েছি সহজে। বিচারবোধেও গোঁড়ামি কমেছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে মনে হয়েছে আমার সবুজ দিনগুলোর শেষ হয়েছে, সরে যাওয়া উচিত—নতুন মুখকে জায়গা করে দিতে।

লিণ্ডসে হ্যাসেট

অসাধারণ খেলোয়াড় ও যোগ্য সহকারী। খেলার কলা-কৌশলের ওপর অপার দখল। মেজাজে থাকলে দর্শনীয় মার দেখায়। জটিলতম মুহূর্তে দায়িত্ব দেওয়া যায়, খেলার প্রয়োজনে যে কোনো ঝুঁকি নিতে পারে এমন একজন।

রক্ষণাত্মক খেলার সময়ে সময়ে প্রায় দুর্ভেদ্যই বলা যায়। ড্রাইভ আর কাটের রাজা, অতুলনীয় স্কোয়ার লেগের মারে।

ভাল ফিল্ডসম্যান—বাউণ্ডারীর লোক। শুরুতে বল দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র বারনেসের পরে নাম করা যায়।

আর্থার মরিস

আটচল্লিশের সফর শেষে মরিস সেরা ন্যাটা ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত।

ভালো খেলোয়াড়ের যা যা গুণ থাকা দরকার সবই আছে। অন্যতম—সময় নিয়ে মার দেওয়া। সব মারই সুন্দর—হুক, ড্রাইভ, কাট, গ্লান্স।

পেশীবহুল হাতের অধিকারী মরিস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শক্তির প্রয়োগ আর আক্রমণাত্মক খেলায় বিশ্বাসী।

মাঠের কাজে অত্যন্ত নির্ভরশীল। উইকেটের কাছে অসংখ্য ক্যাচ নেওয়ার কৃতিত্ব আছে তার।

বাঁ-হাতে গুগ্‌লি বল দেয়, কিন্তু তার ব্যাটিংয়ের কাছে বোলিং অকিঞ্চিৎকর।

দলের অপরিহার্য খেলোয়াড়; অধ্যয়নশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষক।

বিল ব্রাউন

আদর্শনিষ্ঠ খেলোয়াড়। সঠিক বলে নিখুঁত ব্যাট ছোঁয়ানোই তার বৈশিষ্ট্য। আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় নয়, কিন্তু প্রথম জুটি হিসেবে সার্থক।

নির্ভর করা যায় এমন একজন। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। তৃতীয় সফরে বাউণ্ডারীতে অদ্ভুত ফিল্ডিংনৈপুণ্য দেখিয়েছে।

লেগ-গ্লান্সে অতুলনীয়।

স্যাম লস্কটন

উপযোগী খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত। শক্তসমর্থ মানুষ। ড্রাইভের কাজ অনবদ্য। খেলার প্রতি নিষ্ঠা অসীম। ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। সময়ে অত্যন্ত দ্রুত বল করেছে। দলের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফিল্ডসম্যান—বিস্ময়কর কায়দায় রান-আউট নেবার ধান্ধা। নির্ভুল বল ছোঁড়ে ফিল্ড করার সময়।

কিথ মিলার

অত্যন্ত চঞ্চল। শক্ত হাতে প্রচণ্ড মারে বল খেলে। ছক্কা মারার প্রবণতা আছে, বেশির ভাগই বিস্ময়সৃষ্টিকারী। এ সম্পর্কে সতর্ক হলে আরো অনেক দক্ষ খেলোয়াড়রূপে চিহ্নিত হতে পারতো। নতুন বলে ব্যাটসম্যানের যম। স্লিপ ফিল্ডে জবাব নেই। 'জনতার বন্ধু' বলে খ্যাতিমান, অনেকটা জ্যাক গ্রেগারীর মতো। একাগ্রতার অভাবে কোনো কোনো সময়ে ব্যর্থ।

সিড বারনেস

উল্লেখযোগ্য ওপনিং ব্যাট। ভালো বলে আউট করা শক্ত, কিন্তু অনেকক্ষণ খেলার পর বল পেটাতে গিয়ে উইকেট হারিয়েছে। স্কোয়ার-আউটে অদ্বিতীয়। হাতে প্রচণ্ড জোর। জখম হয়েও খেলা চালিয়ে যেতে পারে। লেগ-স্পিন বোলার—শর্ট-লেগ ফিল্ডসম্যানও।

নীল হার্ভে

উনিশ বছর বয়স্ক স্যাটা ব্যাট। আঁটসাঁট চেহারার কিশোর। নমনীয় কিন্তু সবল কব্জি। প্রথম প্রথম দুর্বলতা দেখা গেছে খেলায়, তারপর জমে গেছে। অত্যন্ত কম সময়ে বোলিং বিপর্যস্ত করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সব রকম বলই খেলতে চেষ্টা করে, বিশেষ করে পুল আর স্কোয়ার কাটের মার।

আউটফিল্ডে অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃতি আছে। ক্যাচ ধরা আর বল ছোঁড়ার ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর।

রন হ্যামেন্স

গোঁড়া ব্যাট। ড্রাইভের খেলোয়াড়। বড় রান পায়নি খেলায়, কিন্তু ভালো ব্যাট করেছে। সঙ্কটের মুহূর্তে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে।

ভালো ফিল্ডসম্যান, ছোঁড়া নির্ভুল। মিডিয়াম বোলার।

ডন ট্যালন

পয়লা নম্বরের উইকেট রক্ষক: ফাস্ট বোলিংয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। উইকেটরক্ষকদের একজনই ওর চেয়ে ভালো ব্যাট করেছে, সে লেস এম্‌স্‌। স্লো লেগব্রেকে লেগে থাকলে উন্নতি হতো।

রন স্যাগার্স

ট্যালনের দু' নম্বর। লীডস টেস্টে ট্যালনের অনুপস্থিতিতে অদ্ভুত খেলেছে। যদিও দ্রুততা এবং ক্ষিপ্রতায় খামতি ছিলো। আড়ম্বরহীন খেলোয়াড় কিন্তু খেলায় পালিশ আছে।

ব্যাটিংয়ের ক্ষমতা সীমিত হলেও এসেক্সের বিপক্ষে সেঞ্চুরী করায় চমক ছিলো।

আর্নি টশ্যাক

চৌকশ খেলোয়াড়। ন্যাটা মিডিয়াম পেস বোলার। সোজা ব্যাটসম্যানের বল অফস্টাম্প থেকে লেগস্টাম্পে কাটতে পারে। তারপর স্পিন করে লেগ থেকে অফে।

বেশির ভাগ বলই স্লিপের; গোটা তিনেক অফে, পাঁচটা লেগে। ব্যাটসম্যানদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে ক্ষেত্রবিশেষে।

ফিল্ডিংয়ে মোটামুটি, ব্যাটিং চলনসই। তবু, টেস্টে একান্ন রান করেছে এবং তাকে আউট করতে বেগ পেতে হয়েছে।

ইয়ান জনসন

স্লো অফ-স্পিনার। শুকনো মাঠে পুরো ফর্মে খেলে, ভিজে মাঠে ভীষণ স্লো। বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে, সব সময়ে পরিকল্পনা করে চলেছে।

অসাধারণ ব্যাট—সাত নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে। ফিল্ডিংয়ে স্লিপে নির্ভরযোগ্য।

রে লিণ্ডওয়াল

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং যে ছেলেটি ধসিয়ে দিয়েছে বারবার, সেই ক্রীড়াবিদ ছেলেটার নাম লিণ্ডওয়াল। ফাস্ট বোলিংয়ের চাতুর্যে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সে। বল করেছে দলের প্রয়োজনে, আবার নিজের তাগিদেও। হাটনকে যে বলে সে আউট করেছে সে একটা খেলায়—সেটা প্রথম ওভারের চতুর্থ বল।

বল করার কেমন একটা ছন্দ ছিলো লিণ্ডওয়ালের।

দিকনির্ণয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। যে কোনো বোলারের ঈর্ষার বস্তু—প্রচুর কর্মশক্তির আধার।

মাঠে যে কোনো জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিন—কাজ চালিয়ে দেবে। ক্যাচ ধরবার জন্যেই যেন তৈরী হাত দুটো।

ব্যাটিংও টেস্ট মানের।

বিল জনস্টন

লম্বা নমনীয় চেহারার ন্যাটা ব্যাট জনস্টন। ফাস্ট মিডিয়াম বা স্লো স্পিন যা চান পাবেন প্রয়োজনানুযায়ী। সরাসরি অনেকগুলো উইকেট নিয়েছে। লিণ্ডওয়াল আর সে টেস্টের খেলাগুলোয় সাতাশটা করে উইকেট নিয়েছে।

কেন্টের খেলোয়াড় ফ্যাগ নুতুন বলে তাকেই বেশি সমীহ করতো লিণ্ডওয়ালের চেয়ে।

মেইলির মতে জনস্টনের স্থান বিল হুইটির উর্ধ্বে। স্পিন বলে সে দ্রুততম—বলের গতিও বিচিত্র। ফিল্ডিং ভালো, ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার শেষ অবস্থায় দল টিকিয়ে রাখতে তুলনাহীন।

মজার লোক।

কলিন ম্যাককুল

নিঃসন্দেহে দলের মন্দভাগ্য খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়াতে হ্যামণ্ডের দলের বিপক্ষে তার খেলা প্রতিশ্রুতিবহনকারী—আশা ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও ভালো করবে।

শুরুও করেছিলো সেইভাবেই—তারপর ডান হাতের মধ্যমাতে গোলমাল দেখা দিলো (ওই আঙুলেই স্পিন হয়)। পনেরো ওভার বল করার পরই ক্ষতের সৃষ্টি হতো, মাংস বেরিয়ে পড়ে। রক্তও পড়তো। এর পর এক সপ্তাহের বিশ্রাম।

ফলে টেস্টের তালিকা থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বাদ দিতে হয়েছে। তবে মফস্বলের ছোট খেলাগুলোতে সে সুনাম কুড়িয়েছে।

ব্যাটিং অস্ট্রেলীয় আবহাওয়াতেই বেশি উপযোগী ছিলো।

ডগ, রিং

দৃঢ়তার সঙ্গে বল করেছে—শেষ টেস্টে খেলেছে। একটা মাত্র উইকেট নিলেও দারুণ বল করেছে।

খুব দ্রুত বল করার চেষ্টা সময়ে সময়ে করেছে। ব্যাটসম্যানদের ক্রিজের বাইরে এনে মারার প্রলোভন দেখাতে পারেনি। ফিল্ডিং অত্যন্ত নিরাপদ। উইকেটের মুখে অনেকগুলো সুন্দর ক্যাচ নিয়েছে। ব্যাটিংয়ের একগুঁয়েমিও আছে, প্রয়োজনবোধে। হালকা মনের মানুষ। সব সময়ে স্ফূর্তিতে আছে।

কিথ জনসন

খেলোয়াড়দের কথা বলতে গিয়ে পরিচালকের কথা আনা উচিত নয়, তবু তাঁকে বাদও দেওয়া যায় না—কারণ সফরের বিরাট সাফল্যে তাঁর অবদান অপরিসীম।

চাকরের মতো দিনরাত খেটেছেন ভদ্রলোক। ফোন বাজলেই ছুটে যাওয়া চাই, চিঠির তাড়া তো আছেই।

সফরের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে অতিশ্রমের ফলে মনে হয়েছে শরীর ভেঙে পড়বে। পড়েনি কেন কে জানে।

সব জায়গাতেই বক্তৃতা আর দলের সুনাম পেয়েছেন, নিজের দলেরও।

ফেরার পথে জাহাজে দলের ছেলেরা একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে রূপোর স্মারকপত্র উপহার দেন, সকলের সই তাতে।

আর্থার জেমস্

ম্যাসাজিস্টই বলছি, অঙ্গমর্দনকারী কথাটা বড় কানে লাগে। আর্থারের কাজে বিরাম নেই। মধ্যরাত্রি হোক বা অন্য কোনো অসময়েই হোক সে আছেই। কোনো রকম দৈহিক অসুস্থতার কথা কানে গেলেই হলো।

কাজের আওতায় পড়ে না এমন অনেক কাজ আর্থার করতো। যেমন ধরুন—আমার সমস্ত ডাক সেই সামলাতো। আগমন ও নির্গমন, দুই-ই।

মৃদু কৌতুকের অভ্যেস ছিলো তার—বিশ্রামকক্ষের আবহাওয়া হালকা করার পক্ষে যথেষ্ট।

বিল ফার্গুসন

চিরনবীন স্ফূর্তিবাজ স্কোরার। এ ছাড়া মালপত্রের হিসেব রাখাও অন্যতম কাজ। তাড়াহুড়ো না করে, আবার ফেলে না রেখে কি করে কাজগুলো করেছে বিল, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। লণ্ড্রীর কাজও তার এক্তিয়ারে ছিলো।

কুলি চাই? লরি? রেল কামরার সংরক্ষণ? সবই সম্ভব তার যাদুতে—কিন্তু কোনো অনুযোগ নেই।

টিলবারী থেকে অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে চড়লাম, ক্লান্ত, কিন্তু ভরা মনে। ইংল্যাণ্ড ছাড়তে কষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা ম্লান হয়ে গেছে ঘরে ফেরার আনন্দে।

এবার বিশ্রাম, অনেক—অনেকদিনের বিশ্রাম।

টিলবারী থেকে পোর্ট সৈয়দ রাস্তা যেন এক অনাবিল আনন্দের উত্তরণ—মাথার ওপর খোলা নীল আকাশে হালকা মেঘের আমাগোনা, উজ্জ্বল সোনালী রোদ্দুরের মেলা। এবার আর সেই সমুদ্র-অসুখ নেই, সময়ে সবই বোধহয় সয়ে যায়! অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে জাহাজ ঢুকলে এক তারবার্তা পেলাম—আমি অস্ট্রেলীয় রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছি, সত্যি কি না!

এ সম্পর্কে আমি কিছু ভাববার আগেই কাগজের মানুষ আর বেতার-বন্ধুরা ভেবে ফেলেছেন।

সত্যি কথা বলতে কি এ ব্যাপারে কেউই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, মত বিনিময়ের সুযোগও ঘটেনি।

তবু এ নিয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরের পালাও হয়ে গেছে। জেটিতে জাহাজ ভিড়তেই এক মজার ব্যাপার হলো। এক শ্রমিক ভাইয়ের উদাত্ত গলা পেলাম, 'যদি পার্লামেন্টে দাঁড়ান ডন সাহেব, তাহলে শ্রমিক দলের হয়ে দাঁড়ানোই ভালো!'

কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী একটা টেলিগ্রাম পেলেন, পাঠিয়েছেন এক সংসদ সদস্য, 'আপনার স্বামীকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্যে যতটা প্রভাব বিস্তার করা দরকার, তা করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। যারা উইনস্টন চার্চিলকে দেবমূর্তি থেকে রাজনৈতিক দালালের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জমা আছে আপনার স্বামীর জন্যে, তারাই নষ্ট করে দেবে। আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ'—কে পাঠিয়েছেন এটা, জানানোর দরকার নেই। এ বার্তায় ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছি, কারণ কোনো রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে তাঁর স্বনির্বাচিত পেশায় কাউকে নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারটাকে কেমন বিসদৃশ মনে হয়েছে।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সংস্থা আমাদের ফেরার পর এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করলেন। সবকটি রাজ্য সংস্থাই এতে উৎসাহ জুগিয়েছেন। মেলবোর্নের ক্রিকেট মাঠেই আয়োজন হলো খেলার।

সফরকারী দলের সবাই খেলতে সম্মত হলেন, এক টশ্যাক ছাড়া। হাঁটুতে তখনো চোট রয়েছে তার।

খেলার কথা ভাবতেও যেমন আনন্দ হচ্ছে তেমনি উদ্বিগ্ন হচ্ছি খেলার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে—খেলার মান তো ঠিক রাখতে হবে।

যাক, সবই ঘড়ির কাঁটা মাফিক হলো।

খেলার চব্বিশ ঘণ্টার আগে তুমুল বৃষ্টি হলো—কিন্তু খেলার দিন নির্মেঘ আকাশ দেখা দিলো, মাঠ ছবির মতো।

হ্যাসেট যে দলের নেতৃত্ব করছিলো, সেই দলই টসে জিতে ব্যাট করতে নামলো। প্রথম দিনের খেলায় ন' উইকেটে তিনশো তিরাশি রান করলো। লিণ্ডওয়াল একশো চার রান করলো—তার মধ্যে পাঁচটা ছক্কা আর ন'টা চার। শনিবার দিন ইংনিস শেষ হলো চারশো ছ' রানে। আমরা তিনশো চৌষট্টি করলাম ছ' উইকেটে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলা নয়, তবু কেন যে রান তোলার জন্যে উৎকণ্ঠিত হচ্ছি জানি না।

পঞ্চাশ হাজার মানুষের এক জনতা আমাকে বিরাট সম্বর্ধনা জানালো। যাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই তাদের কাছে এর কোনো বর্ণনা দিতে যাওয়া নিরর্থক।

শুধু রান তোলার ব্যস্ততাই নয়, খেলাটা সুন্দর হওয়ানোর প্রচেষ্টাও চললো।

তারপর সাতানব্বই রান হলো ক্রমে ক্রমে। আর তিনটে রান···

বিল জনস্টনের একটা বল 'হুক' করে দিলাম মিড-অনে। দৌড় আরম্ভ করলাম, ম্যাককুলও বলের পেছনে দৌড়চ্ছে। কিন্তু আমারই জয় হলো—ম্যাককুল বল ধরেও হাতে রাখতে পারলো না, সেই সুযোগে আমার তিনটে রান হয়ে গেলো। ম্যাককুল বল ধরতে পারতো কিনা সে প্রশ্নে না গিয়েও বলতে পারি, ক্যাচ পড়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখবোধের জায়গায় এমন কৃতজ্ঞতাবোধ আর কখনো করিনি। পরের সোমবারে আবার খেলা শুরু হলো। আমরা চারশো চৌত্রিশ রানে সকলে আউট হয়ে গেলাম। হ্যাসেটের দল ব্যাট শুরু করলো আবার। নোবলটের প্রথম বলেই ছক্কা মেরে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলো বারনেস। এর একট পরেই সোয়েটারের তলা থেকে একটা খেলনা ব্যাট বের করে পরের

বল খেলার জন্যে তৈরী হলো সে। বলটা ‘স্লো’ ছিলো, ব্যাটে লেগে বারনেসের মুখে লাগলো সেটা। বারনেস এবার বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সেটা ছুঁড়ে দিলো স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো আম্পায়ারের দিকে। তার এই ছেলেমানুষী নিয়ে কথা উঠলো, কিন্তু আমার তো মনে হয় এ ধরনের হাল্কা ব্যাপারগুলো খেলার মাঠে চলতে পারে। দর্শকেরাও হুল্লোড় করে ব্যাপারটা নিয়েছিলো।

বারনেস সে খেলায় উননব্বই রান করেছিলো এবং অধিকাংশ মারই দর্শনীয়। হ্যাসেট করলো একশো দুই, দলের হলো চারশো তিরিশ। আমাকে জিততে হলে চারশো তিন করতে হবে।

উইকেট পড়তে লাগলো, আমারটাও গেলো। বিল জনস্টনের বল আমার ব্যাটের কানায় লেগে সোজা উঠলো উইকেটরক্ষকের হাতে। দুশো দশ রানে সাতটা উইকেট পড়ে গেলো, অবশ্য আর্থার এর মধ্যে তার সেঞ্চুরী মেরেছিলো একশো আট করে।

বিকেলের আগেই ইনিংস শেষ হয়ে যাবে বোধ হলো। কিন্তু, না— নাটকীয়ভাবে ঘুরলো খেলার মোড়। ডন ট্যালনের সঙ্গে প্রথমে খেললো ডগ রিং, পরে নোবলেট। ট্যালন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে যে খেলা দেখিয়েছিলো তারই নমুনা আর একবার দিলো।

হ্যাসেট খেলা শেষ করার জন্যে তড়িঘড়ি করতে লাগলো। বোলিংয়ের তীক্ষ্ণতা বাড়লো, বাড়লো ফিল্ডিংয়ের তীব্রতাও।

দলের সকলে বিশ্রামের জানলায় ভীড় করে দাঁড়ালো। টেস্ট খেলার উত্তেজনা দেখা দিলো যেন এক সাধারণ খেলায়।

অবশেষে দিনের শেষ ওভারে যখন বল করতে এলো ডুল্যাণ্ড, আমাদের তখন জেতার জন্যে দরকার মাত্র তেরোটা রান। উইকেটে শেষ দুজন ব্যাট। রান উঠতে লাগলো, শেষ বলে দরকার তিনটে রান। ট্যালন স্কোয়ার লেগে খেলে দুটো রান পেলো। খেলা সমান-সমান হলো।

এ ফলাফল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিকভাবেই এর পরিণতি ঘটেছে। তবু খেলায় প্রতিযোগিতামূলক মেজাজ ছিলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

আর একটা কথা—ডন ট্যালনের সম্ভবতঃ এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস। ট্যালন যখন বিশ্রাম-ঘরে ফিরলো, সে তখন এতো উত্তেজিত যে আমরা জিতেছি না হেরেছি এ বোধও নেই তার। শেষের দিকে খেলায় ডুবে গিয়ে রান গুনতেই ভুলে গিয়েছে।

খেলাটা এমন সার্থক রূপ নেবার জন্যে খেলোয়াড়দের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিচালকমণ্ডলী ও দর্শকদেরও।

আশাতীত অর্থপ্রাপ্তি হয়েছিলো এ খেলায়।

আমি কোনোদিনই টাকার মুখ চেয়ে খেলিনি, খেলেছি ক্রিকেটকে ভালবেসে। ইংল্যাণ্ড সফরের শেষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নেবার কথা আমার, কিন্তু এ খেলায় অংশগ্রহণ করে আনন্দ পেয়েছি।

একটি খেতাব

উনিশশো উনপঞ্চাশের পয়লা জানুয়ারী তারিখটা আমার জীবনে অবিস্মরণীয়। বছরের প্রথম দিনে খেতাবধারীদের তালিকায় অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে আমার নাম রয়েছে—আমি 'স্যর' ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান হয়ে গেলাম সেদিন থেকে।

অর্থের প্রত্যাশা যেমন ছিলো না আমার, যশের জন্যেও লালায়িত হইনি কখনো। আপনা থেকেই এসেছে এসব। পুরস্কারের কথা ভেবে পথ চলিনি। তবু, এ খেতাব অস্ট্রেলিয়ার গৌরব বাড়িয়েছে, বেড়েছে অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়ের সামাজিক পদমর্যাদা।

খেলা হিসেবে ক্রিকেটের মিলেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

খবর প্রকাশিত হবার আগের মুহূর্তগুলো বড় অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে কেটেছে—যে সম্পর্কে পাকা খবর জানি না, তা অত্যুৎসাহীদের কাছে অন্য কিছু মনে হওয়া তো স্বাভাবিক।

আগে-ভাগে বলে যাঁরা ঠকেছেন তাঁদের অবস্থা জানি তো!

একত্রিশে ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলা দেখছি

বসে, অজস্র মানুষ এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি, 'কিসের'? কেউ বললেন পরের দিনটার কথা, কেউ হেসে এড়িয়ে গেলেন কথাটা।

সেই সন্ধ্যেটা, মনে আছে আমার, শহরের বাইরে কাটিয়েছি অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেতে।

মধ্যরাত্রি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো বেতারে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন। তখন মুখ খুললাম আমি।

বাড়ি ফিরবার সময় ভোরের বেশ কিছু আগেই কাগজ কিনতে ভুলিনি। ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তেই ফোন বেজে উঠলো—আমার স্ত্রী ডাকছেন। মিটাগংয়ে বাপের বাড়ি থেকে। উনিও শুনেছেন। কিছু পরেই সদলবলে এলো দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়রা। অভিনন্দনের বন্যা বইলো।

সারাদিন বৃষ্টি হলো, তার মধ্যে কিন্তু ভিক্টোরিয়ার ক্রিকেট সংস্থা লাঞ্চের আয়োজন করে ফেললেন। সবাই ছিলেন সেখানে; দু' দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার, খবরের লোক।

ইংল্যাণ্ডের মহিলা ক্রিকেট দলটি এসে গেলেন, একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই।

ভিক্টোরিয়া ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি মিঃ জে. এ. সিটজ সুন্দর বক্তৃতা করলেন। অস্ট্রেলীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার ডঃ রবার্টসনও বললেন।

উত্তরে বললাম, 'মাননীয় সভাপতি একটা কথা বলতে ভুলেছেন, সেটা হচ্ছে আজকের এই শুভদিনে তিনিও রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন: সি. এম. জি.।'

সেই রাতে এডিলেডের ট্রেন ধরলাম।

পরের কয়েকটা দিন শুধু চিঠি আর চিঠি। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসছে। আর্ল অফ গাওরি, লর্ড ক্রসও আছেন তার মধ্যে। আসাম থেকে আট বছরের এক বাচ্চাও রয়েছে।

ক্রিকেটের আর এক গর্ব হচ্ছে প্রবীণ-নবীনদের মধ্যে সমান সাড়া জাগাতে পারে এমন খেলা। ছেলেটা লিখেছে:

স্যর ডন ব্র্যাডম্যান এস্কোয়ার,
অস্ট্রেলিয়া।

প্রিয় মহাশয়,

আমি ভারতীয়, আসামের একটি কিশোর। আট বছর বয়স আমার। জানি না এ চিঠি আপনাকে আমার লেখা উচিত হচ্ছে কিনা। যদি ভুল করে থাকি তো ক্ষমা করবেন। আপনার সম্মানপ্রাপ্তিতে এতো উচ্ছ্বসিত হয়েছি যে না লিখে পারলাম না।

আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ছবিওলা একটা সইও অবশ্য চেয়েছিলো ছেলেটি, বলা বাহুল্য তার ইচ্ছে আমি পূরণ করেছি।

নিউ সাউথ ওয়েলস ক্রিকেট সংস্থা অ্যালান কিপাক্স আর বার্ট ওল্ড্‌ফিল্ডের সম্মানার্থে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেছিলেন কিছুদিন আগে, কিন্তু যুদ্ধের সময় তা বন্ধ রাখা হয়। উনপঞ্চাশের ফেব্রুয়ারীতে খেলাটা হবে জানানো হলো।

খেলাটা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের নির্বাচনী বলে চিহ্নিত, কাজেই আমি খেলছি না।

যাই হোক নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্রিকেট সংস্থা আমাকে খেলার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করলেন—আমিও রাজী হয়ে গেলাম, খেলাটা ভালো হোক। কিপাক্স আর ওল্ডফিল্ড নিউ সাউথ ওয়েলসের জন্যে অনেক করেছেন, তাঁদের স্বীকৃতির প্রশ্নও রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের, বৃষ্টির জন্যে খেলা ব্যাহত হলো। তবু, প্রাপ্তিযোগের ব্যাপারটা ভালোই হয়েছিলো।

খেলায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলো ওপনিং ব্যাট জ্যাক মোরোনে, দুশো সতেরো রান করে। ছেলেটি পরে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো।

আমার তো নভেম্বরের পর আর মাঠেই নামা হয়নি, কাজেই খুব সুবিধে হলো না। তবু পঁয়ষট্টি মিনিটে তিপ্পান্ন রান করেছি। আমার প্রিয় মাঠের শেষ খেলায় সেঞ্চুরী করা হলো না আমার, মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও। হয়তো পারতাম না, কারণ শরীরের যা অবস্থা! কিন্তু এর

মধ্যেই বসিয়ে দিলো আমাকে কেন মিউলম্যান। এক হাতে দর্শনীয় ক্যাচ ধরেছিলো ছেলেটা।

আর্থার রিচার্ডসনের সম্মানে আর একটা খেলার আয়োজনও হয়েছিলো। আমি খেলেছিলাম তাতে।

ভিক্টোরিয়া এ খেলায় বিপুল রানের ব্যবধানে জিতেছিলো। কোনো রকমে তিরিশটা রান করে বিল জনস্টনের একটা বল খেলতে গিয়ে সেটা স্টাম্পে পড়লো। আর একটা ইনিংস রইলো হাতে, আমার জীবনের শেষ ইনিংস; প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে।

কিন্তু হলো না, শেষ খেলায় কিছু দেখানো গেলো না—ফিল্ডিংয়ে একটা বল ধরতে গিয়ে তার ওপর বেকায়দায় পা পড়ে গোড়ালিতে চোট লাগলো। উনিশশো আটত্রিশে, ওভালে একই জায়গায় চোট লেগেছিলো।

খেলা আর হলো না, বিশ্রাম-ঘরে বসে শুধু খেলাশেষের প্রহর গুনেছি।

ক্রিকেটের ইতিহাস

শিরোনাম পড়ে ভুল বুঝবেন না। খেলার ইতিহাস নিয়ে কচকচি শুরু করবো না। খেলার তাৎপর্য আর স্বার্থ নিয়ে কয়েকটা কথা শুধু বলতে চাই।

ক্রিকেটের ক্রমবিকাশ নিয়ে অনেক ভালো ভালো রচনা আছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটাতেই কবে এবং কোথায় খেলা প্রথম আরম্ভ হয়, বলা নেই।

কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে বলা হচ্ছে এগারোশো আশি সালে ক্রিকেট বা তার অনুরূপ খেলার প্রথম প্রচলন।

জন ডেরিকের লেখায় পনেরোশো পঞ্চাশ সালেই ক্রিকেটের স্বনামে উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে।

তখন কিন্তু খেলার এতো রমরমা ছিলো না। অনেক ঝুঁকি ছিলো, খেলাটা আইনানুগ কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ষোলোশো চুয়ান্নতে এলথামের ধর্মযাজকরা তো সাতজন আঞ্চলিককে

ছ' শিলিং করে জরিমানা করেই বসলেন, সাবার্বের ভূমিতে খেলার অপরাধে।

জানি না ক্রিকেট খেলার জন্যেই তাদের এই শাস্তি কিনা। তবে ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের জন্যে তাদের গুনাগার দিতে হয়েছিলো।

আইনানুগ বা বেআইনী—যাই হোক, ক্রিকেট খেলা সতেরোশো সাল থেকে পূর্ণ উদ্যমে শুরু হলো। সমকালীন কাগজে খেলোয়াড়দের ছবি পাওয়া গেছে। মাঠে ক্রীড়ারত অবস্থায় হাত ঘুরিয়ে বল করা হতো না তখন, ব্যাটগুলোও সোজা নয়—উইকেট বলতে দুটো কাঠি। অনেক তফাতে একটা থেকে অন্যটা। ওপরটায় কাঁটার মতো বস্তু, মাঝে বেল।

এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শক হিসেবে নাম করা যেতে পারে দক্ষিণের কয়েকটি কাউন্টির : কেন্ট, সাসেক্স, হ্যাম্পশায়ার আর সারে।

রিচার্ড নাইরেন, সিলভার বিলী বেল্ডহ্যাম প্রমুখদের নাম আজো শোনা যায়। অ্যালফ্রেড মিনের স্মৃতিফলকে যে সুন্দর কথাগুলো লেখা আছে, তা আজকের দিনেও যে-কোনো খেলোয়াড়ের ঈর্ষা উদ্রেক করবে।

সমুন্নত দীর্ঘদেহ পৌরুষব্যঞ্জক সুন্দর সুঠাম ছিলো কায়া
মুক্ত প্রসারিত হস্ত নির্ভীক হৃদয় উচ্ছল হৃদয়ভরা মায়া
সকলের অহঙ্কার সকলের প্রিয় দিনে দিনে সর্বহৃদিস্থিত
আমাদের নেতা বন্ধু ঘাসের তলায় কেন্টীয় প্রদেশে নিদ্রায়িত
সগর্বে বিষাদে তার নাম নেবো মুখে ভুলি যদি হবে অপরাধ
নরম ঘাসের নিচে থাক আলফ্রেড্ পৌরুষ ও হৃদয় অগাধ ॥

(ভাষান্তর : ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী)

চার বলে ওভার শেষ হতো সে সময়ে।

সংস্থা গঠনের পথিকৃৎ বোধহয় হোয়াইট কনডুইট ক্লাব, যার পত্তন সতেরোশো বিরাশিতে। ইতিহাসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে—এই সংস্থাটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে তার স্থানাধিকার করে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব। সংক্ষেপে যা এম. সি. সি. বলে খ্যাতিলাভ করেছে। সালটা সতেরোশো সাতাশি। মেরিলিবোনের কোনো জেলা বা শহরতলী থেকে নামটা এসেছে, সংস্থার খেলার মাঠ সম্ভবতঃ সেখানেই ছিলো।

টমাস লর্ড, হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের একজন শ্রমিক ছিলেন, 'লর্ডস' নামে নতুন মাঠের পত্তন করার আগে।

আঠারোশো ন'য়ে অনিবার্য কারণে টমাস লর্ডকে তাঁর আদি মাঠটি ছাড়তে হয়। সেন্ট জনস্ উডে নতুন মাঠ চালু হয়ে গেছে তখন তাঁর। পার্লামেন্টে মাঠের ভেতর দিয়ে রিজেন্টের খাল কাটার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে আরো একবার লর্ড তাঁর প্রিয় মাঠের স্থানান্তর করলেন। আঠারোশো চোদ্দ সাল থেকে এই মাঠটাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে।

লর্ডসের মাঠের সঙ্গে অভিজাত সম্প্রদায়ের (লর্ড, ব্যারণ প্রমুখদের) সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই। এর নামকরণ এক শ্রমিকের নামানুসারে, কিন্তু এ নিয়ে আজো অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে।

শুধু খেলার বিবর্তন নিয়ে আলোচনার মোহ আছে তাই করা যাচ্ছে, এবং তাতেই একটা প্রামাণ্য বই হয়ে যাবে।

সংক্ষেপে বললে বলতে হয় বল করার পদ্ধতির রূপান্তর ঘটলো, হাত পুরো ঘুরিয়ে বল ছাড়া শুরু হলো।

এই পরিবর্তনগুলোয় খুব কঠোরতা আছে মনে হয় না, কারণ বলের ওজন একই রয়েছে, আঠারোশো পঁচানব্বইতে যা ছিলো তাই। পরিধি হয়তো সিকি ইঞ্চি কমেছে। স্টাম্পের উচ্চতা এবং বিস্তার এক ইঞ্চি করে বেড়েছে। এ ছাড়া বোলারদের সুবিধে করে দিতে এল. বি. ডব্লিউয়ের আইন কিছু পালটেছে। আইন-প্রস্তুতকারকদের ধন্যবাদ, ব্যাটের ওজন কিছু কমানো গেছে।

লর্ডসে একটা ব্যাট আছে—সতেরো শো একাত্তর মার্কা, ওজন তার পাঁচ পাউণ্ড। আমি কিন্তু বরাবরই এর অর্ধেকের কম ওজনের ব্যাট দিয়ে কাজ সারতাম। সতেরোশো বিরানব্বই সালে অনুষ্ঠিত আয়ারল্যাণ্ডের একটা খেলায় এই অদ্ভুত খবরটা চোখে পড়েছিলো :

ইয়া ফিনিক্স পার্কে প্রারম্ভ ক্রিকেট
"ফ্রিম্যানস জার্নাল" থেকে উদ্ধৃত :
সতেরো শো বিরানব্বইয়ের ন'ই অগাস্ট

বিরাট ক্রিকেট খেলা
ফিনিক্স পার্কের পনেরো কাঠা জমি জুড়ে
ডাবলিনের গ্যারিসান বনাম আয়ারল্যাণ্ড

'পনেরো কাঠায়' গতকাল এক চমৎকার ক্রিকেট খেলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এক হাজার গিনির খেলা, প্রতি পক্ষ পাঁচশো করে। কয়েক দিন আগে লেফটেনাণ্ট কর্নেল লেনক্সের বাজির উত্তরে রাইট অনারেবল মেজর হোবার্টের আহ্বান।

দুপক্ষের তালিকা :

গ্যারিসান দলে	আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে
লেফট: কর্নেল লেনক্স	রাইট অনারেবল মেজর হোবার্ট (যুদ্ধ-সচিব)
এঁসাইন টাফটন	অন. ক্যাপ্টেন ওয়েসবি
ঐ ভগান	মিঃ বক্স
লেফটেনাণ্ট রিভস্	মিঃ মরিস
ঐ ব্রিসবেন	মিঃ হিকসান
ঐ অ্যাবারক্রমবি	মিঃ সিম্পসান
ঐ উইল্টশায়ার	মিঃ কিং
কর্পোরাল ব্যাটিসান	মিঃ ইমারসান
প্রাইভেট রবার্টসান	ক্যাপ্টেন সণ্ডারসান
ঐ এণ্ড্রুজ	মিঃ পয়েল

ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডবাই, যাঁর গ্যারিসানের হয়ে খেলার কথা এবং যিনি ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন খেলোয়াড়দের অন্যতম, খেলতে পারেননি। আগের দিন বিকেলে এক দুর্ঘটনায় তার কাঁধের হাড় সরে যায়। অনুশীলনের সময়ে এটা ঘটে। গ্যারিসানই প্রথম খেলতে নামলেন এবং হাওয়া তাঁদের অনুকূলেই বইলো। যদিও দু দলই অনবদ্য খেলার প্রতিশ্রুতি রাখেন।

চারটে নাগাদ সবাই আউট হয়ে গেলেন। এবং আয়ারল্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের খেলা শুরু করে দিলেন, জলযোগের পরোয়া না করে।

অবশ্য তাঁরা দুটো ইনিংস খেললেও পরাজয়ের হাত এড়াতে পারেননি খেলার ফলাফল :

গ্যারিসান	প্রথম ইনিংস ২৪০	আয়ারল্যাণ্ড	প্রথম ইনিংস	৭৬
		আয়ারল্যাণ্ড	দ্বিতীয় ইনিংস	৫৯
				১৩৫

গ্যারিসান ১০৫ রানে জিতলো। আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে আম্পায়ার ছিলেন মিঃ কুইন, গ্যারিসানের এক মিলিটারী ভদ্রলোক। ওয়েসমোরল্যাণ্ডের কাউন্টেস আয়ারল্যাণ্ডের ওপর বাজি ধরে দশ গিনি হারলেন।

দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। একটা খেলোয়াড়দের জন্যে, অন্যটা বাকি সকলের।

পঁয়ত্রিশতম রেজিমেণ্ট বিভিন্ন রাগ-রাগিনী বাজালেন ব্যাণ্ডে।

কর্নেল লেনক্স কিন্তু দারুণ খেলা দেখালেন, অপেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে অসাধারণই বলা চলে। তাঁর বোলিংও গ্যারিসানের জয়লাভে প্রভূত সহায়তা করেছে। বল ধরার ভঙ্গিটুকু শুধু দেখার—বর্ণনাতীত।

মিঃ টাফটনও খেলায় যথেষ্ট দক্ষতার প্রমাণ রাখলেন। উইকেটে তো তাঁর জবাব নেই। সারা ইনিংসটাই একই জায়গায়। তাঁর রানের সংখ্যা মনে পড়ছে না, তবে অনেকগুলোই হবে। অন্যদিকে খেলা দেখালেন হোবার্ট আর ওয়েসবি। দুজনই যথেষ্ট পরিশ্রম করে খেলেছেন। বাকি সকলের উৎসাহের অবধি ছিলো না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই এক হাজার গিনির প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করলাম আমাদের দেশের মূল্যাবনয়নের ব্যাপারটা চিন্তা করে।

আঠারোশো উনষাট সালটা নতুন যুগের সূচক। ওই বছরে ইংরেজদের একটা দল ক্যানাডা আর যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলো, কয়েকটা খেলায় অংশও নিয়েছিলো।

আঠারোশো একষট্টি-বাষট্টিতে অস্ট্রেলিয়ার সফর সৌভাগ্য হয়েছে, সর্বশ্রী স্পাইয়ারস্ ও পণ্ডের পরিচালনায় বারোটা খেলা হয়েছে সেই সময়ে। আর্থিক দিকটা আশাব্যঞ্জক ছিলো নিশ্চয়ই নইলে পরের বছরেই সাগরপারের দল আসরে নামবে কেন?

অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটের ক্রমোন্নতির কোনো ধারাবাহিক খতিয়ান নেই। আঠারোশো তেত্রিশের এক খেলায় রান গোনার ব্যাপারটা শুরু হয় দেখা যাচ্ছে, যদিও ক্রিকেট সম্পর্কে উল্লেখ আছে আঠারোশো দশেও। দলে আদিবাসী খেলোয়াড়ের সংখ্যা এতো বাড়লো যে আঠারোশো আটষট্টির ইংল্যাণ্ড সফরকারী প্রথম দলটি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়েছিলো তাদের নিয়েই, নেতৃত্বে ছিলেন শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ, লরেন্স। কয়েকটা নাম দিলাম :

পিটার	কিং কোল
টুপেনি	টাইগার
মুলাগ	ডিক-আ-ডিক
রেড ক্যাপ	বুলকি

জিম ক্রো

ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় দলটিকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন স্বনামধন্য ডব্লিউ. জি.। সালটা ছিলো আঠারোশো তিয়াত্তর। কিন্তু দু' দেশের মধ্যে এগারোজনের খেলার শুরু আঠারোশো সাতাত্তরে।

শুরু টেস্ট ক্রিকেটেরও। আঠারোশো বিরাশিতে নবম খেলা থেকে "অ্যাশেস" কথাটা চালু হলো। আজ কথাটা ক্রীড়ামোদীদের কাছে কতো পরিচিত।

আঠারোশো বিরানব্বইতে গঠিত হলো নিয়ন্ত্রণ পরিষদ, পরে মতানৈক্যের ফলে সংস্থাটির বিলোপ ঘটে। অস্ট্রেলিয়াতে সেই সময়ে ক্রিকেটের ওপর মেলবোর্ন ক্রিকেট সংস্থার অপ্রতিহত প্রভাব ছিলো।

অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হলো উনিশশো পাঁচে। বারো সালে খেলোয়াড়দের সঙ্গে এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব এড়িয়ে আজও দেশের আন্তর্জাতিক খেলাগুলোর দায়িত্ব বহন করছে। সংস্থার নির্বাচকমণ্ডলীতে আছেন রাজ্য-সরকারী প্রতিনিধিরা।

স্যর ফ্রেডারিক টুন ক্রিকেটকে বিজ্ঞানের খেলা বলে অভিহিত করেছেন : "সারা জীবনটা আপনার কেটে যাবে পাঠ নিতে নিতে, কিন্তু বিষয় যেমন আছে তেমনি থাকবে।"

সত্যি। বিরাট, অসীম বিষয়—ক্রিকেট।

লর্ডসের মাঠে অ্যাণ্ড্রু ডুকাই মারা গিয়েছিলেন, ব্যাট হাতেই।

ক'দিন আগের ঘটনা, উত্তর-সত্তরের এক ভদ্রলোক মিনতি করেছিলেন একটা নতুন ব্যাট বেছে দেবার জন্যে—'কয়েকটা রান নাকি বাকি আছে।'

ক্রিকেটের উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষার জন্যে মেরিলিবোন ক্রিকেট সংস্থা আবহমানকাল কৃতিত্বের দাবীদার থাকবেন। কানুনের ক্রমিক পরিবর্তন ঘটেছে, খেলার পরিবর্তিত কৌশলের সঙ্গে সংগতি রেখে। ক্রিকেটের ইতিহাসে খেলার মান পরিবর্তিত হয়েছে মুহুর্মুহুঃ, উত্থান-পতনের জোয়ার-ভাঁটা চলেছে। একটা যুগকে বলা হয়েছে স্বর্ণযুগ। তার পর থেকেই আমরা স্বর্ণমান থেকে নেমে গেছি।

এই মুহূর্তে ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেটের অবস্থা সঙ্কটজনক, তবে অর্থনৈতিক নয়ই। তবুও, ইংল্যাণ্ডে আজো আছেন অনেক 'বড়' খেলোয়াড়। ওঁরা আরো বড় হবেন।

ব্রিটেনের চরিত্র এবং ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে আজো ক্রিকেটের হৃৎস্পন্দন অনুভূত।

এই প্রতীকের বড় প্রয়োজন আজ সারা বিশ্বে।

প্রশ্নোত্তর

বেতারে ক্রিকেটের প্রশ্নোত্তর বিভাগ পরিচালনাকালে অনেক ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবিরাম চিঠির তোড়ও সামলাতে হয়েছে।

আজ মনে হয় চিঠিগুলো রেখে দিলে ভালোই হতো, কারণ সেগুলোর অধিকাংশই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহনকারী—আবার অসম্ভাব্যের ঝাঁপিও বলা চলে। এগুলো থেকে ক্রিকেটের পুরো আইনের খসড়াও তৈরী হতে পারতো।

এ ছাড়া থাকতো ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্কে প্রশ্ন, ঘটনাবলী সম্পর্কে—এমনকি পিচের অবস্থা সম্পর্কে থাকতো নানা মন্তব্য। তবে বেশির ভাগই আইনকানুন সম্পর্কিত। মজার সব চিঠি। ইতিহাসের রোমন্থনও চলতো সেগুলোতে।

কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়গুলোর ওপর বিতর্কের অবকাশ আছে—যেমন ধরুন :

সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট খেলা কোনটি?

কোনো ক্রিকেটের সমাবেশে এ ধরনের প্রশ্ন এলে, এর বিভিন্ন উত্তর হতে পারতো—উপস্থিত সকলের বয়সের তারতম্যানুসারে। কেউ সঠিক উত্তর যোগাতে পারবেন এটা মনে করা ভুল। আমার কথা ধরলে, আমি যে সমস্ত খেলা দেখেছি বা যেগুলোতে অংশ নিয়েছি কেবল সেগুলো সম্পর্কেই বলতে পারি।

আমার মতে নিম্নলিখিত গুলোই শ্রেষ্ঠ খেলা মনে হয়েছে :

১। লীডস—উনিশশো আটত্রিশ।
২। মেলবোর্ন—উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ।
৩। লর্ডস—উনিশশো ত্রিশ।
৪। নটিংহ্যাম—উনিশশো চৌত্রিশ।
৫। সিডনি—উনিশশো সাতচল্লিশ।
৬। লীডস—উনিশশো আটচল্লিশ।

পর্যায়ক্রমিক হিসেব নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়—তবে, বিনা দ্বিধায় আটত্রিশের লীডসের টেস্ট নিঃসন্দেহে পয়লা নম্বরে আসবে। খেলার প্রতিটি স্তরে গতানুগতিকতার শিকে ছিঁড়েছে।

ও'রিলীর বল দেওয়ার কথা কেউ ভুলতে পারে? হার্ডস্টাফকে যে বলে সে আউট করেছে তাতে ব্যাট হাতে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছে হার্ডস্টাফ। দ্বিতীয় ইনিংসে হ্যাসেটের মনোমুগ্ধকর তেত্রিশ রান? ওয়েইটের দ্বিতীয় স্লিপের ক্যাচ যেটা সাধারণ চোখে সম্ভব মনে হয়েছিলো, কিন্তু আসলে তা ছিলো না। অন্যান্য যেসব খেলার উল্লেখ করেছি তার সবগুলোই অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। রানের দিক থেকে অবশ্য সেগুলো উল্লেখযোগ্য নয় তেমন, উনিশশো তিরিশের লর্ডসের আর আটচল্লিশের লীডসের খেলা দুটো ছাড়া।

আমার মতে সেইসব ক্রিকেটেই উত্তেজনা বেশি যেগুলোতে বোলারদের সুযোগসুবিধে খর্ব করা হয় না।

নির্বোধ বোলারদের বলে খেলতেই মজা বেশি পান ব্যাটসম্যানরা। মসৃণ পিচে দ্বিতীয় শ্রেণীর বোলারদের বলে সেঞ্চুরী করাতে কোনো মজা নেই। হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন কেন এ ধরনের পিচ সব সময়ে পাওয়া যায় না, জবাব দিতে পারবো না। মাঠে রোলার চালানো উচিত, নাকি কাস্তে দিয়ে হাতে কাটাই মাঠের পক্ষে সুবিধেজনক তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। আবহাওয়ার হাতও অনেকাংশই দায়ী এর জন্যে। মাঠের পরিচর্যা যাঁরা করেন, তাঁদের খেলতে নামার আগে প্রশ্ন করেছি এ সম্পর্কে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে।

সময় সময়ে ইংল্যাণ্ডের পিচে খেলা অত্যন্ত সহজ হয়, সেখানকার ঘাসের আস্তরণ বোলারের সহায়তা করলেও। অস্ট্রেলিয়ার পিচে কিন্তু এটা সম্ভব নয়। মনে হয় অস্ট্রেলিয়ায় মাঠের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা রোলারের কাজটা একটু বেশীই করেন। অস্ট্রেলিয়ার পিচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ বেশি থাকলেও আমার কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পিচেই খেলতে ভালো লাগে।

আমার খেলায় ব্যাক-প্লের কাজই বেশি থাকতো, কারণ আমার উচ্চতায় আগ বাড়িয়ে খেলার অসুবিধে ছিলো। ইংল্যাণ্ডের পিচ স্লো থাকায় সুবিধেটা পেতাম।

মেঘলা দিনেই ব্যাট করা আমার পছন্দ, টুপি ছাড়া। তিরিশ সালে এটা করেছি, তখন তো বয়স ঢাকার প্রশ্ন ছিলো না। বলের গতি নির্ণয়ের পক্ষেও এ ধরনের আলোক অনুকূল।

খেলায় অ্যামপ্লিফায়ারের সীমিত ব্যবহারও খেলার আনন্দবর্ধনে সাহায্য করেছে।

ক্রিকেট কানুনের উন্নতি সম্ভব কি ?

বিতর্কের উপযোগী প্রশ্ন। টসের প্রথা বিলোপের দাবী একাধিকবার উঠেছে। আমি পাল্টাপাল্টি করে সুযোগ দেওয়ার পক্ষে। টসের ভাগ্য ক্রিকেটে অত্যন্ত সহায়তাকারী। এ ছাড়া এম. বি. ডব্লিউয়ের আইন পরিবর্তনও করা দরকার।

ইংল্যাণ্ডের ছভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা নিয়েও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে কি করে ক্রিকেটে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব?

কঠিন প্রশ্ন। আমাদের আবহাওয়া এতে খানিকটা সাহায্য করেছে। অস্ট্রেলিয়ার যুবসমাজ বছরের প্রায় সব সময়টাই বেরোতে পারে, খেলার মাঠেও যেতে পারে।

এর পর আছে পেশাগত প্রশ্ন। যারা নিয়মিত মাঠে হাজিরা দেয় তারা নিঃসন্দেহে অনিয়মিত খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে খেলায়। বিলিয়ার্ড আর বক্সিংয়ের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

সময়ে সময়ে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ওপর শারীরিক চাপ এতো বেশি হয় যে একাগ্রতার অভাব দেখা দেয়।

আজকের অর্থনৈতিক কাঠামো এমনই যে সব খেলোয়াড়কেই পেশাগতভাবেই ক্রিকেট খেলার কথা চিন্তা করতে হয়। ইংল্যাণ্ডে সরাসরি পেশাদার হিসেবে ক্রিকেটে যোগ দেওয়া যায়।

পয়সা ছাড়া কোনো খেলোয়াড় আর আজ সেখানে সপ্তাহে ছ' দিন ক্রিকেট খেলার কথা ভাবতেই পারে না। কয়েকটা কাউন্টিতে প্রাথমিক নির্বাচনেও অপেশদার খেলোয়াড় পাচ্ছে না।

অস্ট্রেলিয়া ছোট দেশ, কাজেই ঠিক এমন করে পেশাদারী চিন্তা করতে পারে না। দেশের কোনো খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সুবিধে পাচ্ছে না। অনুশীলনের সময়, জামাকাপড় এবং আনুষঙ্গিক খরচের হিসেব করলে দেখা যাবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সবার ওপরে হচ্ছে তার বৃত্তির, সেখানে সে আরো সময় দিতে পারতো।

গায়কের পক্ষে জনপ্রিয়তার শীর্ষে যাওয়া যতটা সহজ, খেলোয়াড়ের পক্ষে ততোটা না নিশ্চয়ই। কারণ শিল্পী তো বাড়িতে বসে বা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তার পর্ব সারছে।

এর পর আছে জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি—দেশের জন্যে ভাবো। এ ব্যাপারে আমাকে অনেক লাভজনক প্রস্তাব হাতছাড়া করতে হয়েছে।

যেমন ধরুন, উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ সালের কথা—সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম নিউজিল্যাণ্ডে দিনে দুবার করে পনেরো মিনিটের কথিকা-

অনুষ্ঠানে। ক্রিকেটের ওপর বলতে হবে। ভারত থেকে অজস্রবার আমন্ত্রণ এসেছে—আমার ইচ্ছেমতো শর্তে যাওয়ার জন্যে। যাইনি। খেলার জন্যে বহু কাগজওলাকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে, শুধু লেখা দিলেই চলতো। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকেও এসেছে ডাক—সপ্তাহে এক হাজার পাউণ্ড—সপরিবারে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

কিন্তু খেলোয়াড়দের তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপরই নির্ভর করতে হয়, ইচ্ছেমতো কিছু করা যায় না। খেলার স্বার্থে কিন্তু তাদের কিছু স্বাধীনতা পাওয়া উচিত, আমার মতে।

স্বদেশে থেকেই ছেলেরা যাতে দেশের হয়ে খেলে চাকরি করে দেশের সেবা করে যেতে পারে, সেই ব্যবস্থাই জোরদার করা দরকার। কেউ যদি প্রতিভা ভাঙিয়ে কিছু করতে পারে, তা নিয়ে সোচ্চার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আপনি কি স্নায়বিক দুর্বলতা বোধ করেন ?

এই প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় আমাকে। প্রশ্নটাকে দু ভাগে ভাগ করা যাক, এক : খেলার আগে, আর দুই : খেলার সময়কার অবস্থা।

কোনো বড় খেলার আগে সব সময়েই উদ্বিগ্ন বোধ করেছি। কিন্তু খেলা আরম্ভ হয়ে গেলে এটা চলে যেতো। পরিবর্তে দেখা দিতো উত্তেজনা —কঠিন একধরনের উল্লাস, যার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো খেলাশেষে। টেস্ট খেলা চলাকালীন আমি প্রায় বিশেষ কিছু খেতাম না, অন্ততঃ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটিং বা ফিল্ডিংয়ের পরে তো নয়ই। উদরদেশের বিদ্রোহই এর কারণ কিনা জানি না।

টেস্ট খেলায় মূল ঝামেলা মনটাকে নিয়ে, অসম্ভব চাপ পড়তো মনের ওপর। মানসিক পরিশ্রম ছাড়া দেহের ক্লান্তি তাড়াতাড়ি ছাড়ানো যায়, কিন্তু একসঙ্গে দুটোর চাপ ? উত্তর আপনাদের জানা।

টেস্ট খেলাগুলো কি শেষ অবধি হওয়া উচিত, না সময় বেঁধে দেওয়া দরকার ?

আমি খেলার শেষ পর্যন্ত খেলার পক্ষপাতী। একটা দল বারো হাজার

মাইল ঠেঙিয়ে গিয়ে চারটে খেলা খেললো, সব কটাই অমীমাংসিত থেকে গেলো—এটা অসংগত। তারপর শেষ খেলাটা হয়তো আবহাওয়ার মর্জির ওপর ছেড়ে দিতে হলো—তাহলে?

উনচল্লিশ সালে ইংল্যাণ্ডে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ টেস্ট খেলাটা দশম দিনে বাতিল করতে হলো ঘরে ফেরার তাগিদে, খেলোয়াড়রা বিক্ষুব্ধ হয়েছিলো এতে। আটত্রিশ সালে ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার খেলাটাও মাটি হয়েছিলো।

সেই থেকে খেলার সময় বেঁধে দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে, ফলাফলের ব্যাপারটা নিশ্চিত করাও। এ প্রচেষ্টা মোটামুটি ফলপ্রসূ আজ। জনসাধারণ দশদিন খেলা চলতে দেওয়ার বিপক্ষে, অমীমাংসিত খেলাও মন ভরে না তাঁদের। এগুলো পরিষ্কার।

উভয় দেশের তরফ থেকেই এর একটা সমাধান খুঁজে পাবার চেষ্টা চলেছে। গবেষণা চলছে, তিরিশ ঘণ্টার খেলা যথেষ্ট কিনা, আর মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত রফা একটা।

পিচ কি ঢাকা থাকা উচিত?

এ ব্যাপারেও ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া দু দেশেরই নিজের নিজের আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এম. সি. সি. সব সময়েই খোলা পিচে খেলার পক্ষপাতী। ইংল্যাণ্ডে ভিজে উইকেটে ব্যাট করা সম্ভব। সহজও হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে সেটা সম্ভব নয়, এ দেশে বৃষ্টি প্রায়ই কোনো দলের সর্বনাশের কারণ হয়।

যাঁরা খোলা পিচে খেলতে চান, তাঁদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়; প্রাকৃতিক নিয়মে খেলা যাক। কিন্তু সেই রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো কল্পনা করুন, আলপিনের মতো উইকেট পড়ছে, ভিজে মাঠে।

সম্পাদকের অবস্থাটা? যাঁকে টাকার দিকটা ভাবতে হয়?

পিচ ঢাকা না থাকলেও বোলারদের বল করার জায়গাটুকু ঢাকা থাকে। কেন? সম্ভবতঃ বৃষ্টির পরে পরেই যাতে খেলা শুরু করা যায়। এ পিচে 'স্পিন' করার মজা নেই, ফাস্ট বোলিংই একমাত্র রাস্তা।

ভিজে মাঠেই যদি খেলা চালাতে হয় তাহলে আমি লারউড বা ফারনেসের চেয়ে ভেরিটি বা রোডসকে বোলিং ক্রিজে দেখতে চাইবো। প্রযুক্তির দিক থেকে আমার মনে হয় বোলারের বল দেওয়ার জায়গাটুকু ঢাকাতে খেলার সুবিধে বেড়েছে। অর্থচিন্তাকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। আর—তাছাড়া আমি চাই সব খেলাই হোক শুকনো পিচে। উভয় দলের দক্ষতার যাচাই করার সুবিধেও হবে।

ক্রিকেটকে ভালবাসতে হলে সেই রকম করে খেলতে হবে। উজ্জ্বল দিনেই খেলা প্রশস্ত—খেলা প্রাণবন্ত করতে হলে একাগ্রতা দরকার, দরকার উদারতা, ত্যাগ। এগুলো কর, তাহলেই যারা এ খেলা ভালবাসে, তারা আকৃষ্ট হবে। সব রকম মলিনতা থেকে রক্ষা করো একে।

কথাগুলো আমার নয়, বলেছেন লর্ড হ্যারিস। আমিও ওঁর সঙ্গে একমত।

এল. বি. ডব্লিউ. আইন

ক্রিকেট খেলার কতকগুলো আইন আছে।

খেলার মৌলিক চরিত্র অবিকৃত থাকলেও, আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে সময়ে সময়ে।

সবচাইতে বিতর্কিত আইন বোধহয়—লেগ বিফোর উইকেট, যাকে সংক্ষেপে এল. বি. ডব্লিউ. বলা হয়।

এ আইনের পরিবর্তন ঘটেছে মাঝে মাঝেই। আমার মনে হয় আরো একটা পরিবর্তনের দরকার—উনচল্লিশ নম্বর ধারা বলছে: "ব্যাটসম্যান এল. বি. ডব্লিউ.তে আউট হচ্ছে, যখন তার হাত ছাড়া দেহের কোনো অংশ উইকেটের রেখায়, বেলের উচ্চতা ছাড়িয়ে গেলেও।

আম্পায়ারের মতে: "যে বলটা ব্যাট বা হাত না ছুঁয়েও বোলারের লাইন থেকে স্ট্রাইকারের (ব্যাটসম্যান) লাইনে পড়ছে বা ব্যাটের 'অফে' পড়ছে, এবং যে বল ছেড়ে দিলে উইকেটে পড়ছে।"

কাগজে-কলমে এর ব্যাখ্যা মোটামুটি সহজ।

ধরা যাক বলটা স্ট্রাইকারের ব্যাট বা হাতে লাগলো না, কিন্তু আম্পায়ারকে তিনটে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে :

১। বলটা উইকেটে লাগতোই

২। স্ট্রাইকারের লেগ-স্টাম্পের বাইরে বলটা পিচ খায়নি

৩। স্ট্রাইকারের দেহের যে অংশটুকুতে বলটা লেগেছে সেটুকু উইকেট বরাবর।

এ তিনটে বিষয় আম্পায়ারের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না মনে হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনো স্ট্রাইকারকে আউট বলে ঘোষণা করতে পারেন না।

আমার মনে হয় আইন পাল্টে এ রকম করলে ভালো হয় :

"হাত ছাড়া দেহের কোনো অংশ দিয়ে বাধার সৃষ্টি করলে, ব্যাট বা হাতে যদি সে বল না লেগে থাকে, তাহলে স্ট্রাইকার এল. বি. ডব্লিউ.তে আউট হবেন, এবং আম্পায়ারের মতে যদি তা লেগের দিকে পিচ খেয়ে না থাকে, আর যার উইকেটে না লাগার সম্ভাবনা।"

পূর্বে উল্লেখ্য তিন নম্বর আলোচ্য বিষয়ের অবসান ঘটবে এটা চালু হলে। বোলারকে সাহায্য করে ক্রিকেট খেলাকে প্রাণবন্ত করার প্রবণতাও সব দিক দেখা যায়।

এ ব্যাপারে আর. ডব্লিউ. ভি. রোবিন্সের প্রস্তাব : ব্যাটের বিস্তার কমানো হোক। ডাগলাস জার্ডিনের অভিমত : বলের আকার ছোটো করা হোক। আমি কিন্তু দুটোর কোনোটারই পক্ষে নই। ব্যাট ছোট হলে খেলার বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করা হবে।

আর বল তো আকারে ছোট হয়েছেই, বাহ্যতঃ মনে না হলেও। জার্ডিন মনে করেন এ ব্যবস্থা স্পিনারদের সুবিধে করে দেবে। ক্ল্যারি গ্রিমেট এ ব্যাপারে জার্ডিনের চেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল, সে অনেকবারই বলেছে, ছোট বলে বল করা শক্ত। বোলারদের কোনো সুবিধেই হবে না এতে।

সামান্য বেশি সেলাই-জোড়া বল দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এতে আর কোনো সুবিধে বাড়বে কিনা জানি না, তবে সুইং বোলারদের কিছু সুযোগ বাড়তে পারে।

আমার প্রস্তাব কিন্তু সব ধরনের বোলারদের কথা বিবেচনা কর।-এল. বি. ডব্লিউ. আইনের ইতিহাসটা পর্যালোচনা করা যাক—ক্রিকেটের সাবেকী আইনে কিন্তু এল. বি. ডব্লিউয়ের কোনো উল্লেখ নেই। সতেরোশো চুয়াত্তরে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ, মুখ্য বক্তব্য : "যদি বল থামানোর জন্যে স্ট্রাইকার উইকেটের সামনে পা বাড়িয়ে দেন।"

ব্যাখ্যা পরিষ্কার না হলেও, কথাগুলো কোন্ সময়ে চালু হয়েছে এটা অন্ততঃ জানা যায়।

প্রথম যখন ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয় তখন এল. বি. ডব্লিউ. আইনের কোনো প্রয়োজন হয়নি। উইলিয়াম বেন্ডহ্যামের মতে : "এই আইনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে রিং খেলতে নামার পর থেকে, সে পা বাড়িয়ে সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করতো।" টম টেলারও যখন এই কাণ্ড শুরু করলো তখন থেকে এল. বি. ডব্লিউ.তে আউট দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি রেভারেণ্ড জেমস্ পাইক্রোকেটের, তাঁর 'দ্য ক্রিকেট ফিল্ড্' বই থেকে নেওয়া।

সতেরোশো চুয়াত্তর থেকে আঠারোশো একত্রিশ সাল পর্যন্ত ন' বার এই আইন সংশোধিত হয়েছে।

শেষে এই নিয়ে মতবিরোধ হলো দুজন বিখ্যাত আম্পায়ারের মধ্যে, এঁরা হলেন মিঃ ডার্ক আর মিঃ ক্যালডি কোর্ট। এম. সি. সি.র কাছে পাঠানো হলো ব্যাপারটা, নিষ্পত্তির প্রয়োজনে। আইন হলো : উইকেট থেকে উইকেট বল পিচ খাওয়াতে হবে।

আঠারোশো সাতাশিতে লর্ড বেসবরো (নিজেও ক্রিকেট খেলতেন), 'পঞ্চাশ বছর আগের নিয়মে চলে যাওয়া উচিত' বলে নিজের মত জাহির করলেন। অর্থাৎ এম. সি. সি.র আঠারোশো ছত্রিশের নিয়মে—বল যে কোনো জায়গায় পিচ খাওয়ালেই চলবে। আঠারোশো সাতাশি কাউন্টি ক্রিকেট পরিষদে সবাই একমত হলেন—এল. বি. ডব্লিউর আইন পাল্টাতে হবে।

আঠারোশো আটাশির পাঁচই ফেব্রুয়ারী পরিষদের এক জরুরী সভায় প্রস্তাব গৃহীত হলো : "উইকেট আর উইকেটের মধ্যে যদি দেহের কোনো

অংশ সোজাসুজি থাকে, এবং সেই অবস্থায় বল থামায় তাহলে আম্পায়ারের মতে উইকেটে লেগেছে ধরে নেওয়া হবে।" এগারো-তিন ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

এম. সি. সি. কিন্তু আইন পাল্টাবার পক্ষে রায় দিলেন না, তাঁদের প্রস্তাব: "ব্যাটের বদলে শরীর দিয়ে উইকেট আগলাবার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা অসংগত। এম. সি. সি. তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবেন।"

আম্পায়ারদের নিয়মভঙ্গকারী ব্যাটসম্যানদের নাম পাঠাতে বলা হলো, এবং এম. সি. সি.-কাউন্টি কর্তৃপক্ষ ও খেলোয়াড়দের কাছে সহযোগিতার আবেদন রাখলেন।

অসন্তোষের ব্যাপারটা জিইয়ে রাখা হয়েছিলো, কারণ উনিশশো এক সালেও পূর্ব-প্রস্তাব সমর্থন করে আবার প্রস্তাব রাখা হলো এম. সি. সি.র সভায়। একাত্তর ভোটের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য না থাকায় আইন অপরিবর্তিত রইলো।

উনিশশো দুই মরসুমে, এম. সি. সি.র অনুরোধে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাউন্টি সংস্থাগুলো পরিবর্তিত প্রস্তাবের রূপায়ণে ব্রতী হলো। অধিকাংশই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা বিশেষ ধরনের ব্যাখ্যা দিলেন, সংক্ষেপে এই রকম:

(ক) মরসুমের দুটি অসন্তোষজনক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে
(খ) আম্পায়ারকে অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে
(গ) ভালো পিচে আইনটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, খারাপ পিচে শুধু বোলারদের কাজে লাগে
(ঘ) আম্পায়ারদের কাছে অনেক সরল, কিন্তু আইনটি বোধ্য নয়
(ঙ) শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলায় আইন প্রয়োগ অননুমোদনীয়
(চ) হয়তো আইনটি মন্দ নয়, কিন্তু ভিজে মাঠের সংখ্যাধিক্যে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে না
(ছ) নতুন আইনে খেলোয়াড়দের পা দিয়ে খেলার ব্যাপারটা থামানো গেছে, ব্যাট দিয়ে নয় (বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া?)।

পরীক্ষার সম্পর্কে বক্তব্যগুলো তো জানা গেলো, কিন্তু মীমাংসা হলো কি?

একটা কথা বলি এ সম্পর্কে। পরীক্ষায় 'লেগ' আর 'অফ' দুটো দিকই বিবেচিত হয়েছে, এটা বাড়াবাড়ি হয়েছে।

সুতরাং এল. বি. ডব্লিউয়ের সিদ্ধান্ত বেড়েই চলেছে—আঠারোশো সত্তরে ছিলো চল্লিশে একটা, উনিশশো ছাব্বিশে আটটায় একটা। আজকের অনুপাত কত কে জানে!

অনেক পরিবর্তন বিবর্তন তো হলো—তবু, আজও অনেক রান উঠছে।

এতো কথা বললাম এই জন্যে যে আমি চাই আইনের পরিবর্তন হোক।

'বড়' ক্রিকেটে অংশ নিয়ে একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে—সেটা বোলারদের বিক্ষোভ ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে। প্যাডের জন্যে বোধহয়। আমার তো মনে হয় এই কারণেই (পরোক্ষ) বডিলাইনের উদ্ভব হয়েছে।

না, আমার অবসর গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোনো মতবাদ প্রচারে নামছি না। তেত্রিশ সালেই তো এম. সি. সি.র দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি।

ক্রিকেটে আর একটা জিনিস সুখকর মনে হয় নি আমার—ব্যাটস-ম্যানের প্যাড দিয়ে স্টাম্প আড়াল করার ব্যাপারটা। শুধু তাই নয়, নির্লিপ্তভঙ্গীতে বল ছেড়ে কাঁধে ব্যাট ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছি।

'অফে'র রক্ষাকবচটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটলেই মনে হয় ক্রিকেটের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব। কারণ প্যাড তো পরা হয় পা বাঁচানোর জন্যে, স্টাম্প বাঁচানোর জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

হয়তো বিপদ বাড়তে পারে—বোলাররা চুটিয়ে অফ-স্টাম্পে বল দেওয়া শুরু করতে পারে, অনের খেলা প্রায় উঠেই যাবে হয়তো। এটা কার্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু অমার্জিত আর অনাকর্ষণীয়। কারণ এগিয়ে খেলার ড্রাইভ আর কাট তো দেখা যাবে না।

স্লিপে ক্যাচ উঠবে আরো। আক্রমণাত্মক খেলায় বিশ্বাসী বোলাররা অফ-ব্রেক বলের কাজ শুরু করবে আবার। লেগ-স্পিনারের সুবিধে হবে

দ্বিবিধ—এক : গুগলির ব্যবহারে, দুই : ব্যাটারদের বিরুদ্ধে (যাঁরা তাদের দুঃস্বপ্নের কারণ ছিলেন এতোদিন।))।

জানি, আমার এ প্রস্তাবের বিরোধিতা আসবে। আমি কেন, যে সমস্ত ব্যাটম্যানদের প্রাধান্য নষ্ট হবে তাঁরা সকলেই একযোগে এর বিরুদ্ধে হাত তুলবেন। মোদ্দা, খেলাটাকে আকর্ষণের করুন, প্রাপ্তিযোগ বাড়বে। অমীমাংসিত খেলা শুধু জনসাধারণের অভিশাপই কুড়োবে। খেলা শেষ করার দিকে নজর দিন।

সবশেষে ক্রিকেটের খাতিরে, এল. বি ডাব্লউ. কানুনের পরিবর্তন চাইছি, যাতে কোনো ব্যাটসম্যান তাঁর প্যাড কাজে লাগাতে না পারেন, লেগ-স্টাম্পের বাইরে পিচ খাওয়া বলগুলো ছাড়া।

খেলার উন্নতি হতে বাধ্য, অন্যান্য ব্যাপারেও সুবিধে বাড়বে।

আমি বক্তব্য রাখা ছাড়া আর কি করতে পারি? ইতিহাস বলবে আমি ঠিক রাস্তা বাৎলেছি কি না।

সমালোচনা

খেলার বাইরে

খ্যাতির শীর্ষে যে মানুষ তার পক্ষে সমালোচনা এড়ানো মুসকিল। এটা ধরেই নেয় সে, এবং নোংরামির পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার প্রতিবাদ করার প্রশ্ন ওঠে না। যার ব্যক্তিগত সাফল্য যতো বেশী হবে, তাকে ততো বেশী অন্যের ঈর্ষা কুড়োতে হবে—অন্ততঃ যারা নিজেদের তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, তাদের।

একটা চৈনিক প্রবাদ আছে: মহীরুহ যেমন চেনা যায় তার ছায়া দেখে, ভালো লোক চেনা যায় তাদের শত্রুসংখ্যায়। আমি শুধু 'ভালো' কথাটি তুলে দিয়ে 'সার্থক' কথাটি বসাতে চাই। বুঝতে সুবিধে হবে। ঈর্ষার ব্যাপারটা সময়ে এমন একটা পর্যায়ে ওঠে যখন সেটা রীতিমতো ঘৃণার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। অভিযোগকারী নিজেকে হাস্যাস্পদ

করে শেষে করুণার পাত্র হয়ে যায়। যে আগুন নিজে হাতে জেলেছে সে তারই গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

আমি খেলার জীবনে অখ্যাতি থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত একটা ব্যাপারে ভাগ্যবান—প্রেসের আনুকূল্য পেয়েছি। সাংবাদিক, ক্রীড়া-সমালোচক আর বেতার-ভাষ্যকারেরা আমার বিচার করেছেন প্রতিভার দৃষ্টিকোণ থেকে। সমালোচনা করেছেন প্রয়োজনবোধে—প্রশংসাও করেছেন। চরিত্রহননকারী লেখা লেখেননি কখনো। তবে, কখনোই লেখেননি বলবো না, এমনও হয়েছে ঘটনাভিত্তিক সমালোচনা না করে আক্রমণ করা হয়েছে, ত্রুটির কথা উল্লেখ না করেই।

তাই বলে আমি সমালোচনার উর্ধ্বে, একথা বলি না, কারণ মানুষমাত্রই তো ভুল করে। ভুলের মধ্যে দিয়েই শিখেছি অনেক, মূল্যবান শিক্ষাও নিয়েছি। ভুল সংশোধন করেই তো মানুষ উন্নতির পথে যায়।

কুড়ি বছরের যুবকের কাছে চল্লিশোর্ধ্ব প্রৌঢ়ের মানসিক গভীরতা আর সহনশীলতা আশা করা বৃথা।

দেশ ঘোরার সুযোগ, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়-দায়িত্ব, সাফল্য আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা—এমনকি ভাবাবেগ, হোক তা আশা বা নিরাশার প্রতিক্রিয়া, মানুষের মনকে উদার করে—আনে চরিত্রের দৃঢ়তা। প্রাচুর্যের মধ্যে আমার দিন কাটেনি, আর এটা স্বীকার করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। অসচ্ছল পরিবারের ছেলে হয়েও নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হতে দেখেছি অনেককে।

তবু, বড় ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বারবার অশিক্ষার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব পীড়া দিয়েছে। তিরিশ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে এই অসুবিধেই দেখা দিয়েছে।

এই সামান্য অবস্থা থেকে ওঠার দরুনই হয়তো পরবর্তী জীবনে সমালোচনার ঝড়ও উগ্রতর হয়েছে।

এইবার, সমালোচক আর সমালোচনার ব্যাপারটা একটু আলাদা করে বলতে চাই। এর সঙ্গে নীতির প্রশ্নও যেমন জড়িত সাধারণভাবে, আবার বিশেষ ব্যাখ্যার অবকাশও রয়েছে।

প্রথমে, আমার ক্রিকেট-জীবনের কয়েকটা ঘটনার সম্পর্কে বলবো। সবার সঙ্গে মিশি না বলে বদনাম রটেছিলো, যদিও যাথার্থ্যে প্রযুক্ত হয়নি এটা। সম্ভবতঃ কৃত্রিমতা আর প্রচার এড়াতে চেয়েছি বলে ব্যাপারটা ঘটে থাকবে।

আমি মিশুক নই—এ দুর্নাম হয়েছে যেহেতু খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ার গিলতে বসে যেতাম না। অন্যের বদভ্যাসের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেও পারিনি, বসে সঙ্গদান করে সময় নষ্ট করিনি।

একবেলার খাবার, আর এক কাপ চা, ব্যাস।

বরং ওরা ডিনার টেবলে আসতে দেরী করেছে বলে উল্টো অভিযোগও করতে পারতাম আমি।

আমাকে স্নব বলা হয়েছিলো যেদিন টেস্টে বিশ্বরেকর্ড করে ঘরে বসে বাজনা শুনছিলাম। কি করা উচিত ছিলো? লিডসের রাস্তায় রাস্তায় বীরদর্পে ঘুরে বেড়ানো!

যে কোনো অসাধারণ কাজে অমানুষিক পরিশ্রম হয়—শরীর এবং মনের ওপর চাপ পড়ে। কিছু লোক উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করে সে অবসাদ দূর করার চেষ্টা করেন, আবার কিছু লোক প্রতি-উত্তেজনা খোঁজেন। আমি সব সময়ে চুপচাপ থেকে সুফল পেয়েছি—সঙ্গীতের মাধ্যমেও বলা যায়।

ক্লান্ত স্নায়ুগুলোর স্বভাব ফিরিয়ে আনতে বাজনার জুড়ি নেই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা হয় কিনা জানি না, আমার হয়েছে।

এ ছাড়া ক্রিকেট-জগতের মানুষই কেবল আকর্ষণ করেছেন আমাকে। মন দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে বেড়েছে তাতে।

এককথায়, কেউ যদি তার সামাজিক কর্তব্য ঠিকমত চালিয়ে যায় বা যেতে পারে, তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কুৎসা রটনা আর যাই হোক শালীনতার পরিচয় নয়।

সামাজিক জীবের মানসিকতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা নেই। জনবহুল এলাকায় তাদের অবস্থা কি হয় এটা ভাবতে তাঁদের গায়ে জ্বর আসবে।

অ্যাবারডিনের এক ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। আমি আর এক সতীর্থ কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলাম। অ্যাবারডিনে সেবারই প্রথম আসা। কেনা তো দূরে থাক, সই দিতে দিতে হাতে ব্যথা হয়ে গিয়েছিলো। প্র্যামে (বাচ্চাদের গাড়ি) একটা বাচ্চাকে নিয়ে চলেছেন এক মহিলা, আমার সই চেয়ে বসলেন—যুক্তি: বাচ্চা বড় হলে চাইবে।

বাচ্চা কিন্তু নির্বিকার। মহিলার কাছে পেনসিল নেই, কাগজও। অথচ বিরক্তি প্রকাশও চলবে না।

কুড়ি বছর ধরে এ অবস্থা চললে আপনার কি মনে হতে পারে ভেবে দেখুন।

যাঁরা খ্যাতির পেছনে দৌড়চ্ছেন তাঁদের এটা বোঝাতে যাওয়া নিরর্থক। একটা লোকের খেলোয়াড় হিসেবে সামাজিক জীবন আর সাধারণ নাগরিক হিসেবে তার নির্জনতার অন্বেষণ, এ তফাত কে বোঝাবে। অনেকে দুর্ব্যবহারও করেছেন—তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দিইনি বলে। বাইরে বেরোলে তো কথাই নেই—ট্রেনে ট্রামে বাসে আর জাহাজে যেখানেই থাকুন না কেন,—একদল বাচ্চা আপনার পেছন পেছন চলেছে।

আটচল্লিশ সালে লর্ডসে বিশ্রামের ঘরে বসে আছি—একটা চিরকুট এলো আমার কাছে, পুরনো এক বন্ধু দেখা করতে চাইছেন। চিরকুটটা দেখলাম ভালো করে—অপরিচিত নাম। তবু বেরোলাম, ভুলও তো হতে পারে।

আমাকে দেখামাত্র ভদ্রলোক অনর্গল কথা বলতে শুরু করে দিলেন, আমি চুপচাপ। শেষে মরিয়া হয়ে জানালেন গত রাতেই তো পরিচয় হয়েছে এক ডিনার পার্টিতে।

কেলেঙ্কারি। আমি সে পার্টিতে ছিলামই না।

আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ হলো একরকম একতরফাই, আর মনে হলো—আরো একবার অসামাজিকতার টিকা পরতে হবে।

আমার হিতৈষীদের অনেকেই সাংবাদিকতার জগতে রয়েছেন, আছেন বেতারেও। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

নেভিল কার্ডাস আর জিম সোয়ানটনের মতো সমালোচকেরাও আমার

কঠোর সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সব সময়েই গঠনমূলক আলোচনা। জনি ময়েস, আর্থার মেইলি, জ্যাক হবসের ক্ষেত্রেও এটা প্রযুক্ত। কিন্তু একজন সাংবাদিক তো লিখে বসলেন একবার, "বিশ বছর ক্রিকেট খেলেও ব্র্যাডম্যান 'ক্রিকেট' কথাটার ইংরেজী অর্থ বুঝতে পারেননি।" একই লোক আমার খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির প্রতিও কটাক্ষ করেছেন—আমি নাকি বিপক্ষীয় অধিনায়ককে বিশ্রামের সময়ে জানাইনি যে ব্যাটিং চালিয়ে যাবো। বিদ্যালয়ের ছেলেরাও জানে যে ইনিংস শেষ করার সময়তেই শুধু বলার দরকার হয় এটা।

চাঞ্চল্যকর বিবৃতির ঢালাও ফিরিস্তিও সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে না। সাংবাদিকদের সব সময়েই খাঁটি মানুষ বলে ধরে নিতে হয়, তাঁদের অন্য কোনো পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু বিশ্বাস যখনই হারিয়েছি একবার কারুর ওপর, আর দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় থাকিনি।

খেলার মাঠে

খেলার মাঠে কারুর কার্যকলাপ নিশ্চয়ই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কোনো সমালোচক হয়তো কোনো সময়ে লিখেছেন—আমার স্ট্রোক ঠিক না, সময়ের ব্যাপারটা নির্ভুল নয়, বল পাঠানো নিখুঁত নয়—কিংবা অন্য কিছু। আমি মেনে নিয়েছি। কারণ এগুলো তো মতামতের ব্যাপার, প্রতিবাদের বিষয় না।

কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না রেখেই খেলোয়াড়দের দোষ-গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

আমার এমন অনেক খেলার প্রশস্তি ছাপা হয়েছে, যেগুলো নিজেকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এগুলোই তো সমালোচনার ইন্ধন যোগায়।

অধিনায়ক হিসেবে

দলের নেতৃত্ব যারা করে তাদের অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়—অনেকটা বিরক্তিও বলা যায়। যেমন ধরুন—মাঠে আপনি ঠিক ঠিক

জায়গায় খেলোয়াড়দের দাঁড় করিয়েছেন কি না, বোলারদের সঠিক জায়গা থেকে বল করানো হচ্ছে কি না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দু-একটা ব্যাপারের উল্লেখ করা দরকার। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে—ভারী রোলার ব্যবহার করেছি প্রতিপক্ষের অসুবিধে সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে আক্রমণ করা উচিত না।

কোনো সমালোচক যদি এ আইনের বিরুদ্ধবাদী হন তাহলে সমালোচনার ঝড় না বইয়ে, তাঁর উচিত আইনের সংশোধন প্রার্থনা করা।

কি ঘটতে পারে জানার আগেই অধিনায়ককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ সমালোচকরা সব সময়ে 'কি হয়েছে' তাই নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

অনেক সময়ে আবার আগাম মন্তব্য করেও হাস্যাস্পদ হন কেউ কেউ।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ছেচল্লিশের সিডনির দ্বিতীয় টেস্টে একটি পত্রিকায় খবর বেরোলো সাত ইঞ্চি মাপের হেড-লাইনে :

"ব্রাডম্যানের ভুল"

অস্ট্রেলিয়াকে অনেকক্ষণ ব্যাট করতে দিয়েছেন

লেখক একজন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক। নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষের জন্যে সব সময়ে সজাগ, পরের নিবন্ধে লিখলেন, "ব্র্যাডম্যান গতকাল অস্ট্রেলিয়াকে এক ঘণ্টার মতো সময় ব্যাটিং চালাতে দিয়ে ভুল করেছেন, এর প্রতিফল হয়তো দ্বিতীয় টেস্টে পেতে হতে পারে তাঁর দলকে। খেলাটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ করার সুযোগ এখন ইংল্যাণ্ডের হাতে। যদি তারা সে সুযোগ পায়, দায়ী করবো ব্র্যাডম্যানকে, তাঁর বোলারদের ওপর আস্থার আতিশয্যের জন্যে। খারাপ খেলার জন্যে একটি সুনিশ্চিত জয় হাত ছাড়া হবে।

ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছিলো।

আটচল্লিশের প্রথম ও চতুর্থ টেস্টে ইয়ার্ডলে আর আমার রক্ষণশীল

খেলার ওপর আলোচনা বেরিয়েছিলো, বলাবাহুল্য আমার বিপক্ষেই রাখা হয়েছিলো বক্তব্য। লেখক একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়।

বিল উডফুল যখন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করেছে, সে কখনোই কাগজ পড়তো না খেলার মরসুমে। দলের অন্য সবাইকেও সে ওই এক কথাই বলেছে। সব মানুষের মনের জোর তো সমান নয়। অনেক খেলোয়াড়কে কাগজের সমালোচনা গোগ্রাসে গিলতে দেখা গেছে, প্রায়োগিক ব্যাপার-গুলো সম্পর্কেও অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছেন তাঁরা। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কিন্তু ক্রিকেটের 'ক'-ও জানেন না।

নির্বাচকের ভূমিকায়

নির্বাচকমণ্ডলীতে যাঁদের গ্রহণ করা হয় তাঁদের প্রায় সবাই প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, খেলার সম্পর্কেও অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। যাঁরা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট এবং দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

নির্বাচনের সমালোচনা অবশ্যম্ভাবী, আবার মতের প্রশ্নও আছে তাতে।

ব্যক্তিগত আক্রমণ না করা পর্যন্ত আমি কোনো নির্বাচককে সমালোচকদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হতে দেখিনি।

এঁদের প্রায়শঃই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করা হয়, কিন্তু ক্বচিৎ তাঁদের সার্থক বিচার বা দূরদর্শিতার প্রশংসা শোনা যায়।

এখানেও আবার সমালোচককুল তাঁদের 'আগাম' মতামত দানে গোঁড়ামি দেখান। হঠকারিতার ফলও হাতে হাতে জোটে।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশের মরসুমে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক খেলায়, সিডনির এক সাংবাদিক লিখলেন (ইনি আবার একবার প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ নিয়েছিলেন!):

'মেলবোর্নের খেলার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচকমণ্ডলী আর্থার মরিসকে রেখেছেন, কিন্তু মরিস ব্রিসবেন আর সিডনিতে ব্যর্থ হয়েছেন। দলে 'ব্যর্থতা'র কোনো স্থান থাকা উচিত নয়।

টেস্ট খেলাগুলোকে নতুন প্রতিভার সন্ধানে আয়োজিত নির্বাচনী খেলা বলে আখ্যায়িত করলে ভুল হবে।

মরিস এর জবাব দিলো মেলবোর্নে একটা সেঞ্চুরী করে, তারপর এডিলেডে ছুটো ইনিংসে ছুটো সেঞ্চুরী করে। পরের আটটা টেস্টে সে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ছটা সেঞ্চুরী করেছে। আমি ছাড়া কারুরই অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এর বেশী রান করা সম্ভব হয়নি, এমন কি ট্রাম্পারও না।

হায় সাংবাদিকতা!

আর এক সাংবাদিক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় তিনজন স্লো লেগ-স্পিনারের অন্তর্ভুক্তি দাবী করে লিখলেন, 'সমস্ত দলের সাফল্য নির্ভর করছে আমাদের স্পিনারদের ওপর।'

পূর্বের সমস্ত দলের চেয়ে গড় আমাদের বেশী ছিলো। সারা মরসুমে ইংরেজদের উননব্বইটি উইকেটের মাত্র একটা আমাদের লেগ-স্পিনাররা পেয়েছিলো।

এর পরও তৃতীয় টেস্টের নির্বাচনী নিয়ে লিখতে বাধেনি তাঁর। পঞ্চম টেস্টের আগেও জ্ঞান দিলেন।

যুক্তিহীন এলোমেলো অনেক কথা।

নির্বাচকদের সম্পর্কে বিষোদ্গার না করে, সত্যিকারের ক্রিকেটামোদীর উচিত নির্বাচকমণ্ডলীতে নিজের স্থান করে নেওয়া।

নির্বাচকদের একজন হয়ে কাজ করার সময় আমাকে তেমন বেগ পেতে হয়নি, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যাপারে দলগত সমালোচনা না করে আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টাও করিনি কখনো, বরং—সতীর্থদের সুযোগ বাড়াবার চেষ্টাই করেছি। তারা হয়তো সময়ে ভুলও করেছে, তবুও।

নির্বাচনের দোষারোপ করার ব্যাপারে অন্য অভিযোগও ছিলো। স্কারবরোর উনিশশো আটচল্লিশে একটা খেলার উল্লেখ করি:

'ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার পরিচালকবর্গের একটা বোঝাপড়া আছে—লিভেসন-গাওয়ার তাঁর প্রথম প্রদর্শনী দলে ছজনের বেশী টেস্ট খেলোয়াড় নেবেন না। ব্র্যাডম্যান তাঁর সম্মানার্থে পুরো টেস্ট দলই নামিয়ে দিয়েছেন।'

এ বক্তব্যের পেছনে যে মনোবৃত্তিই কাজ করুক না কেন, ঘটনাটা হচ্ছে এই যে—ওই দল মনোনয়নের ব্যাপারে আসলে আমাকে দায়ী করা যায় না। কারণ, নির্বাচকমণ্ডলী সমষ্টিগতভাবেই এটা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, কোনো 'বোঝাপড়া', ছিলো না। গাওয়ার তাঁর ইচ্ছেমত দল নির্বাচন করতে পারতেন।

নির্বাচকদের আত্মতুষ্টির কারণও ঘটে, যখন তাঁদের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা সমালোচনার সম্মুখীন হন না।

সাধারণ বক্তব্য

আমার নিজস্ব ব্যাপারে দু-একটা সমালোচনার কথা বলে এ অধ্যায়ের দাঁড়ি টানবো। বলা হয় আমি নাকি বেশী রান তোলার জন্যে নিষ্করুণ চেষ্টা চালিয়েছি সব সময়ে।

একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে: 'ট্রাম্পার আর হব্সের মতো দিকপাল খেলোয়াড়দের আমলে বড় খেলোয়াড়রা সাধারণতঃ দেড়শো রানের মধ্যেই তাঁদের রানসংখ্যা রেখে খেলা ছেড়ে দিতেন।' হব্স্ সম্ভবতঃ তাঁর পনেরোটা ডবল সেঞ্চুরী আর বিশেষ করে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে তাঁর তিনশো ষোলো রানের সময় 'খেলা ছেড়ে দেওয়ার' ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন! ট্রাম্পারের সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না। তবে বেশী রানের ব্যাপারই যদি গড়-মূল্যায়নের মাপকাঠি হয় তাহলে বলবো ট্রাম্পারের ইংল্যাণ্ডে খেলার রেকর্ড হচ্ছে একশো তিরানব্বইটা ইনিংসে উনিশটা সেঞ্চুরী, আমার একশো কুড়িটা ইনিংসে একচল্লিশটা। ট্রাম্পার প্রতি ৯=৮ ইনিংসে পেয়েছেন একটা সেঞ্চুরী, আমি ৩=৪ ইনিংসে। আবার, ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি খেলায় আমার সর্বোচ্চ রান দুশো আটাত্তর, ট্রাম্পার আঠারোশো নিরানব্বইতে সাসেক্সের বিরুদ্ধে তিনশো নট আউট ছিলেন।

যে দলের রানের প্রয়োজন ফুরোয়নি, সেখানে কোনো বিশেষ খেলোয়াড়কে সীমিত সংখ্যক রান করে খেলা ছাড়তে হবে, এটা কি রকমের

যুক্ত—জানি না। তাহলে তো দলের হয়ে খেলা হলো না। আর একটা অভিযোগ—আমি নাকি "শক্ত" খেলা খেলি। এর পক্ষের প্রচারকরা হয়তো ভুল করেছেন, আসলে এটা এইভাবে বলা উচিত—"জেতার জন্য খেলা।"

তাঁদের কাছেই প্রশ্ন: আমার কোনো লেখা কি ক্রিকেট নিয়মের বিরোধী মনে হয়েছে কখনো?

এদিকে দেখুন, আটাশ সালের ব্রিসবেন্ টেস্টে, যে খেলায় আমার টেস্ট খেলার হাতেখড়ি—সেই খেলায় ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক পার্সি চ্যাপম্যান তাঁদের প্রথম ইনিংসেই তিনশো নিরানব্বইতে এগিয়ে রইলেন। তারপর 'ফলো-অন' না করিয়ে সাতশো একচল্লিশে সংখ্যাটি দাঁড় করালেন। আমরা ছেষট্টি করেছিলাম। খেলেছি ন' জনে—গ্রেগারী আর কেলেওয়ে নামতে পারেননি।

উনিশশো আটত্রিশের ওভালের কথাও ধরা যাক—সেবার কি হয়েছিলো? ইংল্যাণ্ড টসে জিতে সুন্দর পিচ পেয়ে তিনদিন ধরে খেলে সাত উইকেটে নশো তিন করলো। তারপর "খেলা ছেড়ে দিলো"।

এর ওপর আমার গোড়ালিতে চোট, খেলতে পারবো না, আর ফিঙ্গলটন পারবে না জেনে!

'উইসডেন' তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন, 'সমস্ত ব্যাটিংয়ের ব্যাপারটা দেখে মনে হয়েছে একটা "বিশাল" রানসংখ্যা গড়ে তোলাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো।'

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উনিশশো উনত্রিশ-তিরিশের কথা ধরুন: ইংল্যাণ্ড টসে জিতে আটশো উনপঞ্চাশ করলো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করলো দুশো ছিয়াশি। পাঁচশো তেষট্টি রানে পিছিয়ে থেকে তারা কি আবার ব্যাট করতে পেয়েছিলো? না। ইংল্যাণ্ড আবার ব্যাট ধরেছিলো। অস্ট্রেলিয়াকে কোনোদিনই এরকম খেলার দোষে দুষ্ট করা যায় না। এগুলো ইংরেজদের কায়দা!

আমার দলের সম্পর্কে শুধু একটা দৃষ্টান্তই আছে—সেটা আটচল্লিশের ঘটনা। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে রেকর্ড রান উঠেছিলো সেদিন। 'ঢিলেঢালা'

খেলার জন্যে আমাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবেন না, কিন্তু প্রতিপক্ষ খেলার মোড় সেদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলে আমি সে আহ্বান উপেক্ষা করতাম না।

টেস্ট খেলাটা নিশ্চয়ই ছেলেমানুষীর ব্যাপার নয়—বিশেষ যখন ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া প্রতিপক্ষ।

এই প্রসঙ্গে বোলারের বক্তব্য শুনবেন? ও'রিলীর কথাই বলি, "আমি সময় নষ্ট করে চন্দ্রোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নই। টেস্ট খেলাগুলো হয় হার-জিত নির্ণয়ের জন্যেই। কোনো দলই ছেড়ে খেলবে না।"

তবু আটচল্লিশের সফর সম্পর্কেও অনেক নোংরা লেখা বেরিয়েছে। লেখক একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়, উভয় দলেরই পরিচিত মানুষ। ব্যক্তিগত আক্রোশে ভরা—নগ্ন, নির্লজ্জ প্রবন্ধ। দলের অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়েছে এতে।

এই লোকটা আমার ভিজে মাঠে খেলার দুর্বলতা জানতো এবং তাই নিয়েই চলতো তার ধিক্কারজনক ফিরিস্তি।

আটচল্লিশে আমি আবার ইংল্যাণ্ডে খেলতে যাচ্ছি জেনে লিখলো, "মাঠ শুকনো থাকলে ব্র্যাডম্যান আবার তার সেঞ্চুরীর ঝুলি খুলবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের গ্রীষ্মে যদি মাঠ ভিজে থাকে! এইটাই বিচার্য—কারণ এর আগের তিনবারই ব্র্যাডম্যান ইংল্যাণ্ডে খেলে গেছে শুকনো মাটিতে।"

লোকটা হয়তো ভেবেছিলো লোকে অন্যান্য সফরের আবহাওয়ার ব্যাপারটা ভুলে তার বক্তব্য মেনে নেবে।

উনিশশো ত্রিশের সফরে 'উইসডেন' লিখলো: "বেশীর ভাগ খেলারই মীমাংসা হয়নি আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্যে। হ্যাঁ, আবহাওয়ারি জন্যেই অস্ট্রেলীয়রা অসুবিধেয় পড়েছে, তবু তারই মধ্যে নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ করেছে।"

সম্পাদক মাঠে ছিলেন, খেলাগুলোও দেখেছেন। 'সর্বদ্রষ্টা' সাংবাদিকটি সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন না।

অধ্যায়ের শুরুতেই যা বলেছি, সেই বক্তব্য দিয়েই শেষ করছি—সমালোচনা হবে না বা হওয়া উচিত নয় এটা কোনোদিনই ভাবিনি, কারণ

মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, আমিও বাদ যাইনি। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ঈর্ষার কোনো স্থান সাংবাদিকতায় থাকা উচিত নয়। কোনো পক্ষপাতিত্ব দাবী না করে—যেটুকু ঘটেছে তার ব্যাখ্যাই শুধু চেয়েছি।

পুরস্কার পেয়েছি, মানুষের মন থেকে আজ আমাকে মুছে ফেলতে পারেনি এরা, সমালোচনায় জনপ্রিয়তা বেড়েইছে শুধু।

মানুষ ঘটনা আর কল্পনার ফারাক বোঝে।

খেলার জীবনে, গোড়ার দিকে আমার এক বন্ধু বলেছিলো, "মানুষের ভালবাসা হয়তো তুমি পাবে না, কিন্তু তাদের শ্রদ্ধা পাবে।"

আমি যদি পরেরটা অর্জন করতে পেরে থাকি, বিশ্বাস করি—পেরেছি, আমি সার্থক।

ক্রিকেটের উন্নতি হয়েছে কি?

এর উত্তরে বলবো : "ক্রিকেটের উন্নতিতে যদি অবিশ্বাস করি তাহলে প্রগতির ব্যাপারেও বিশ্বাস নেই আমাদের।"

যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বাড়ছে। ক্রিকেটের বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণা চালিয়েছি, তার উন্নতির জন্যে চেষ্টাও। প্রথম প্রথম তো নামে খেলা হতো, হকি-স্টিকের মতো ব্যাট। বল দিতে হাতও ঘুরতো না। দুটো স্টাম্পে খেলা চলতো। পিচের কোনো বালাই ছিলো না।

বড় টুপি, কলার আর টাই পরে নামতেন খেলোয়াড়রা। উইকেটরক্ষক যে গ্লাভস ব্যবহার করতেন তাকে সাধারণ দস্তানা বলাই শ্রেয়। প্যাডের ব্যবহারও শুরু হয়নি তখন।

তারপর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে মাঠের, উইকেটের। ব্যাটসম্যানরা বোলারদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। আঠারোশো তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে সময়টায় বোলাররা লেগের খেলায় বেশী আগ্রহ দেখিয়েছেন, তখনো পর্যন্ত কাঁধের ওপর হাত ওঠেনি।

তারপর আইন হলো—হাত ঘুরিয়ে বল করতে হবে।

পরিবর্তন হলো ব্যাটের, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ হলো।

বোলিং সম্পর্কে সিডনির 'মেল' পত্রিকায় লিখলেন ডব্লিউ. জে. হ্যামারসলি : "সালটা আঠারোশো চুরাশি, আজকের বোলিং কি তিরিশ বছরের আগের বল দেওয়ার চেয়ে উন্নত ? আমার মতে—না। আজকের দিনে ভাল বোলারের সংখ্যা যেমনি মুষ্টিমেয়, বোলিংয়ের দিক থেকে পূর্বসূরীদের থেকে উন্নতিও তেমন চোখে পড়ে না।"

লর্ড হ্যারিসের মতে প্রথম মিডিয়াম ফাস্ট ব্রেক বল দেওয়া শুরু করেন স্পফোর্থ। হাত ঘুরিয়ে বল করার প্রথা চালু হওয়াতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

বোলিংয়ের ধারা পাল্টানোর সঙ্গে পরিবর্তন ঘটলো ফিল্ডিংয়েরও। ব্যাটিংয়ের কায়দাও বদলালো।

ফাস্ট বোলিং আনলো প্যাডের ব্যবহার।

স্কোর বুকের প্রচলন হওয়া পর্যন্ত রান গোনা হতো কাঠির ওপর মার্কা দিয়ে।

কাগজে লেখা হতো :

টমাস গিপ	৬	বোল্ড আউট	রাটার
রিচার্ড ওয়ার্সপ	৮	ক্যাচ্‌ড্ (!) আউট	টমসন
আর বার্কার	৬	স্টাম্প্‌ড্ আউট	ডেনিস

ছাপানো আমন্ত্রণ-পত্রের ব্যবহার শুরু সাসেক্স বনাম এম. সি. সি.-র খেলায়। লর্ডসের মাঠে আঠারোশো আটচল্লিশের ছাব্বিশে জুন খেলাটি হয়েছিলো।

আজ অস্ট্রেলিয়ায় যে স্কোর বোর্ড হয়েছে তাতে একজন সাধারণ মানুষও একনজরে খেলার ফলাফল জানতে পারছেন।

ইংল্যাণ্ড এখনো অবশ্য এক্ষেত্রে এগোতে পারেনি, তবে—অদূর ভবিষ্যতে এটা চালু হয়ে যাবে সেখানেই।

বোলিংয়ে সুইং বা সোয়ারভের (একমুখী) ব্যাপারটা অনেকদিন ধরেই চলছে। অফ-ব্রেকের বল দেওয়ার রীতিও স্বাভাবিকভাবেই তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে। মিডিয়াম পেসের বেলায়ও তাই, তফাত শুধু পা ফেলায়। সঙ্গে সঙ্গে গুগলির ব্যবহারও জনপ্রিয় হয়েছে। বল্লের

কাজও বেড়েছে—অফ-ব্রেক বলে লেগ-ব্রেক অ্যাকসন। ব্যাটসম্যানদের পক্ষে এ ধরনের বল গোড়ার দিকে ভীতিজনক হলেও পরে এর মোকাবিলা করার রাস্তা পেলো তারা।

ঠিক ও'রিলী অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর গুগলি আর লেগ-স্পিন বলে, একান্তই তাঁর নিজস্ব কায়দায় দেওয়ার জন্যে।

অস্ট্রেলিয়ার সিসিল পেপার (যিনি এখন ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলেন) বলটাকে অফে এমনভাবে ঘোরাতেন যা আজও রহস্য আমার কাছে।

ভিক্টোরিয়ার একজন বোলার তাঁর অস্বাভাবিক বড় হাতের সুযোগে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পেরেছেন।

আরো নতুন উদ্ভাবক আসবে ক্রিকেট জগতে। আগের মানুষ অনেক পরিশ্রম করে গেছেন, নতুনরাও করবেন। ব্যাটিংয়ের বেলায় কিন্তু ডব্লিউ. জি. যে নীতির দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাই অবিকৃত থাকবে। খেলায় চোখের যে একটা বিরাট দায়িত্ব আছে সেটা দেখালেন রনজি। এতে অফ-স্টাম্পে লেগ গ্লান্স করার সুযোগ হয়েছে, যে পরীক্ষা করার দুঃসাহস কারুর হয়নি এর আগে।

ট্রাম্পার তাঁর খেলায় বেঁচে আছেন মারের কায়দা আর অদম্য দুঃসাহসিকতার জন্যে।

অন্যতম টেস্ট খেলোয়াড় স্যাম জোন্‌স্‌ আধুনিক ব্যাটিং পছন্দ করেন না, এমন কি হব্‌স্‌ বা হ্যামণ্ডের খেলাও ভাল লাগে না তাঁর। লাগে গ্রেস আর ট্রাম্পারের। বুঝুন! হব্‌সের ব্যাটিং চলে না! ডব্লিউ. জি. এগিয়ে খেলার দলে, ক্ল্যারি গ্রিমেটও। ওঁদের ব্যাটিংয়ে ওই একটা জায়গায় মিল।

এ. সি. ক্রম তিরিশ বছর আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, "ব্যাটিংয়ের পরের পর্যায় হবে ব্যাক-প্লের প্রচলন।"

এ বাণী আজ বাস্তবায়িত।

উইকেটের উন্নতিসাধনে কোনো একটা ব্যাপার কাজ করেনি—ভারী রোলার চালনা, মাটির পরিচর্যা প্রভৃতিও কাজ করেছে।

আগে পিচ নির্বাচিত হতো টসে জিততেন যে দল, তাঁদের বোলারদের উপযোগী জায়গা বেছে। পরে এরও পরিবর্তন ঘটেছে

অস্ট্রেলীয় উইকেট ইংল্যাণ্ডের তুলনায় অনেক পাকা, কিন্তু এটা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বলা যায় না। উনিশশো ত্রিশে কেমব্রিজে দেখেছি পাকা পিচ। আটত্রিশের ম্যানচেস্টার আর ওভালের টেস্টেও। আটচল্লিশে মাঠের অবস্থা ব্যাটসম্যান আর বোলার উভয়েরই অনুকূলে ছিলো।

তবু, ছাব্বিশ-সাতাশের সিডনির ক্রিকেট মাঠ আজকের মাঠগুলোর তুলনায় অনেক বেশী পাকা ছিলো।

এত সব বলার পরেও একটা কথাই সবশেষে বলা যায়—সেটা হচ্ছে, কোনো এক যুগের বিশেষ কোনো প্রতিযোগী যদি পরের কোনো যুগে ভালো ফলের আশা রাখেন (রাখতে পারেন) তাহলে তাঁকে ক্রীড়া-কৌশলের পরিবর্তনও আনতে হবে।

মাঠের কথা

খেলোয়াড়দের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয়, সেটা হচ্ছে—'আপনার মতে কোন্ মাঠটা সবচেয়ে ভালো?' উত্তর দেবার সময় ঘটনার সঙ্গে আবেগের সংমিশ্রণ ঘটে। খুব খারাপ মাঠেরও হয়তা সুন্দর স্মৃতি আছে।

ক্যানাডার ব্রকটন পয়েন্টের মাঠ সম্পর্কে প্রশংসা করেছি কিছু আগে। এখানে অনেক নামী খেলোয়াড়ের হয়তো খেলা হয়ে ওঠেনি, কারণ তাঁদের প্রথমশ্রেণীর খেলাগুলোও হতো দামী মাঠেই। সেদিক দিয়ে তালিকার শীর্ষে এডিলেডের মাঠটি। তার প্রাচুর্য প্রকৃতিগত। মাঠের চারপাশে বাগান আর পার্ক, গির্জা আর অদূরে এডিলেড পাহাড়ের সারি। এক অনির্বচনীয় দৃশ্যের প্রতীক।

কিন্তু খেলোয়াড়ের চোখে মাঠটি লম্বায় বড় অথচ বিস্তারে কম। কেন্দ্র ছাড়া কোথাও পিচ পড়লে বাউণ্ডারী হাতের কাছে এসে গেলো। নির্ভেজাল ক্রিকেট মাঠ বলতে আমি সিডনির মাঠটাই বুঝি। চারদিকই মোটামুটি সমান, নরম ঘাসের আস্তরণ—মালীর যত্নও আছে। প্রথম যখন ওখানে খেলি মাঠভর্তি 'বুলি' মাটি। কালো, শক্ত মাটি। আজ মাটির

রং বদলেছে—চকোলেট রং নিয়েছে, স্পিনের উপযোগী হয়েছে, কিন্তু স্লো। অস্ট্রেলিয়ার আলো খারাপ—এবং সেইহেতু সিডনির মাঠই আদর্শ। তারপর স্কোর-বোর্ডের জেল্লা। তাও অননুকরণীয়।

'শক্ত' মাঠ একটাই অস্ট্রেলিয়াতে—মেলবোর্নের মাঠ। খুব কম সংখ্যক খেলোয়াড়ই যুঝতে পারবেন সারাদিন ওই মাঠে। কখনো কখনো পেছলও।

নতুন জনতার স্ট্যাণ্ডটি তৈরী হবার পরই অসুবিধে বেড়েছে। মেলবোর্নের মাঠে আর এক গোলমাল হলো বলের উচ্চতা ধরা, স্ট্যাণ্ডে অসংখ্য মানুষের ভীড়ে চোখে ধাঁধা লাগে।

তবু মেলবোর্নের মাঠে খেলতে আমার ভালো লাগতো, হয়তো উইকেটটা সয়ে গিয়েছিলো।

এবার আসুন ব্রিসবেনে। এ মাঠেরও বৈশিষ্ট্য আছে। পিচের বর্তমান উচ্চতা আর পেস সম্ভবতঃ অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মাঠের পরিচর্যার দায়িত্ব যাঁদের ওপর, তাঁদের ধন্যবাদ।

বিশ্রামের ঘরও আলাদা, বেশ ঘেরাই।

এ সব মাঠের এতো সুবিধে সত্ত্বেও লর্ডসের মাঠের তুলনায় কিছুই নয় বলা যায়—তার তুলনা নেই: বর্ণনার অতীত।

লর্ডসের মাঠে খেলার সুযোগ পাওয়াটা শিক্ষার ব্যাপারই বলা চলে। পুরনো দিনের সবই আছে—আছে ঐতিহাসিক ছবির সারি, ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষের, জায়গার আর ঘটনার। এমন কি যে ছোট্ট পাখীটা একদিন তার প্রাণ দিয়েছিলো ক্রিকেট বলের আঘাতে, সেও আছে—একটা কাঁচের পাত্রে।

সুন্দর শান্ত পরিবেশ মাঠের, আমাদের পূর্বপুরুষরা যেমনটি দেখেছেন; তেমনই আছে।

আর দর্শকদের প্রাণপ্রাচুর্য যদি চান তাহলে তা একমাত্র পাবেন ইয়র্কশায়ারে। কারখানার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মাঠ, পর্যাপ্ত আলোর অভাবে খেলা বন্ধের আবেদন যেখানে নৈমিত্তিক—সেখানে খেলার পরিবেশ কিন্তু অবিকৃত।

পুরনো একটা কথাও চলতি সেখানে, 'ওহে, ফারনেস্‌গুলোতে কয়লা দিয়ে দাও, অসি-রা (অস্ট্রেলীয়রা) ব্যাট শুরু করেছে।'

ইয়র্কশায়ারের গোপন অস্ত্র!

ধোঁয়া থাক আর নাই থাক—ইয়র্কশায়ার ক্রিকেটের অন্যতম আদর্শ মাঠ, ক্রিকেটকে মনোরম করতে অদ্বিতীয়।

চিঠি

ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ককে কি বিরাট চিঠির তাড়া নিয়ে পড়তে হয় সে সম্বন্ধে আগে বলেছি।

এ ছাড়া, সারা বছর ধরে রাশি রাশি চিঠি পেয়েছি, 'গুণমুগ্ধ'দের কাছ থেকে। এগুলোর বেশীর ভাগই এসেছে ক্রিকেটপ্রেমী কিশোরদের কাছ থেকে, সই প্রার্থনা করে।

চিঠি যে শুধু সাম্রাজ্যের ভেতর থেকে এসেছে তা নয়, ইয়োরোপের প্রায় সব প্রান্ত থেকেই এসেছে তাড়া তাড়া চিঠি। চিঠি পড়ে পড়ে একটা ব্যাপারে আমার খানিক অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিলো—হাতের লেখা পড়েই বুঝতাম কোন্ দেশের মানুষ লিখছে সেটা।

ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মানুষের হাতের লেখায় উল্লেখযোগ্য ফারাক আছে, বাচ্চাদেরই শুধু নয়, বড়দেরও।

যদি কোনোদিন এই দুই দেশের মানুষের সই পাশাপাশি দেখার সুযোগ হয়—দেখবেন। এ ছাড়া লেখকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও সন্ধান মিলবে তাতে। একবার এক চিঠি পেলাম, সই দেবার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখছেন একজন:

প্রিয় ডন ব্র্যাডম্যান,

আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ চিঠির উত্তর দেবার জন্যে। আপনি কি উদার! আমার হৃদয় আনন্দে নাচছে। কথা দিয়ে বোঝানো যায় না বলে এখানেই থামছি। আবার ধন্যবাদ। অনেক, অনেক।

ইতি একান্ত আপনার

স্মৃতিপটেই শুধু থাকতে চায় এমন "একজন"

কোন ইংরেজ বা অস্ট্রেলীয় বালক এ চিঠি লিখতে পারতো না। সই দেখারও দরকার নেই—ভারত থেকে এসেছে চিঠি। শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠিও এসেছে অনেক। কিছু অজ্ঞাতপরিচয় মানুষেরও। গালাগাল দেওয়া চিঠি। এগুলো সঙ্গে সঙ্গেই ময়লা কাগজের ঝুড়িতে চলে গেছে।

যে মানুষের নাম সই করার সৎসাহস নেই তার চিঠি মুহূর্তেরও বেশী সময় হাতে রাখার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

বেদনার বার্তাও বয়ে এনেছে চিঠি। সাহায্যপ্রার্থীর আবেদনও। শেষ সফরে এই চিঠিতে মজা পেয়েছি :

"প্রিয় ডন ব্র্যাডম্যান,

আমার একটা উপকার করার জন্যেই এ চিঠি লিখছি।"

তারপর অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর বিয়ের ব্যবস্থার কথা জানিয়ে বলেছেন : "ওর ভাবগতিক ঠিক বুঝতে পারছি না। ওখানে যাবার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, ওখানকার ব্যাপারটা জানা দরকার। আমার কাছে খবর আছে, ও চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলাকে নিজের গাড়িতে করে ঘুরছে। আমার বদলে হয়তো ওকে গ্রহণ করার পরিকল্পনাও থাকতে পারে। আমার বয়স ষাট ছুঁলেও, স্বাস্থ্য আমার অটুট।

আপনি এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আমাকে সাহায্য করলে আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দেবো।

পুনশ্চঃ—এইমাত্র খবর পেলাম, ও আজই শুক্রবার, তিনটের বিয়ে করছে, ওই মহিলাটিকেই। প্লেনের টিকিট কি বাতিল করা যায়?"

ভেবে পাইনি, আমার ক্রিকেট অভিজ্ঞতা দিয়ে কি করে এই বৈবাহিক দ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব!

চিঠিপত্রের ব্যাপারে অ্যামস্টারড্যামের একটা চিঠি উল্লেখযোগ্য।

খামে ফটো ছাপিয়ে দিলাম। চিঠিটা লর্ডসে আমাকে দেওয়া হয়—ইংল্যাণ্ডের ডাক-বিভাগের তৎপরতাকে ধন্যবাদ। যার শুধু চোখ দেখে পাঁচ কোটি মানুষ চিনতে পারে, তার পক্ষে স্বীকৃতি এড়ানো সম্ভব?

টেস্ট খেলার সময় অধিনায়করা মাঠে টস করার আগে কি ভাবেন? কি সমস্যা দেখা দেয়? দর্শকদের মনেও এই ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাঁরা কি এই অধিনায়কদের দায়িত্বভার নেবার আগের কথা জানেন?

খেলা শুরু হলো তো আর ভাবনার অবকাশ নেই। তাই যা কিছু ভাবার আগেই ভাবতে হয়।

আমার সৌভাগ্য যে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটা টেস্টের অধিনায়কত্ব করার সুযোগ পেয়েছি। চারটে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, একটা ভারতের সঙ্গে। ওই সময়ে অস্ট্রেলিয়া একটা 'রাবার'ও হারেনি, কিন্তু আমার অনেক ঘুম নষ্ট হয়েছে এগুলোতে।

আমার অধিনায়কত্ব নিয়ে কোনো বড়াই নেই, মানে অন্য পাঁচটা নেতৃত্বের চেয়ে বেশী এলেম দাবী করি না। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি অনেক—এতে পরিশ্রমও হয়েছে যেমন প্রয়োগে মাথাও খাটাতে হয়েছে তেমন। কোনো গলির রাস্তা দিয়ে এগুলো হয় না।

স্কুলে তো কোনো সুযোগই ছিলো না। দলের পরিচালনভারও পাই-নি সে সময়ে। পরে অবশ্য প্রথম শ্রেণীর খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছি, কিন্তু টেস্টের কথা ভাবিনি কোনো দিন। ছকবাঁধা রাস্তাতেই হেঁটেছি সে সব দিনে। অধিনায়কের প্রাথমিক কর্তব্য হলো টসে জেতা। এটাই ভাগ্য, যদিও অনেক অধিনায়কের ভাগ্যে তাদের অংশের অনেক বেশিই এসেছে। তবে, আমি সে দলে নই। যেমন ধরুন:

ছত্রিশ সালে প্রথম দুটো হেরে বাকি তিনটে জিতেছি।

আটত্রিশ সালের সব কটাই হেরেছি।

ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে দুটো জিতে বাকি তিনটে হেরেছি।

ভারতের বিরুদ্ধে, সাতচল্লিশ-আটচল্লিশে পাঁচটার চারটেয় জিতেছি।

ইংল্যাণ্ডের আটচল্লিশের খেলায় পাঁচটার মধ্যে তিনটেই হেরেছি। অর্থাৎ ছাব্বিশটার মধ্যে জিতেছি এগারোটায়, আদ্ধেকেরও কম।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে অস্ট্রেলিয়া যে খেলায় টসে জিতেছে তার কোনো টেস্ট খেলাতেই হার হয়নি।

অবশ্য টসে জেতা মানেই কোনো বাড়তি সুবিধে পাওয়া গেলো, তা নয়—কারণ যে বিজয়ী তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কিন্তু পরাজিত অধিনায়ক সে ভাবনা থেকে তখনকার মতো মুক্ত।

টসে হেরেও খেলায় জেতা যায়, সেটা সম্ভব সময়ের জন্যেই শুধু। উদাহরণ দিই একটা :

ক প্রথম ব্যাট করে চারশো রান করলো। খ উত্তরে করলো সাড়ে তিনশো। ক পরের বার পাঁচ উইকেটে তিনশো করে খেলা ছেড়ে দিলো এবং খ-এর যখন ন উইকেটে একশো সত্তর তখন খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। ক-এর রইলো এক উইকেটে একশো আশি রানের ব্যবধান।

ব্যাটিং উল্টোভাবে সাজালে ক আট উইকেটে জিততে পারতো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস নটিংহ্যামে আটচল্লিশ সালের টেস্ট আমরা জিতেছিলাম শুধু টসে হারার দরুন। কারণ আমাদের দ্রুত বোলাররা ওদের আক্রমণভাগকে ধসিয়ে দিয়েছে অতি অল্প সময়ে।

কিন্তু মাঠও বিশ্বাসঘাতকতা করে—অটচল্লিশে লর্ডসের খেলায় টসে জিতে ব্যাট করবো ঠিক করলাম, কারণ মাঠ দ্রুত খেলার উপযোগী নয় জানানো হয়েছিলো, হলো কিন্তু উল্টো—টেঁকাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো শেষ পর্যন্ত।

সমালোচকদের সঙ্গে অধিনায়কদের তফাতটা হচ্ছে, নেতাকে খেলার মাঠেই নিতে হচ্ছে তার সিদ্ধান্ত এবং বলা বাহুল্য, খেলা শুরু হবার আগেই। কাগজের লোকেরা হাতে অনেক সময় পান, কারণ লেখা বেরোয় খেলা শেষে।

উনিশশো ছাব্বিশের লিডসের খেলায় চোখ ফেরান—ইংল্যাণ্ডের আর্থার কার টসে জিতেও অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে দিলেন। বার্ডসলে প্রথম বলেই ধরা পড়লো। কার নিজেই ম্যাকার্টনির পঞ্চম বল ফেলে দিলেন, ফলে লাঞ্চের আগেই ম্যাকার্টনির সেঞ্চুরী। কার ওই ক্যাচ ফেলে না

দিলে তাঁর সুবিবেচনায় প্রশস্তির ঝড় বইতো, কিন্তু আসলে কি হলো? হেরে ভূত হলো দল।

একটি ভুলে খেলার মোড় ঘুরে যায়, ফলাফলও।

কোনো অধিনায়কের কিন্তু দলের স্বার্থে খেলা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাঁর রানসংখ্যার প্রয়োজন কতটুকু তা আগে জানা যাচ্ছে না। অনেক সময় মাঠের অবস্থা বুঝে ব্যাটিংয়ের রদবদল করতে হয়েছে আমাকে, এবং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাতে লাভবান হয়েছি। অনেকে অভিযোগ করেছেন আমি নাকি ভিজে মাঠে ব্যাট করার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাই। ঠিক কথা। কিন্তু সেটা সব সময়েই দলের স্বার্থে। কারণটা পরিষ্কার করে দিই, বৃষ্টির পরে মাঠের দ্রুত পরিবর্তন হয়। স্থিতিশীলতা আসতে কত সময় লাগবে কেউ বলতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের পরে রোদ্দুর দেখা দিলে মাঠ আঠালো হয়ে যায়। কিন্তু কতক্ষণ থাকে এই অবস্থা? কেউ বলতে পারেন না।

এবার ফিল্ডিংয়ের কথা। ফিল্ডিং সাজানো অধিনায়কের কঠিনতম কাজগুলোর একটা। বোলারদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সাজাতে হবে তাদের। আমাকে ডিপ স্লিপে ফিল্ডসম্যান সাজাতে বেগ পেতে হয়েছে, কারণ আমার ধারণা, কভারে হয়তো তাদের কাছে বল না-ও পৌঁছতে পারে। তারা হয়তো আবার বললো যে কাছে দাঁড়ালে ক্যাচ ধরার অসুবিধে হতে পারে। আমি বললাম, "বল যদি তোমার কাছে না পৌঁছোয়, তুমি তা ধরবে কি করে? বল ধরার চেষ্টা করা যায় না এমন জায়গায় দাঁড়ানোর চেয়ে ক্যাচ ফেলে দেওয়া ভালো।"

ফিল্ডিং সম্বন্ধে আমি ভীষণ সজাগ থাকতাম, খুঁতখুঁতেই বলা যায়। কিন্তু এটা দরকার। ক্যাচ ফাঁক যেতে পারে তিন ইঞ্চির জন্যে, আবার দাঁড়ানোর ভুলে সেটা দশ ফুটও হতে পারে। সেই আন্দাজ থাকলে দলনেতা কাছাকাছি নয়, ঠিক ওই জায়গাটাতে দাঁড় করাবেন তাঁর লোক। বোলিং পাল্টাবার সঠিক মুহূর্তটিও আপনার জানা দরকার। আপনার ফাস্ট বোলারটি দ্রুত উইকেট নিচ্ছে কিন্তু পরিশ্রান্তও হয়ে পড়ছে—তাকে কি তাড়াতাড়ি ফল পাবার জন্যে বোলিং চালিয়ে যেতে দেবেন, না খানিক

বিশ্রাম দিয়ে আবার আনবেন? একজন হয়তো ভালো বল করছে, এমন সময়ে এক ব্যাটসম্যান এলেন যাঁর অন্য বোলারের কাছে দুর্বলতার কথা জানা আছে আপনার। তখন কি করবেন? সঙ্গে সঙ্গে বোলার পাল্টাবেন? বড় বিচিত্র সমস্যা, যার সিদ্ধান্ত আগে থেকে নেওয়া যায় না। কৃতিত্ব তো সেই অধিনায়কের যিনি দুর্বল দল নিয়েও ভালো ফল দেখাতে পারেন। উদাহরণ: আর্মস্ট্রং, গ্রেগারী বা ম্যাকডোনাল্ডকে দিয়ে বোলিং শুরু করে কোনো কৃতিত্ব দাবী করতে পারেননি। পরে নামাতেন মিডিয়াম-পেস হেণ্ড্রী, ন্যাটা ম্যাকার্টনি, মেইলি আর 'স্লো' আর্মস্ট্রং স্বয়ং। দর্জির মাপ। তফাত দেখুন পরের কয়েকটা দলের—বোলিং শুরু করানো হতো শুধু মিডিয়াম-পেস বদলী খেলোয়াড়দের দিয়ে।

সাধারণভাবে ধরলে, একজন ব্যাটসম্যান অধিনায়ক হিসেবে বোলারের চেয়ে বেশী কাম্য। অন্ততঃ ক্রমাগত বল দেবার হাত থেকে নিজের রেহাই মেলে তাঁর। জর্জ গিফেনকে বারবার জনতার চিৎকার শুনতে হয়েছে, "বল ছাড়ুন না!"

আর একটা জিনিস মনে হয় আমার—অধিনায়ক এমন লোক হবেন দলে যাঁর স্থান অপরিহার্য। কোনো নেতাকে যদি তাঁর নিজের স্থান নিয়ে ভাবতে হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা দেখা দেবে। আমার সব সময়েই পছন্দ ছিলো এমন দলনেতাকে যিনি মাঠে কঠোর কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন। এমন লোকের সঙ্গে খেলে আনন্দ নেই, যিনি আপনাকে যেখানে খুশি চরে বেড়াতে দেবেন, বা আপনাকে কি করতে হবে বলে দিতে পারবেন না।

খেলোয়াড়দের ওপর দায়িত্ব ভাগ করে দিলে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজও পাওয়া যায়। দলের ছেলেদের সব সময়ে তাদের নেতার সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত, অবশ্য মানসিকতার তারতম্যে এটা হয়তো সব সময়ে সম্ভব হয় না। দু দলেরই নেতা যদি খেলাটিকে আকর্ষণীয় করতে চান তাহলে সেটা একটা প্রথম শ্রেণীর খেলা হতে বাধা কোথায়? আমাকে অসহযোগিতার জন্যে অনেক সময়ে গালাগাল শুনতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা জানেন না—আমি তখন প্রতিপক্ষের অসহযোগ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। আমি মন্থরগতি খেলা পছন্দ করি না, একান্ত নিরুপায় না হলে। আর একটা

কথা—প্রত্যেকটি অধিনায়ক আর তাঁর দলকে ক্রিকেট খেলার নিয়মগুলো কণ্ঠস্থ করতে হবে। পড়ে জ্ঞান লাভ করার চেয়ে আনন্দ বেশি তাতে।

এই তো অধিনায়কত্বের সমস্যা। বাস্তব সমস্যা। মাঠে এর অনেক-গুলোই স্পষ্ট। যদি কোনো তরুণ খেলোয়াড় অস্ট্রেলীয় একাদশের অধিনায়ক হবার স্বপ্ন দেখেন তাহলে তাঁকে তা হতে হবে শুধুমাত্র কর্তব্যের তাগিদে—কারণ পঞ্চাশ হাজার দর্শক, পঞ্চাশটা সাংবাদিক আর বাকি দশটা খেলোয়াড়কে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা প্রায় অসম্ভব।

স্বার্থের সংঘাত সেখানে অনিবার্য।

আমার এক এক সময় মনে হয় জনসাধারণ কবে বুঝবেন যে অধিনায়কও একজন রক্তেমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ—সঠিক রাস্তায় চলতে যে সব সময়ে সচেষ্ট। আলাদা জাতেরও মানুষ নয় সে। দলের খারাপ অবস্থায় জনতার সমর্থনই তো তার একমাত্র সান্ত্বনা।

আম্পায়াররা

ক্রিকেটের প্রিয়পাত্রদের নিয়ে যখন লোকে বাড়িতে, আগুনের ধারে, পথের ধারে, সরাইখানায় বা অন্য কোথাও আলোচনা চালায়, খেলায় যাদের গুরুত্ব অসীম সেই আম্পায়ারদের সম্বন্ধে কতটুকু আলোচনা করে তারা বলতে পারেন ?

যে কোনো খেলায় দক্ষ পরিচালকের অবদান অনস্বীকার্য। ক্রিকেটের বেলায় কিন্তু তার চেয়েও কিছু বেশী—টেস্ট খেলার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে একটা সিদ্ধান্তই যথেষ্ট।

ক্রিকেটে ভুল সিদ্ধান্তে যদি কোনো খেলোয়াড়কে আম্পায়ার 'আউট' ঘোষণা করেন, তাহলে তিনি আউট এবং ব্যাপারটা ওইখানেই শেষ হলো।

দ্বিতীয় সুযোগ নেই।

তাহলে ক্রিকেটে আম্পায়ারই হলেন শেষ কথা বলার মালিক। বিচারে এক ইঞ্চি এদিক-ওদিক হওয়া মানে একটা দলের বিপর্যয় ডেকে আনা।

তবু, যে কোনো তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়েরই আম্পায়ারের রায় বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া উচিত।

এমন একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় বোধহয় খুঁজে বের করা শক্ত যিনি অন্ততঃ একবারও ভুল রায়ে আউট হননি বা আউট হয়েছেন জেনেও আম্পায়ারের কৃপায় খেলা চালিয়ে গেছেন।

যদি এল. বি. ডব্লিউয়ের ঘটনা হয়, তাহলে খেলোয়াড়ের পক্ষে সেটা ধরা শক্ত, অন্য ক্ষেত্রে সে হয়তো নিশ্চিত যে ভুল হয়েছে কোথাও।

আমি একবার খেলায় নেমে দেখি নতুন বলে খেলা হচ্ছে। আমি খেলছি একটা নতুন সাদা রংয়ের ব্যাটে। প্রথম বলেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলাম, ব্যাটের ওপর বড় লাল-রঙা অর্ধচন্দ্রের দাগ নিয়ে। এল. বি. ডব্লিউ দেওয়া হয়েছিলো—নির্ভেজাল প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু সব সময়ে তো তা সম্ভব নয়।

উইকেটের পেছনে কেউ আউট হলে তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়; কারণ যত 'মৃদু' ছোঁয়াই হোক না কেন—ব্যাটের হাতলে তা ধরা পড়ে। আমার বল উইকেটরক্ষক ধরেছেন অথচ আবেদন করেননি—হয় তিনি শব্দটা শুনতে পাননি নয়তো ভেবেছেন বল আমার প্যাডে লেগেছিলো।

এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে। কিন্তু সবার ওপরে আছেন আম্পায়ার, আমাদের সময়ে যাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ উঠতো না। ইংরেজ আম্পায়াররা—আমার মতে, অস্ট্রেলীয় সতীর্থদের চেয়ে দক্ষ। কারণ পরিষ্কার—প্রথমতঃ, এঁদের অনেকেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। দ্বিতীয়তঃ, একজন আম্পায়ার একটা মরসুমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, অস্ট্রেলীয়দের সে অবস্থায় যেতে বেশ কয়েক বছর লাগে। তৃতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ আম্পায়ারই প্রাক্তন খেলোয়াড়।

প্রাক্তন খেলোয়াড়, এমন মানুষও আম্পায়ার হয়ে মত পাল্টান। কাউন্টি খেলোয়াড় বিল বেস্টউইক টেস্ট আম্পায়ার হবার পর একদিন স্বীকার করলেন, "আম্পায়ারগিরি শুরু করার পর দেখছি এমন অনেক উইকেট আমি নিজে খেলার সময় নিয়েছি যা প্রকৃত আউট হবার নয়।"

এই কঠিন গুরুত্বের কাজে উভয় দেশেরই তরুণরা এগিয়ে আসুক এই

আমার কামনা। ওদের চোখ আর কান অনেক বেশী তীক্ষ্ণ থাকা স্বাভাবিক—কারণ ক্রিকেটের সমস্ত আইন-কানুন পেটে থাকলেও কোনো আম্পায়ারের কাছে সুবিচার আশা করা বৃথা যদি সামান্যতম বধিরতাও থেকে থাকে তাঁর।

আবার আর একটা খেলায় আমাদের আম্পায়ারের চোখে ছিলো মোটা কাঁচের চশমা। উইকেট পড়লো একটা—আম্পায়ার এসে উইকেট ঠিক করতে বসলেন। একটা ব্যাট নিয়ে স্টাম্প গাঁথতে গেলেন এবং চোখে না দেখায় ফসকে গেলো সেটা।

সেই মুহূর্ত থেকে বুঝে নিলাম স্কোয়ার-লেগের দিক থেকে তাঁর পক্ষে ক্রিজ দেখা অসম্ভব।

বিনা দ্বিধায় ফ্র্যাঙ্ক চেস্টারকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আম্পায়ার বলে আমি স্বীকার করে নিয়েছি। আমাদের ইংল্যাণ্ড সফরের প্রায় সব খেলাই পরিচালনা করেছেন ইনি, এবং ভুল করেছেন কদাচিৎ। আবার, ভদ্রলোক অনেক বিস্ময়কর আর বিতর্কিত ব্যাপারেও রায় দিয়েছেন। কিছুদিন আগে কোন একটা কাগজে পড়েছিলাম খেলোয়াড়রা নাকি ঘন ঘন আবেদন করে আম্পায়ারকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। চেস্টারের বেলায় কিন্তু এটা খাটতো না। কারণ লীডসের এক টেস্ট খেলায় হেডলে ভেরিটি আমাদের এক ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে এল. বি. ডব্লিউয়ের আবেদন করলে চেস্টার বলে ওঠেন, "আউট হয়নি—হেডলে, বড় বাজে আবেদন করেছো!"

আমি একথা বলতে চাই না যে আম্পায়াররা এ ধরনের মন্তব্য করে যাবেন, তবে—আম্পায়ার যদি মনে করেন কোনো বোলার আজেবাজে আবেদন রাখছে এ মন্তব্য করার অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

চেস্টারের দুর্ভাগ্য যুদ্ধকালীন একটা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তাঁকে খেলা ছাড়তে হয়, নইলে ওঁর নামটা টেস্টের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের সঙ্গেই উচ্চারিত হতো। চেস্টার যখন আম্পায়ারের কাজ নেন তাঁর সব ইন্দ্রিয়ই অটুট। চেস্টার ক্রিকেট জগতে এক অলংকার, অনেক করেছেন ভদ্রলোক ক্রিকেটের জন্যে।

এবারে নাম করবো অস্ট্রেলীয় আম্পায়ার জর্জ হেলের। ইংল্যাণ্ডের যে সব খেলোয়াড় ওঁর পরিচালিত খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন হেলের শ্রেষ্ঠত্ব। অস্ট্রেলিয়ার মত হচ্ছে দুজন শ্রেষ্ঠ আম্পায়ারকেই দেওয়া হোক টেস্ট পরিচালনভার।

ইংল্যাণ্ডের বক্তব্য—মোটামুটি সমমানের দুজন আম্পায়ার বেছে নিয়ে তাদের পালা করে খেলা চালাতে দেওয়া হোক।

দুটো মতই যুক্তিসঙ্গত, আর তালিকাপদ্ধতি অনেক বেশী গণতান্ত্রিক।

এতে কিন্তু অনেক সাবধানতা প্রয়োজন। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের খাতিরে কাউকে আম্পায়ারের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। তার আগে তাঁকে দুটি পরীক্ষায় বসতে হবে—খেলা সম্পর্কে জ্ঞানের, আর খেলার মেজাজের।

শিক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনে কিন্তু কোনো আম্পায়ারকে টেস্ট খেলার পরিচালনভার দেওয়া যায় না, অন্য খেলাগুলোতে এর পরীক্ষা চলতে পারে। ইংল্যাণ্ডের আম্পায়াররা এদিক থেকে আদর্শস্থানীয়।

খেলোয়াড়দের তরফ থেকে আম্পায়ারদের অপ্রতিভ করার চেষ্টা চলেছে কখনো কখনো। প্রকাশ্য বিক্ষোভও দেখানো হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, এটা কিন্তু লজ্জাজনক। নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এ ব্যাপারে।

ইংরেজ আম্পায়ারদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ। বিল রিভসের কোনো দোসর কল্পনা করা যায় কি? অ্যালেক স্কেলডিংয়ের সেই গলা আজও আমার কানে বাজে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজকের মতো আপ্যায়নের ব্যাপারটা এখানেই সমাপ্ত হলো।'

প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন সর্বতোভাবে আম্পায়ারদের কাজে সহায়তা করার চেষ্টা করেন। ধোঁকা দিয়ে কোনো রায় নিজের অনুকূলে আনা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কারণ তা একদিন বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

পর্যালোচনা

ক্রিকেটের পর্যালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি কয়েকটি অসাধারণ খেলোয়াড়ের উল্লেখ না রাখি।

যাঁরা খেলেন না বা কোনোদিন খেলার মাঠেও যাননি তাঁরাও ক্রিকেট ভালবাসেন এবং মতামত ব্যক্ত করতে কোনো দ্বিধা করেন না। এই রকম একজন মানুষকে জানি, তিনি আমাদের সংস্থার জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন। পূর্ববর্তী রেকর্ডের হিসেব মুহূর্তের মধ্যে বলে দিতে পারতেন। একদিন অনুশীলনে একজন বোলারের অভাবে তাঁকে বল করতে অনুরোধ করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। কিন্তু একটা বলও উইকেটের দিকে গেলো না, পাশের জালের দিকেই তার গতি লক্ষ্য করা গেলো।

অথচ ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনা করুন এঁর সঙ্গে, অনেক বোদ্ধার চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা পাবেন এঁর কাছ থেকে।

গানের ব্যাপারে কিন্তু এটা চলে না, গান না গাইলেও তার ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনাও সম্ভব নয়।

বাটসম্যানদের মধ্যেও এমন দুর্বোধ্য ব্যাপার আছে। দুজন এমনকে জানি যাঁরা প্রতিটি বল খেলতে পারতেন, সুন্দর কবজির কাজ, অপূর্ব সময়জ্ঞান, স্বাস্থ্যও অটুট।

এঁদের একজন আন্তঃরাজ্য খেলায় অংশ নিয়েছেন পরে, অন্যজন পারেননি। এঁরা টেস্ট পর্যায়ে যেতে পারেননি কেন? হয়তো মেজাজী ছিলেন, কিংবা হয়তো ভুল খেলার জন্যে পারেননি, জানি না কেন।

সাধারণ আর অসাধারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে তফাত ধরা মুশকিল। এক হতে পারে যিনি অসাধারণ পর্যায়ে পড়েন তিনি হয়তো ভুল কম করেন, বা হয়তো সহজাত প্রজ্ঞার প্রয়োগ।

কিন্তু ভাগ্য কোনোক্রমেই নয়। পাঠকেরা হয়তো এ বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন আমার সঙ্গে, তবুও আমার মনে হয় আমার ধারণা ভুল নয়।

উইকেটরক্ষক

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে উইকেটরক্ষণে অসাধারণত্ব দাবী করতে পারেন এমন আধ ডজন মানুষও নেই। একবার কোনো উইকেটরক্ষক নাম করতে পারলে তাঁর স্থান দখল করা শক্ত। তাঁর ক্ষিপ্রতা আর চোখের তীক্ষ্ণতার খামতি না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত।

আগেকার দিনে আধুনিক দস্তানাও ছিলো না। যেগুলো ব্যবহৃত হতো সেগুলো বড়জোর সান্ধ্যভ্রমণে পরা যায়। লেগ-গার্ডগুলোর আকারও যথেষ্ট বড় ছিলো না।

মাঠের লং-স্টপে ফিল্ডিং সাজানোতে পরিষ্কার বোঝা যেতো উইকেটের পেছনে সব বল থামানো যায় না।

ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী টম হলওয়ে এই নিয়ে রসিকতাও করেছেন, লং-স্টপের অবলুপ্তিই তাঁর আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হবার একমাত্র প্রতিবন্ধকতা।

অস্ট্রেলিয়ার তিনজন উইকেটরক্ষক আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন, এঁরা হলেন কার্টার, ওল্ডফিল্ড আর ট্যালন।

'স্যামি' কার্টারের দিন গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের সময়টাতে। উনিশশো বিশ-একুশের টেস্ট পর্যায়ের খেলাগুলোয় ওল্ডফিল্ড তাঁর জায়গা দখল করলেন। করলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না। কার্টার ফিরে এলেন চতুর্থ আর পঞ্চম টেস্টে খেলতে—বিয়াল্লিশ বছর বয়সে। পঞ্চম টেস্টে কার্টারের খেলা দেখেছি, গ্রেগারী আর ম্যাকডোনাল্ডের উইকেট নেওয়ার ছবি আজও মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে আমার। বত্রিশ সালে কার্টার আমেরিকা সফরে গেছেন, আর্থার মেইলির দলে। তাঁর বৈশিষ্ট্য জায়গা ছাড়বেন না, আর—ত্নু নম্বর হলো, খুব দ্রুতগতির বল ছাড়া আর সবই ধরবেন।

এজন্যে তাঁকে অবশ্য একটা চোখও হারাতে হয়েছে।

সে টেস্টে ক্লিটউড-স্মিথ খেলেছেন, কিন্তু আনকোরা।' কার্টার একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, 'স্মিথের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে একটা

মরসুম খেলার ইচ্ছে আছে আমার। ওকে আমি এমনভাবে তৈরী করতে চাই যাতে ওর জন্যেই টেস্টে জিততে পারে অস্ট্রেলিয়া।'

এ কথাগুলো প্রায় সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে, যদিও স্মিথের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আর অংশ নেওয়া হয়ে ওঠেনি কার্টারের, কিন্তু শুধু একটা বলের জন্যে যদি কোনো টেস্ট খেলার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তাহলে সে বল স্মিথের: খেলা উনিশশো সাঁইত্রিশের এডিলেডের মাঠে। প্রতিপক্ষ ইংল্যাণ্ড।

এর পরেই নাম করবো বার্ট ওল্ডফিল্ডের, বেশ কয়েক বছর যিনি উইকেট-রক্ষণে অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ করেছেন।

ওল্ডফিল্ডের সঙ্গে খেলার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাঁর দক্ষতা আমাকে চমৎকৃত করেছে।

খেলার ওপর আশ্চর্য দখল—হাত-পা সবই নিখুঁত কাজ করে যাচ্ছে। স্টাম্পের কাজে অসাধারণ, বিশেষ লেগে। বল যদি মিডিয়াম পেসের হতো।

স্থির-নিশ্চিত না হয়ে কখনো কেউ ওল্ডফিল্ডকে আউটের আবেদন করতে দেখেনি।

কোনো ব্যাটসম্যান আউট হলে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিটুকুও অবিস্মরণীয়, ভাবখানা এই—"উপায় ছিলো না বন্ধু, কি করবো বল।"

জর্জ ডাকওয়ার্থ কিন্তু ঠিক উল্টোটা, তাঁর কর্কশ 'হাউজ্যাট' চিৎকার অনেক নির্দোষ ব্যাটসম্যানের পিলে চমকিয়ে দিতো।

এ সম্পর্কে একটা মজার গল্পও আছে—ডাকওয়ার্থের পিলে-চমকানো চিৎকারের পর কম্পমান ব্যাটসম্যানের কানে আর এক প্রস্থ মধুবর্ষণ করলেন তিনি—'আউট হয়ে গেছো তুমি!' ব্যাটসম্যান কানে আঙুল দিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে তারপর ধাতস্থ হলেন, 'ও তাই বুঝি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি তো ভেবেছিলাম বালির বস্তার মধ্যে ছিলাম এতোক্ষণ!'

ওল্ডফিল্ডের সেই জয়মুকুট আজ ডন ট্যালনের মাথায় পরাতে প্রস্তুত আমি। দুজনের ফারাক অনেক, তবু ট্যালন ভুল করেছে অনেক কম। আর, ফাস্ট বোলারদের লেগেই বেশী ওভার করেছে।

ট্যালনের দৈহিক উচ্চতা উইকেটরক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশীই, তাই তার চলাফেরায় ওল্ডফিল্ডের সে ছন্দ দেখা যায়নি।

কিন্তু তার ক্ষিপ্রতা? বিদ্যুৎগতি চলাফেরার তুলনা নেই। ট্যালনের মুখভাব কিন্তু উইকেট নেবার পরও ক্ষমাহীন। ট্যালন উইকেটরক্ষকদের মধ্যে সেরা অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান।

ইংরেজ উইকেটরক্ষকদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত—ডাকওয়ার্থ, এমস্ আর ইভান্স। আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় হিসেবে ওঁরা স্বীকৃত। ডাকওয়ার্থ বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেননি, তার কারণ এমস্। ভালো ব্যাটসম্যান বলেই অচিরাৎ ডাকওয়ার্থের জায়গা নিতে পেরেছেন। গডফ্রে ইভান্স কিন্তু সেই দলের উইকেটরক্ষক যাঁর কাছ একটি অতিরিক্ত রান নিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে প্রতিপক্ষ দলকে। ইভান্সের হাত দুটো লোহার মতো শক্ত ছিল বলে আমার ধারণা।

তবু, আটচল্লিশের খেলাগুলোয় ইভান্স কিছু কিছু ভুল করেছেন। ইংরেজদের ধারণা কিন্তু স্ট্রাডউইক তাঁদের সেরা উইকেটরক্ষক। ওঁরা তা মনে করতে পারেন। আমি করি না।

বোলার

অনেকবারই একটা প্রশ্ন এসেছে আমার কাছে, 'আপনি যাদের সঙ্গে খেলেছেন তাদের মধ্যে সেরা বোলার কাকে মনে হয়েছে?'

আমার উত্তর—ও'রিলী।

শুধু আমি কেন, যে সব প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান ও'রিলীর বলে খেলেছেন তাঁরা সকলেই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

কিন্তু লারউডের সঙ্গে তুলনা করলে দেখবো, যে লারউড নতুন বলে ওঁর চেয়ে অনেক বেশী উইকেট নিয়েছেন।

কাজেই বোলারদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করাই শ্রেয়।

ফাস্ট

আমি যখন 'বড়' খেলায় প্রথম নামি, অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক গ্রেগারী তখন দ্রুততম বোলার। আমার প্রথম টেস্ট খেলা সেটা, গ্রেগারীর ছিলো

সেটা সর্বশেষ খেলা। গ্রেগারী সে খেলায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য, তাঁর সঙ্গে অন্য দু-চারটে খেলায় আমার দেখা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার তখন লারউড, যদিও আজকের খ্যাতি তখনো পাননি তিনি।

এ ছাড়া উনিশশো একুশে দেখেছি টেড ম্যাকডোনাল্ডকে। তিরিশ সালে খেলেওছি তাঁর সঙ্গে।

তারপর এসেছেন টিম ওয়াল, ম্যাককরমিক আর লিণ্ডওয়াল।

এঁদের তুলনামূলক বিচার সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন অবস্থায় এঁদের খেলতে হয়েছে, তাতে সাধারণ বোলারও অসাধারণ খেলেছে, আবার অসাধারণ খ্যাতির বোলারও অতি সাধারণ খেলার প্রমাণ রেখেছে। সবই মাঠের হেরফেরে।

দ্রুততম বোলিং দেখেছি এক আদিবাসী বোলারের—কুইন্সল্যাণ্ডের এডি গিলবার্টের। যদিও সে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। গিলবার্ট কিন্তু পরিষ্কার খেলা খেলেনি কখনো।

আমার হাত থেকে একবার ব্যাটও ফেলে দিয়েছে সে।

কিন্তু একটা পুরো মরসুমের হিসেবে সব অবস্থা বিবেচনা করলে—লারউডই সর্বশ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার।

এক এক সময় অবিশ্বাস্য দ্রুত বল দিয়েছে সে।

এ ছাড়া ম্যাককরমিককেও কয়েক ওভার খুব জোরে বল করতে দেখেছি। আটচল্লিশ সালে ম্যানচেস্টারে লিণ্ডওয়ালও অত্যন্ত দ্রুত বল করেছে। কিন্তু শুধু পেসে কাজ হয় না সব সময়ে, মাথার ওপর চনচনে রোদ আর প্রাণহীন উইকেটে বোলারকে পদ্ধতি পাল্টাতে হয়—তখন কাজে লাগাতে হয় তার কর্মশক্তি আর মাথাটাকে।

নতুন বলে কিন্তু টিম ওয়ালের জুড়ি নেই। দেরীতে সুইং করানোর এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিলো তার। আর্কি জ্যাকসনের কথা মনে পড়ছে, এডিলেডের এক খেলায় টিমের একটা বল লেগ-গ্লান্স করতে গিয়ে দেখে 'অফ' বেল মাটিতে পড়ে আছে।

বল পুরনো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিমের দাপটও কমতো। লারউড অবশ্য

বডি-লাইন অধ্যায়ে কিছুটা খ্যাতি পেয়েছে। টেস্ট খেলার কয়েকটাতে সে অবশ্য সুবিধে করতে পারেনি—আটাশ-উনত্রিশে এডিলেডের খেলায় একশো বাহান্ন রানে একটা উইকেট পেয়েছে, একই সময়ে মেলবোর্নে পেয়েছে একশো আটষট্টিতে একটা, লিডসেও একটা, একশো উনচল্লিশে। ত্রিশ সালে ওভালে একশো বত্রিশ রানে একটা।

এই সংখ্যাগুলো সেই সময়েরই, যখন গ্রেগারী, ম্যাকডোনাল্ড আর অন্যান্যেরা ওই মাঠে খেলেছেন।

আমার কিন্তু কেন, ফারনেসের বল খেলতে যথেষ্ট অস্বস্তি হয়েছে। ফারনেস ফাস্ট বোলার ছিলো না। কিন্তু তার বল বেশ খানিকটা উচ্চতায় আসতো—উইকেটের থেকে একটু বাইরেই। অনেকগুলো উইকেট নিয়েছে ফারনেস 'বড়' খেলায়। বিশিষ্ট দল বনাম অবশিষ্ট খেলোয়াড়দের খেলায় তেতাল্লিশ রানে আটটা উইকেট নিয়েছে লর্ডসের মাঠে—উনিশশো আটত্রিশের খেলায়। সাঁইত্রিশ সালে মেলবোর্নে ছিয়ানব্বই রানে ছটা উইকেট, মোট রান ছিলো ছশো চার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দশটা উইকেটের কৃতিত্বও আছে তার। বত্রিশ-তেত্রিশের টেস্ট সিরিজ বাদ দিলে তার সঙ্গে লারউডের রেকর্ডের তফাত লক্ষ্যণীয় :

ফারনেস	৩৮টি উইকেট	১০৬৮ রান	গড় : ২৮·১০
লারউড	৩১টি উইকেট	১২৮০ রান	গড় : ৪১·২৯

গ্রেগারী আর ম্যাকডোনাল্ডের নাম জুটি হিসেবে একসঙ্গে উচ্চারিত,—তাঁদের অসাধারণ সাফল্যের জন্যে। গ্রেগারী ফিল্ডার হিসেবে অনন্য-সাধারণ, ব্যাটিংয়েও দুর্দান্ত। কিন্তু শুরু বোলার হিসেবে ম্যাকডোনাল্ডের স্থান তাঁর উর্ধ্বে।

ভিক্টোরিয়ার এই দীর্ঘকায় ছেলেটির খেলায় এক আশ্চর্য ছন্দ ছিলো, অফুরন্ত কর্মদক্ষতা আর সত্যিকার পেস ছিলো তার।

ওর পরেই যার নাম করতে হয় সে হচ্ছে রে লিণ্ডওয়াল। উচ্চতায় অবশ্যই ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ে অনেক খাটো এবং তাতে কিছু অসুবিধেও ছিলো তার।

একটা কাকতালীয় ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

ম্যাকডোনাল্ড তাঁর প্রথম সফরে সাতাশটা উইকেট নিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একই ফল দেখিয়েছে লিণ্ডওয়াল।

ফাস্ট বোলিংয়ের প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কনস্ট্যানটাইনের সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয়। সিডনির মাঠে নিউ সাউথ ওয়েলসের সঙ্গে খেলায় পঁয়তাল্লিশ রানে ছটা উইকেট নিয়েছিলো সে। বিড়ালের পায়ের লঘুতা নিয়ে মাঠে এগোতো কনস্ট্যানটাইন।

পৃথিবীর অন্যতম সেরা চৌকস খেলোয়াড় হিসেবেও সে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ফাস্ট বোলারদের প্রচণ্ড শারীরিক শ্রম হয়, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই খুব কমসংখ্যক ফাস্ট বোলারই খ্যাতির শীর্ষে উঠতে পেরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মতো প্রচণ্ড গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এখনো ফাস্ট বোলারের সন্ধান মেলার ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের।

মিডিয়াম পেস

এ দলে তাঁদের ফেলছি যাঁরা স্লো স্পিনের লোক নন আবার দ্রুত বলের দলেও নন। নিজস্ব ধারা তাঁদের আলাদা হলেও আমার মনে শুধু দুটো নামই আছে যাঁদের একজনকে বেছে নেওয়া যায়। নাম দুটো হচ্ছে মরিস টেট আর অ্যালেক বেডসার।

ফলাফল নির্ধারণে শুধু যদি সংখ্যার দরকারই হয় তাহলে পয়লা নম্বরে আসবে টেট।

উনিশশো চব্বিশ-পঁচিশে সে প্রথম আর্থার গিলিগ্যানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফর করেছিলো—মোক্ষম সফর: আটত্রিশটা উইকেটের কৃতিত্ব নিয়ে ফিরেছিলো। মিডিয়াম পেস বোলারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। উনত্রিশ বছর বয়স তখন টেটের। সুইংয়ে কাঁধের কাজ ছিলো নিখুঁত, শিক্ষার্থীদের দেখবার জিনিস। এতে প্রচণ্ড গতি আসতো বলে।

আটাশ-উনত্রিশ সালেও ছিলো তার ফর্ম, পড়তির দিকে যদিও। টেটেরও পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিলো সুইংয়ে।

উনিশশো ত্রিশ সালে হোভে অস্ট্রেলীয়দের বিরুদ্ধে সে বল না পাল্টে

লাঞ্চ পর্যন্ত চালিয়ে গেলো, আঠারো রানে ছ উইকেট হারানোদের দলে ছিলেন পলফোর্ড, জ্যাকসন, ম্যাকক্যাব, রিচার্ডসন, ফেয়ারফ্যাক্স আর আ' বেকেট।

বেডসারও একই কায়দার বোলার। একই দেশের লোক। বেডসারের বল একটু ওপরে উঠতো, এই যা। লেগ থেকে অফে বল কাটার কাজও ভালো জানা তার। এই কায়দায় সে অনেক ব্যাটসম্যান ঘায়েল করেছে, এবং স্বীকার করি আমারও চিন্তার কারণ হয়েছিলো।

আউটস্যুইংয়ে অবশ্য টেট বেডসারের চেয়ে বেশী খ্যাতি পেয়েছে।

বেডসারের দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা তার শর্ট লেংথে বল করার প্রবণতা।

টেটের চেয়ে কিন্তু বেডসারের বলে খেলা শক্ত ছিলো (আটচল্লিশের ইংল্যাণ্ড সফরের কথা বলছি)। কিন্তু আমারও তো বয়স পড়ে ছিলো না। আজকের ছেলেদের কাছে বেডসারই শ্রেষ্ঠ মিডিয়াম পেস বোলারের ছাড়পত্র পাবে। কিন্তু চব্বিশ সালে যারা টেটকে দেখেছে, তারা আবার তার দিকেই ভোট দেবে।

নিঃসন্দেহে দুজনেই অনবদ্য খেলোয়াড়।

ব্যাটসম্যান না হলে সম্ভবতঃ ওয়ালি হ্যামণ্ডও টেট-বেডসারের সমকক্ষ হতে পারতেন, কারণ ব্যাটের কাজ কোনো খেলায় খারাপ হলেও অদ্ভুত ভালো মিডিয়াম পেস বোলিং করতে দেখেছি হ্যামণ্ডকে।

স্লো বোলার

এই পর্যায়ের বোলারদের নাম করতে গিয়ে ভাবতে হবে আপনাকে। অনেক নামের ভিড়ে যাঁরা আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ছে স্লো লেগ-ব্রেকে গ্রিমেট আর মেইলির কথা। ন্যাটা গুগলি বোলার ট্রাইব আর ফ্লিটউড-স্মিথের কথা। রোডস আর ভেরিটির কথাও ভুললে চলবে না। ন্যাটা বোলার নন এমন আছেন ব্ল্যাকি আর ইয়ান জনসন, আর আছেন স্বনামধন্য ও'রিলী।

তবে, সর্বাগ্রে নাম করবো গ্রিমেটের। যে কোনো সময়ে খেলতে নেমে পুরো লেংথে বল শুরু করতে পারতেন গ্রিমেট।

আর্থার মেইলির 'দুষ্ট' স্পিন কিন্তু গ্রিমেটকে লজ্জা দেয়।

কথিত আছে মেইলি নাকি উদার হাতে বল দিতেন, আর গ্রিমেটের নাকি কার্পণ্য ছিলো এ ব্যাপারে। কথাটা সত্যি, কারণ কত রান উঠলো তার বলে মেইলি তার পরোয়া করেনি কোনোদিন, উইকেট নেওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু গ্রিমেটের হাতে রান নেওয়া চলবে না—রানশূন্য (মেডেন) ওভারের দিকেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

নির্ভেজাল স্লো লেগ-স্পিনার বলতে যা বোঝায়, ক্ল্যারি গ্রিমেট তাই। পেসের তারতম্য আনা—এল. বি. ডব্লিউয়ের কাজে সিদ্ধহস্ত। হবডার্নও এই দলে। অনেকে তাঁকে আরও কৃতিত্বের দাবীদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। হয়তো তাই। ডঃ হবডার্নের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা আমার সীমিত, কাজেই আমার বলার কিছু নেই।

গ্রিমেটের বোলিং রেকর্ড কিন্তু তখনো অম্লান, টেস্ট সিরিজে হাজার রান আর কোনো খেলোয়াড় করেননি।

ইংরেজদের মধ্যে নাম করতে হয় ডাগ রাইটের। অনেকটা ও'রিলীর ধরনের বোলিং করতেন ভদ্রলোক। নাম আরো আছে—ফ্রিম্যান, ডিক টিলডেস্‌লে। ফ্রিম্যান কিন্তু অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের বিপদের কারণ হননি।

ন্যাটা গুগ্‌লি বোলারদের তালিকায় পয়লা নাম ফ্লিটউড-স্মিথের। তাঁর বল কোন্‌দিকে ঘুরবে কেউ বলতে পারেনি কখনো। এই দলের, অন্যেরা হলেন রোডস, ভেরিটি, জ্যাক হোয়াইট আর বার্ট আইরনমঙ্গার। এঁদের বোলিংয়ের ধারা কিন্তু একেবারে ভিন্নধর্মী। নিখুঁত কাজ—তর্জনী দিয়ে অল্প 'স্পিন'—ব্যাটসম্যানের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এটা সম্ভব শুকনো উইকেটে। চটচটে উইকেটে কিন্তু অন্য চিত্র।

আমি খেলা শুরু করার আগেই উইলফ্রেড রোডস তাঁর খেলার পালা সাঙ্গ করে এনেছেন। তাঁর সঙ্গে খেলেছি। ওই স্বল্প মোলাকাতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য মুগ্ধ করেছে আমাকে। তবু, ভেরিটির সমকক্ষ বলে তাঁকে মেনে

নিতে কষ্ট হয়। রোডসের ছাত্র ভেরিটি গুরুর সব বিদ্যেরই অধিকারী হতে পেরেছিলেন। ভাল পিচে বোলারদের বল দেওয়ার একটা অলিখিত প্রথা আছে, ব্যাটসম্যানকে রক্ষণমূলক খেলার দিকে টেনে নিয়ে ভুলের গাড্ডায় ফেলা।

বৃষ্টির দিনে ন্যাটা বোলাররা কিন্তু ব্যাটসম্যানদের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়েছে। ফলে বৃষ্টির আশংকা থাকলেই ইংল্যাণ্ড একজন ন্যাটা বোলার খেলাতোই।

দিন অবশ্য বদলেছে। পিচ খোলা থাকলেও আজ বোলারদের বল দেওয়ার জায়গা ঢাকা দেবার রীতি চালু। ফলে ভিজে মাঠেও ফাস্ট বোলারদের সংখ্যা বাড়ছে।

এ ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়।

ন্যাটা বোলার নন এমন দু-একজনের উল্লেখ করি—ডন ব্ল্যাকি বয়সের তুলনায় আশ্চর্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তরুণ তরফের মধ্যে নাম করবো ইয়ান জনসনের।

সবার ওপরে

উইলিয়াম জে. ও'রিলীর বিরুদ্ধে প্রথম খেলি কংক্রীট পিচে, বাউরালের 'ব্র্যাডম্যান ওভাল' বলে যে মাঠের পরিচিতি আজ। সেখানে এক বেলার খেলা ছিলো সেদিন। ও'রিলীর প্রথম কয়েকটা ওভার ঠেকাতে পেরেছিলাম—ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। তারপর নট আউট থেকে গেলাম শেষ অবধি, দুশো চৌত্রিশ করে। পরের শনিবার খেলা চললো উইঙ্গেলোর মাঠে, কোনো রান নেবার আগেই ও'রিলীর বলে বসে যেতে হলো। ওঁর ওই পেসে লেগের বল ঘোরানোর কায়দায় বিস্মিত হয়েছিলাম বইকি। এটা ঘটেছিলো উনিশশো ছাব্বিশে। এর পরে—অনেকদিন পরেও, একাধিক ব্যাটসম্যানের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন ও'রিলী।

সাধারণ লেগ-স্পিনারদের মতো আঙুলের মধ্যে বল থাকতো না ও'রিলীর, হাতের চেটোয় রাখতেন বল। গ্রিপ পাল্টাবার জন্যে উপদেশ এসেছে 'বিশেষজ্ঞদের' কাছ থেকে, উনি কান দেননি তাতে। ও'রিলী

বরাবরই আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে খেলেছেন। প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সাহসের প্রতিমূর্তিই বলা চলে তাঁকে।

তাঁর টেস্ট রেকর্ডও অসাধারণ—উনিশশো বত্রিশ-তেত্রিশ থেকে আটত্রিশ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পেয়েছেন একশো দুটো উইকেট।

বারনেসের সঙ্গে তাঁর বোলিং গড়ে একটা তুলনামূলক হিসেবে দেখা যায় যে, বারনেস ও'রিলীর চেয়ে ফাস্ট বোলার হিসেবে কিঞ্চিৎ বেশী পরিচিতি পেয়েছে।

দুটো আলাদা যুগের দুজন বোলারের তুলনা চলে না, কিন্তু আমার মনে এঁদের খেলার ছবি ম্লান হবে না কোনোদিন। দুজনের রেকর্ডের হিসেব দিয়ে দিলাম :

বারনেস	১০৬ উইকেট	২,৮৮৮ রান	গড়	২১'৫৮
ও'রিলী	১০২ "	২,৬১৬ "	"	২৫'৬৪

পরলোকগত স্যর স্ট্যানলি জ্যাকসন একবার আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জর্জ লোহ্ম্যান ও'রিলীর তুলনায় অনেক বড় বোলার।

আমি শুধু শুনেছি।

ব্যাটসম্যান

এক ডাকে বিশ্বের মানুষ যাঁদের চেনেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করতে লজ্জা পাচ্ছি। ডব্লিউ. জি. গ্রেস বা ভিক্টর ট্রাম্পারের মতো দিকপাল খেলোয়াড়দের কথা বলতে যাওয়াটাই তো ধৃষ্টতা।

এঁদের ব্যাটিং গড় সম্বন্ধে কিছু বলার আগে বলি—উইকেটের পরিবর্তন, ক্রিকেটের মনস্তত্ত্ব আর আঙ্গিকের পরিবর্তনও ঘটেছে অনেক। উইকেটের উচ্চতা বেড়েছে, বলের আয়তন কমেছে, পরিবর্তিত হয়েছে এল. বি. ডব্লিউয়ের আইন।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ট্রাম্পারের গড় হিসেব করলে তাঁকে পয়লা সারিতে ফেলা যায় কি ?

৭৪টা ইনিংসে করেছেন ২,২৬৩ রান, গড় ৩২'৭৯। অন্যদিকে নিউ

সাউথ ওয়েলসের অ্যালান ফেয়ারফ্যাক্সের গড় হচ্ছে তিপান্নরও বেশী। কিন্তু ট্রাম্পারের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে শুনেছেন কাউকে? ইদানীং এক ক্রিকেটামোদীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিলো উনিশশো দুই আর উনিশশো আটচল্লিশ সালের দলগত শক্তি সম্পর্কে। আমার মত: পরবর্তী সময়ে খেলার কোনো অগ্রগতি আমি অন্ততঃ লক্ষ্য করিনি। তাই বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, আমি শুধু যাঁদের খেলা দেখেছি তাঁদের সম্বন্ধে বলবো। ইংল্যাণ্ডের কথাই বলি—প্রথম সারির চারজন হলেন; হ্যামণ্ড, হব্‌স্‌, কম্পটন আর হাটন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের টেস্ট রেকর্ড দিয়ে দিলাম:

	ইনিংস	নট আউট	রান	গড়
হ্যামণ্ড	৫৮	৩	২,৮৫২	৫১·৮
হব্‌স্‌	৭১	৪	৩,৬৩৮	৫৪·২৬
কম্পটন	২৬	৩	১,২৩৫	৫৩·৬
হাটন	২১	১	১,২৩২	৬১·৬

হ্যামণ্ডের খেলোয়াড়ী জীবনের তুলনা মেলে আমার সঙ্গে। সুন্দর স্বাস্থ্যের, হালকা পায়ের এই যুবক উনিশশো আঠারো থেকে আটত্রিশ সাল পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়েছেন। ড্রাইভের কাজে অতুলনীয়। দুর্বলতাও ছিলো হ্যামণ্ডের। হুকের মার বড় একটা ছিলো না তাঁর। এ ছাড়া স্কোয়ার-লেগ আর মিড-অনের বল খেলার অসুবিধেও দেখেছি তাঁর। কিন্তু, তবু হ্যামণ্ড কোনোদিন রক্ষণাত্মক খেলা খেলেননি। অনের দুর্বলতা কাটিয়েছেন অফের মারে।

জ্যাক হব্‌স্‌ সম্পর্কে লিখতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ আমি যখন নিয়মিত খেলোয়াড়, হব্‌স্‌ তখন অবসর গ্রহণের মুখে।

তবু, ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলীয় ব্যাটধারীদের সবসেরা হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।

আটাশ সালে যখন হব্‌সের সঙ্গে মাঠে দেখা, তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ ছুঁয়েছে। খেলা অনেক স্তিমিত।

উনিশশো বারো সালের হব্‌স্‌কে জানতে গেলে চলচ্চিত্রের সাহায্য নিতে হবে।

হাটনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে গিয়ে দেখি, হাটনকেও উপেক্ষা করা যায় না। রক্ষণাত্মক খেলাই ছিলো হাটনের একমাত্র দুর্বলতা।

হাটনের হাতে চোট পাওয়ার জন্যেই তিনি আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নেন-নি—এটা মনে হয় না। কারণ চোট পাবার আগেও এ খেলা খেলেছেন তিনি। তাছাড়া সিডনির দ্বিতীয় টেস্ট প্রমাণ করেছে হাটন কি প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছেন, সামান্য সময়ের জন্যে হলেও।

হুকের মারে হ্যামণ্ডের মতোই হাটনেরও অনাসক্তি ছিলো; কিন্তু প্রয়োজনে খেলেছেন। ফাস্টের চেয়ে স্লো বলেই হাটন স্বস্তি পেতেন বেশী।

এটা কম্পটনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ডেনিস কম্পটন—ক্রিকেটে এক অবিস্মরণীয় নাম। বাঁ হাতে কবজির কাজে নিপুণতার অভাব আর স্ট্রোকের মানের সমুন্নত নয় ধরে নিলেও কভারে ডেনিসের তুলনা বিরল। কেতাদুরস্ত খেলোয়াড় না হয়েও কম্পটন প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছেন। দুর্বলতা একটা জায়গাতেই, সেটা তাঁর ফাস্ট বোলারের শর্ট পিচ বল খেলতে না পারা।

সাতচল্লিশ সালে টম হেওয়ার্ডের রেকর্ড ভাঙেন ডেনিস। টমের রেকর্ড ৩,৫১৮ রান, উনিশঁশো ছ' সালের। গড় ৬৬'৩৭। কম্পটনের ৩,৮১৬, গড় ৯০'৮৫। অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে প্রথম সারির ব্যাট দুজন—পন্সফোর্ড আর মরিস। মরিস এখনো খেলছে, কাজেই ধরে নেবো ক্রিকেটের ইতিহাসে তার জায়গা থাকবে। বিল পন্সফোর্ড নেমেই আগের সমস্ত রেকর্ড নস্যাৎ করতে শুরু করে দিলো।

সিডনিতে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলায় দেয়াললিপি পড়েছিলো: 'আসুন—পন্সফোর্ডের খেলা দেখতে আসুন।'

ঈর্ষার শিকার হয়েছিলো পন্সফোর্ড একসময়ে। ফাস্ট বোলাররা দলবদ্ধ আক্রমণ শুরু করেছিলো তার বিরুদ্ধে। আমি নিজে দেখেছি এটা ঘটতে।

লারউডের সঙ্গে পন্সফোর্ডের অসদ্ভাব রয়েছে সাধারণ মানুষ এটা ধরেই

নিয়েছিলো। এ ধারণা ঘনীভূত হলো সিডনি টেস্টের একটা খেলায়—লারউডের বলে পন্সফোর্ডের হাত ভাঙলো। এর পর প্রায় প্রতিটি খেলাতেই পন্সফোর্ডকে 'মেরে' যাওয়া হলো এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই চৌত্রিশ সালের পর অবসর নিলো সে। দুঃখের কথা, কারণ পন্সফোর্ডের খেলায় তখনো কোনো অবনতি দেখিনি। বোলিংয়ের যম ছিলো পন্সফোর্ড। উনিশশো ত্রিশে লর্ডসের মাঠে গাবি অ্যালেনকে ছাড়িয়ে গেছে, সমানে ডাইনে-বাঁয়ে পিটিয়ে। এই একটা মানুষই ফাস্ট বোলারদের নাকাল করেছে।

পন্সফোর্ডের প্রিয় মার ছিলো স্কোয়ার লেগের। দুটো খেলাতে চারশোর বেশী রান করেছে, চারটে পর পর ইনিংসে তার রানসংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে।

আর্থার মরিস যখন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার তৃতীয় মরসুম খেলছে তখন এই বই লিখছি আমি, কাজেই তার সম্পর্কে সব কথা বলা যায় না। তবু, মরিস যদি আজ খেলা ছেড়েও দেয়, তাকে অন্যতম সেরা ন্যাটা ব্যাট হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।

বার্ডসলের সমর্থকরা হয়তো এবার খেপে যাবেন, কিন্তু ধীরে—ইংল্যাণ্ডে তিনটে সেঞ্চুরী করতে বার্ডসলের লেগেছিলো উনপঞ্চাশটা ইনিংস। মরিস এরই ভেতর সতেরোটা ইনিংস খেলে ছটা সেঞ্চুরী নিয়ে নিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়াতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বার্ডসলে কখনো সেঞ্চুরী করতে পারে-নি, মরিস তার প্রথম মরসুমেই তিনটে করেছে। পাঠকদের স্মরণ না থাকতে পারে, কিন্তু এটা ঘটনা যে বার্ডসলে তার শেষ পনেরোটা ইনিংসের মাত্র একটাতে পঁচিশ রানের বেশী করতে পেরেছে। অস্ট্রেলিয়াতে উনিশশো এগারো-বারো সালে আর ইংল্যাণ্ডে উনিশশো বারো সালে বার্ডসলের স্কোর ছিলো: ৩০, ১২, ০, ১৬, ৫, ৬৩, ০, ৩, ২১, ৩০, ০; এগারোটা ইনিংসে মোট রান ১৮০। গড় ১৬·৩। বার্ডসলের বয়স তখন আটাশ, কাজেই অবসর নেবার কথা বলা যায় না। আটচল্লিশ সালে ইংল্যাণ্ড সফরের সময় মরিসের বয়স ছিলো ছাব্বিশ।

আটচল্লিশে মরিসের যে খেলা দেখেছি তাতে তাকে উলি এবং লেল্যাণ্ডের

ওপরে স্থান দেওয়া চলে। উলির সমর্থকদের ভ্রূ নেচে উঠবে এতে, কিন্তু আমি তো বলেছি ইংল্যাণ্ডে প্রথম সফরেই মরিস তিনটে সেঞ্চুরী করেছে। উলি পঁচিশটা ইনিংস খেলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটা সেঞ্চুরীও করতে পারেনি। একান্নটা ইনিংসে ছুটো সেঞ্চুরী মাত্র করার ভাগ্য হয়েছে তার।

মরিস আরো খেলবে, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে তার জায়গা করে নেবে যথাসময়ে।

আর একজন অসাধারণ খেলোয়াড় স্ট্যান ম্যাককাব। আমারই মতো মফস্বলের ছেলে স্ট্যান, পরে খেলতে এসেছে শহরে। স্ট্যান নাম করতে না পারলেও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টের রানসংখ্যা ভালোই। বড় কেতা-ছুরস্ত খেলোয়াড় স্ট্যান।

হয়তো একাগ্রতার অভাব কখনো কখনো দেখা গেছে তার, শেষ দিককার খেলাগুলোতে যেজন্যে রানের সংখ্যা কমেছে।

একটা খেলার জন্যে হলেও স্ট্যানের উল্লেখ থাকা উচিত—নটিংহ্যাম টেস্টে তার ছুশো বত্রিশ রানের কথা, সালটা উনিশশো বত্রিশ।

এই খেলার কথা আমি ভুলিনি, ভুলবোও না। সেকথাই বলি—ইংল্যাণ্ড প্রথম ব্যাট করে আট উইকেটে ছশো আটান্ন করে খেলা ছেড়ে দিলো। অস্ট্রেলিয়ার জেতার অতএব আর কোনো আশাই নেই, কিন্তু ড্র করা যায় না কি?

সেটাও অসম্ভব মনে হলো যখন আমাদের একশো চুরানব্বই রানে ছটা উইকেট পড়ে গেলো। কিন্তু তখনো ম্যাকক্যাবকে হিসেবের মধ্যে ধরিনি আমরা।

বাকি বারনেট, ও'রিলী, ম্যাককরমিক আর ফ্লিটউড-স্মিথ। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যাটসম্যান—বারনেট। স্ট্যান নেমেই পেটাতে আরম্ভ করলো, রান হলো তার ছুশো বত্রিশ, বাকি তিনশোর মধ্যে। তার খেলা দেখতে দেখতে শেষে আবিষ্ট হয়ে গেছি, আহা—মন-ভরানো খেলা।

রাইটের বলে চুয়াল্লিশ রান করলো স্ট্যান, তিন ওভারে। ফিল্ডিং সরে গেছে বাউণ্ডারীতে তখন—আটাশ মিনিটে বাহাত্তর রান করলো সে। শেষ উইকেটের জুটি ফ্লিটউড-স্মিথ। স্মিথের রান সাতাত্তর।

এ খেলা আর দেখা যাবে না, এ বর্ণনাও বোধহয় আর দেওয়া সম্ভব হবে না। ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে নেভিল কার্ডাস লিখলেন: "এক মহান ইনিংস খেলে আজ ম্যাককাব টেস্ট ক্রিকেটকে সম্মানিত করেছে। দুর্দৈব থেকে বাঁচিয়েছে দলকে। খেলতে নামার এক ঘণ্টার মধ্যে সে ফিল্ডিংয়ে বিপর্যয় এনেছে। নির্ভীকতায় আমাদের হৃদয় জয় করেছে স্ট্যান।

লাঞ্চের পর আধ ঘণ্টায় সে পঞ্চাশ রান নিয়েছে, মাপা গতি অথচ তীব্রতার ঝলক সে মারে। কি কাটে, গ্লান্সে আর ড্রাইভে—অবাধে চলেছে তার ব্যাট। এ খেলা আনন্দ দিয়েছে—শক্তির আধার, কিন্তু নেই তাতে লোলুপতা। নেই সুবিধেবাদিতা বা হীনতার প্রলেপ।

পরাজয়ের মুখে আশ্বাসের দৃঢ়তা।

রাইটের এক ওভারে চার মেরে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। জুটি স্মিথ আমারই মত দর্শকে পরিণত।

খেলার ইতিহাসে এক অনবদ্য ইনিংস। হৃদয়হরণকারী খেলা। ট্রাম্পারের উত্তরসূরী হবার যোগ্যতা অর্জিত আজকের খেলায়।"

বিশ্রাম ঘরে ম্যাকক্যাব ফিরে আসার পর আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি, এত অভিভূত হয়েছিলাম সেদিন।

তবু তার হাত চেপে ধরেছি, ঘামঝরা হাত। তখনো উত্তেজনায় কাঁপছে স্ট্যান। আমি কোনোরকমে বলতে পেরেছি, 'এই খেলা খেলতে আমার অনেক রক্ত জল হতো, স্ট্যান।'

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাকক্যাব আর একবার এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছে। বত্রিশ সালে সিডনির ক্রিকেট মাঠে হয় খেলাটা; নেতৃত্ব করেছিলেন জার্ডিন। প্রথম পর্বে নট আউট থেকে একশো সাতাশি করেছিলো স্ট্যান। যাঁরা এ খেলা দেখেছেন তাঁরা একবাক্যে অভূতপূর্ব বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জয়ের মুকুটে আর একটি রত্নের সংযোজন।

শেষ করার আগে স্ট্যানের আর একটা ঐতিহাসিক ইনিংসের কথা বলবো। পঁয়ত্রিশে জোহানসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে করেছে একশো উননব্বই, অপরাজিত থেকে।

আমি এ খেলা দেখিনি। কিন্তু যাঁরা দেখেছেন, স্ট্যানের উজ্জ্বল খেলায় তাঁরা বিমোহিত।

খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা—খারাপ আলোয় খেলার শেষ হয়, আলোক-স্বল্পতার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ওয়েডকে আবেদন করতে হয়েছে।

পন্সফোর্ড, মরিস আর ম্যাকক্যাবের টেস্ট খেলার একটা আপেক্ষিক পরিসংখ্যান দিলাম :

	ইনিংস	নট আউট	সমষ্টি	গড়
পন্সফোর্ড	৩৫	২	১,৫৫৮	৪৭.২১
ম্যাকক্যাব	৪৩	৩	১,৯৩১	৪৮.২৭
মরিস	১৭	২	১,১৯৯	৭৯.৯

ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে খেলা বড়। ঠিকই, কিন্তু খেলোয়াড়দের বিরাটত্বই কি খেলার মূলধন নয়?

যাই বলুন না কেন, জনসাধারণ তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে ভালবেসেছেন। এটাই স্বাভাবিক, এর পরিবর্তন কখনো হবে না।

বিদায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যোগদানের কুড়িটা বছর পেরিয়েছে, তবু ফিরে যেতে চাই প্রথমাবস্থায়—একটা প্রশ্নই করি নিজেকে, আমার খেলার জীবন কি সার্থক? মানবতার বা সাম্রাজ্যের কোনো উপকারে লাগাতে পেরেছি কি তাকে?

হয়তো তার বিচার আমার করার কথা নয়, কিন্তু তবু কয়েকটা ব্যাপারে আমার ন্যায্য দাবীর কথা পেশ করবো।

টেস্ট ক্রিকেটে যোগদানের মাত্র চার বছর পর থেকেই ক্রিকেট খেলার এক সঙ্কটমুহূর্ত আসে, যা ছড়িয়ে পড়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বতন পর্যায়েও।

এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিলো না। কিন্তু উনিশশো ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব বহন করতে গিয়ে আমি দুটো ব্যাপারে অবিরাম পরিশ্রম করেছি :

(ক) খেলার মান একটা সুস্থ পর্যায়ে পৌঁছবার প্রচেষ্টা

(খ) ক্রিকেটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

সাফল্যলাভ করেছি কি না, জানি না—তবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে আসীন এমন একটা দলের নেতৃত্ব থেকে অবসর নিতে পেরেছি।

দ্বিতীয় প্রয়াস সম্পর্কে আটচল্লিশ সালে ব্রিটেনের রাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি: 'সদিচ্ছা সৃষ্টির প্রচেষ্টা এর আগে কোনো দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।'

অবসরগ্রহণকালে 'ক্যানবেরা টাইমস' লিখলেন:

"লক্ষ কণ্ঠের হর্ষধ্বনি বর্ষিত হয়েছে ব্র্যাডম্যানের খেলায়, কিন্তু তার কোনোটাই বলপ্রয়োগের বা শত্রুতাপ্রসূত নয়। তুলনায় এ স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের একমাত্র উপমা মেলে হিটলারের। কিন্তু সে মানুষ জোর করে অভিনন্দন কুড়োতে চেয়েছেন তাই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো না তাঁর নাম।

কিন্তু ব্র্যাডম্যানের খেলাতে আনন্দ পেয়েছেন আবালবৃদ্ধবনিতা।

অজাতশত্রু হয়ে রইলেন ব্র্যাডম্যান।

ক্রিকেটের এই তো একটা বিরাট সাফল্য।"

আমার জন্মের বহু পূর্ব থেকেই ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, আমার মৃত্যুর পরেও যুগ যুগ ধরে চলবে খেলা। আমি আমার খেলার মধ্যে দিয়ে খেলার চরিত্র ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, যেমন পিয়ানো-বাদকেরা করেছেন বিঠোফেনের সঙ্গীতকে পৌঁছে দিতে সর্বব্যাপী করে।

আজ সারা বিশ্ব জুড়ে সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার পালা চলেছে।

যাঁরা ভবিষ্যতে আমাদের দিগ্‌দর্শক হবেন তাঁদের হতে হবে সতর্ক, দূরদ্রষ্টা।

ক্রিকেটের আইন আর খেলার পরিচালন পদ্ধতি নিঃসন্দেহে বিশ্বের কাছে এক বিরাট দৃষ্টান্ত। এর ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বস্তু এবং আমার বিশ্বাস, মানুষের শান্তি ও স্বস্তির পথপ্রদর্শকরূপে চিহ্নিত হবে সর্বকালের জন্যে।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট

স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের রানসংখ্যা

অস্ট্রেলিয়ায়

মরসুম	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	রান	গড়	সেঞ্চুরী
১৯২৭-২৮	১০	১	১৩৪	৪১৬	৪৬·২২	২
১৯২৮-২৯	২৪	৬	৩৪০*	১৬৯০(ক)	৯৩·৮৮	৭
১৯২৯-৩০	১৬	২	৪৫২*	১৫৮৬	১১৩·২৮	৫
১৯৩০-৩১	১৮	—	২৫৮	১৪২২	৭৯·০০	৫
১৯৩১-৩২	১৩	১	২৯৯*	১৪০৩	১১৬·৯১	৭
১৯৩২-৩৩	২১	২	২৩৮	১১৭১	৬১·৬৩	৩
১৯৩৩-৩৪	১১	২	২৫৩	১১৯২	১৩২·৪৪	৫
১৯৩৪-৩৫	খেলি নি।					
১৯৩৫-৩৬	৯	—	৩৬৯	১১৭৩	১৩০·৩৩	৪
১৯৩৬-৩৭	১৯	১	২৭০	১৫৫২	৮৬·২২	৬
১৯৩৭-৩৮	১৮	২	২৪৬	১৪৩৭	৮৯·৮১	৭
১৯৩৮-৩৯	৭	১	২২৫	৯১৯	১৫৩·১৬	৬
১৯৩৯-৪০	১৫	৩	২৬৭	১৪৭৫	১২২·৯১	৫
১৯৪০-৪১	৪	—	১২	১৮	৪·৫০	০
১৯৪৫-৪৬	৩	১	১১২	২৩২	১১৬·০০	১
১৯৪৬-৪৭	১৪	১	২৩৪	১০৩২	৭৯·৩৮	৪
১৯৪৭-৪৮	১২	২	২০১	১২৯৬	১২৯·৬০	৮(খ)
১৯৪৮-৪৯	৪	—	১২৩	২১৬	৫৪·০০	১

ইংল্যাণ্ডে

মরসুম	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	রান	গড়	সেঞ্চুরী
১৯৩০	৩৬	৬	৩৩৪	২৯৬০(গ)	৯৮·৬৬	১০
১৯৩৪	২৭	৩	৩০৪	২০২০	৮৪·১৬	৭
১৯৩৮	২৬	৫	২৭৮	২৪২৯	১১৫·৬৬	১৩(ঘ)
১৯৪৮	৩১	৪	১৮৭	২৪২৮	৮৯·৯২	১১
মোট	৩৩৮	৪৩	৪৫২*	২৮,০৬৭	৯৫·১৪	১১৭

১৬৯০(ক) অস্ট্রেলীয় মরসুমে রেকর্ড গড়।

৮(খ) অস্ট্রেলীয় মরসুমে সেঞ্চুরীর সংখ্যা।

২৯৬০(গ) ইংল্যাণ্ডে অস্ট্রেলীয় গড়।

১৩(ঘ) ইংরেজ মরসুমে অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড়ের গড়

টেস্ট ক্রিকেট

বিপক্ষ	ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ রান	রান	গড়	সেঞ্চুরী
ইংল্যাণ্ড	৬৩	৭	৩৩৪	৫০২৮	৮৯.৭৮	১৯
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬	—	২২৩	৪৪৭	৭৪.৫০	২
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫	১	২৯৯*	৮০৬	২০১.৫০	৪
ভারত	৬	২	২০১	৭১৫	১৭৮.৭৫	৪
মোট	৮০	১০	৩৩৪	৬৯৯৬	৯৯.৯৪	২৯

ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড : পরিসংখ্যান

	ইনিংস	নট আউটের সংখ্যা	সর্বোচ্চ স্কোর	সমষ্টি	গড়
সব খেলাগুলো মিলিয়ে	৬৬৯	১০৭	৪৫২*	৫০,৭৩১	৯০.২৭
সমস্ত প্রথম শ্রেণীর খেলা	৩৩৮	৪৩	৪৫২*	২৮,০৬৭	৯৫.১
সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলা	৩৩১	৬৪	৩২০*	২২,৬৬৪	৮৪.৮
সমস্ত টেস্ট মিলিয়ে	৮০	১০	৩৩৪	৬,৯৯৬	৯৯.৯
টেস্ট বনাম ইংল্যাণ্ড	৬৩	৭	৩৩৪	৫,০২৮	৮৯.৭৮
শেফিল্ড শীল্ডের খেলাগুলো	৯৬	১৫	৪৫২*	৮,৯২৬	১১০.১৯
শ্রেণীভুক্ত ক্রিকেট	৯৩	১৭	৩০৩	৬,৫৯৮	৮৬.৮

সেঞ্চুরীর সংখ্যা

সব খেলাগুলো মিলিয়ে	···	২১১
প্রথম শ্রেণীর খেলা	···	১১৭
টেস্ট খেলা	···	২৯
টেস্ট বনাম ইংল্যাণ্ড	···	১৯
শেফিল্ড শীল্ডের খেলা	···	৩৬
শ্রেণীভুক্ত খেলা	···	২৮

২১১টি সেঞ্চুরীর মধ্যে ডবল সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৪১, তিনশো রানের ওপর হয়েছে আটটায়, আর চারশো ছাড়িয়েছে একটাতে।

আউট হওয়ার হিসেব

ইনিংসের সংখ্যা	···	৬৬৯
কট	···	৩৪০
বোল্ড	···	১৪৮
নট আউট	···	১০৭
এল. বি. ডব্লিউ.	···	৩৭
স্টাম্পড্ আউট	···	২২
রান আউট	···	১৪
হিট উইকেট	···	১

ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড : মরসুমে মরসুমে

১৯২৭-২৮ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক উইলিয়াম ব স্কট	১১৮	ব গ্রিমেট	৩৩
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ভিক্টোরিয়া	এল. বি. ডব্লিউ. ব হার্টকফ্‌	৩১	ব ব্ল্যাকি	৫
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ব গফ	০	ক ও'কোনর ব নাথলিং	১৩
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক ও ব ম্যাক্‌কে	২	স্টাম্পড হ্যাক ব গ্রিমেট	৭৩
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ভিক্টোরিয়া	স্টাম্পড এলিস ব ব্ল্যাকি	৭	নট আউট	১৩৪

১৯২৮-২৯ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	এম. সি. সি.	ব ফ্রিম্যান	৮৭	নট আউট	১৩২
অস্ট্রেলিয়া একাদশ	ব	এম. সি. সি.	নট আউট	৫৮	এল. বি. ডব্লিউ. ব টেট	১৮
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	এল. বি. ডব্লিউ. ব টেট	১৮	ক চ্যাপম্যান ব হোয়াইট	১
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ব হ্যামণ্ড	৭৯	ক ডাকওয়ার্থ ব গিয়ারী	১১২
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ক লারউড ব টেট	৪০	রান আউট	৫৮
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ক টেট ব গিয়ারী	১২৩	নট আউট	৩৭
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	এম. সি. সি.	ক টিল্‌ ডেসলে ব হোয়াইট	১৫		
নির্বাচিত একাদশ	ব	অস্ট্রেলিয়া	ক ওল্ডফিল্ড ব গ্রিমেট	১৪	ব অক্সেনহ্যাম	৫
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ক ও'কোনর ব থারলো	১৩১	নট আউট	১৩৩

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ব হেন্ড্রী		নট আউট	৭১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক গ্রিমেট ব ওয়াল	৫	ব ওয়াল	২
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	নট আউট	৩৪০		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক ওয়াকাব ব গ্রিমেট	৩৫	ক ওয়াকার ব কার্লটন	১৭৫

১৯২৯-৩০ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব এম. সি. সি.	ব ওয়ার্দিংটন	১৫৭		
নির্বাচনী খেলা	ক জ্যাকসন ব অক্সেনহ্যাম	১২৪	এল. বি. ডব্লিউ. ব গ্রিমেট	২২৫
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব কুইন্সল্যাণ্ড	রান আউট	৪৮	ক ও'কোনর ব ব্রিউ	৬৬
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিষা	রান আউট	২	এল. বি. ডব্লিউ. ব গ্রিমেট	৮৪
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ব অ্যালেকজাণ্ডার	৮৯	নট আউট	২৬
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক লীসন ব হারউড	৩	নট আউট	৪৫২
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক রিচার্ডসন ব হুইটফিল্ড	৪৭		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ক এলিস ব আইরনমঙ্গার	৭৭		
১৯৩০-এর অস্ট্রেলীয় একাদশ ব টাসমানিয়া	এল. বি, ডব্লিউ. ব ন্যাশ	২০		
ঐ — ঐ	ক রাশফোর্থ ব অ্যাটকিনসন	১৩৯		
ঐ — পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	ক আর. ব্রায়াণ্ট ব ইভান্স	২৭		

১৯৩০ (ইংল্যাণ্ডে)

খেলা		প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলীয় দল	ব ওরস্টার	ক ওয়ালটার্স ব ব্রুক	২৩৬		
অস্ট্রেলীয় দল	ব লিস্টার	নট আউট	১৮৫		
অস্ট্রেলীয় দল	ব ইয়র্কশায়ার	ক ও ব মেকলে	৭৮		
অস্ট্রেলীয় দল	ব ল্যাঙ্কাশায়ার	ব ম্যাকডোনাল্ড	৯	নট আউট	৪৮
অস্ট্রেলীয় দল	ব এম. সি. সি.	ব অ্যালোম	৬৬	এল. বি. ডব্লিউ. ব স্টিভেন্স	৪
অস্ট্রেলীয় দল	ব ডার্বি	ক ইলিয়ট ব ওয়ার্দিংটন	৪৪		
অস্ট্রেলীয় দল	ব সারে	নট আউট	২৫২		
অস্ট্রেলীয় দল	ব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	ব গার্লাণ্ড-ওয়েলস	৩২		
অস্ট্রেলীয় দল	ব হ্যাম্পশায়ার	ক মিড ব বয়েস	১৯১		
অস্ট্রেলীয় দল	ব মিডলসেক্স	ব হার্নে	৩৫	ব স্টিভেন্স	১৮
অস্ট্রেলীয় দল	ব কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়	ক বারনেস ব হিউম্যান	৩২		
অস্ট্রেলিয়া	ব ইংল্যাণ্ড	ব টেট	৮	ব রোবিন্স	১৩১
অস্ট্রেলীয় দল	ব সারে	ক অ্যালোম ব শেফার্ড	৫		
অস্ট্রেলীয় দল	ব ল্যাঙ্কাশায়ার	ক ডাকওয়ার্থ ব সিব্‌লস	৩৮	নট আউট	২৩
অস্ট্রেলিয়া	ব ইংল্যাণ্ড	ক চ্যাপম্যান ব হোয়াইট	২৫৪	ক চ্যাপম্যান ব টেট	১
অস্ট্রেলীয় দল	ব ইয়র্কশায়ার	এল. বি. ডব্লিউ. ব রোবিন্‌সন	১		
অস্ট্রেলিয়া	ব ইংল্যাণ্ড	ক ডাকওয়ার্থ ব টেট	৩৩৪		

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ক দলীপসিংজী ব পিব্‌ল্‌স	১৪		
অস্ট্রেলীয় দল	ব	সামারসেট	ক ও ব ইয়াং	১১৭		
অস্ট্রেলীয় দল	ব	গ্ল্যামারগ্যান	ব রায়ান	৫৮	নট আউট	১৯
অস্ট্রেলীয় দল	ব	নর্দাণ্টস্‌	ব জাপ	২২	ক হটন ব কক্স	৩৫
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ক ডাকওয়ার্থ ব লারউড	২৩২		
অস্ট্রেলীয় দল	ব	গ্লস্টার	ক সিনফিল্ড ব পার্কার	৪২	ব পার্কার	১৪
অস্ট্রেলীয় দল	ব	কেন্ট	এল. বি. ডব্লিউ. ব ফ্রিম্যান	১৮	নট আউট	১০৫
অস্ট্রেলীয় দল	ব	ইংল্যাণ্ড একাদশ	এল. বি. ডব্লিউ. ব অ্যালোম	৬৩		
অস্ট্রেলীয় দল	ব	লিভেসন-গাওয়ারের একাদশ	ব পার্কার	৯৬		

১৯৩০-৩১ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান্স	ক ব্যারো ব ফ্র্যানসিস	৭৩	ক হেডলে ব মার্টিন	২২
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান্স	ব কন্‌স্ট্যানটাইন	১০	এল. বি. ডব্লিউ. ব গ্রিফিথ	৭৩
অস্ট্রেলিয়া	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ক গ্রাণ্ট ব গ্রিফিথ	৪		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ক ব্যারো ব ফ্র্যানসিস	২৫		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ক গ্রাণ্ট ব কন্‌স্ট্যানটাইন	২২৩		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ক রোচ্‌ ব মার্টিন	১৫২		

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলিয়া	ব	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	ক ফ্র্যানসিস ব মার্টিন	৪৩	ব গ্রিফিথ	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক প্রিচার্ড ব ডেভারসন	৬১	ক ওয়েইট ব ডেভারসন	১২১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব রিচার্ডসন	২৫৮		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ভিক্টোরিয়া	ক হেণ্ড্রী ব অ্যা'বেকেট	২		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ভিক্টোরিয়া	স্ট বারনেট ব অ্যালেকজাণ্ডার	৩৩	ক রিগ ব আইরনমঙ্গার	২২০
উডফুলের একাদশ	ব	রাইডারের একাদশ	ব মেইলি	৭৩	ক ও ব মেইলি	২৯

১৯৩১-৩২ (অস্ট্রেলিয়ায়)

নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ আফ্রিকার দল	ক ও ব ম্যাকমিলান	৩০	ক বেল ব মর্কেল	১৩৫
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ আফ্রিকার দল	ক কারনো ব ম্যাকমিলান	২১৯		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ক ওয়াটারম্যান ব গিলবার্ট	০		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	ভিক্টোরিয়া	ক স্মিথ ব আইরনমঙ্গার	২৩	ব স্মাগেল	১৬৭
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব	দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব কার্লটন	২৩	ব ওয়াল	
অস্ট্রেলিয়া	ব	দক্ষিণ আফ্রিকা	এল. বি. ডব্লিউ. ব ভিনসেন্ট	২২৬		
অস্ট্রেলিয়া	ব	দক্ষিণ আফ্রিকা	ক ভিলজয়েন ব মর্কেল	১১২		
অস্ট্রেলিয়া	ব	দক্ষিণ আফ্রিকা	ক ক্যামেরন ব কুইন	২	এল. বি. ডব্লিউ. ব ভিনসেন্ট	১৬৭
অস্ট্রেলিয়া	ব	দক্ষিণ আফ্রিকা	নট আউট	২৯৯		

১৯৩২-৩৩ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
সম্মিলিত একাদশ ব এম. সি. সি.	ক হ্যামণ্ড ব ভেরিটি	৩	ক পতাউদি ব অ্যালেন	১০
অস্ট্রেলীয় একাদশ ব এম. সি. সি.	এল. বি. ডব্লিউ. ব লারউড	৩৬	ব লারউড	১৩
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব এম. সি. সি.	এল. বি. ডব্লিউ. ব টেট	১৮	ব ভোসে	২৩
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব বাওয়েস	০	নট আউট	১০৩
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক অ্যালেন ব লারউড	৮	ক ও ব ভেরিটি	৬৬
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব লারউড	৭৬	ক মিচেল ব লারউড	২৪
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব লারউড	৪৮	ব ভেরিটি	৭১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব এম. সি. সি.	ব মিচেল	১	ক এম্‌স্‌ ব হ্যামণ্ড	৬১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ক ও'ব্রায়েন ব ফ্লিটউড-স্মিথ	২৩৮	নট আউট	৫২
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ক ব্রমলে ব আইরনমঙ্গার	১৫৭		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ক রায়ান ব ওয়াল	৫৬	ব লি	৯৭

১৯৩৩-৩৪ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক অ্যাণ্ডরুজ ব লেভি	২০০		
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব কলিন্স	১	স্টাম্পড ওয়াকার ব গ্রিমেট	৭৬
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	নট আউট	১৮৭	নট আউট	৭৭
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব কুইন্সল্যাণ্ড	ব ব্রিউ	২৫৩		

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব ভিক্টোরিয়া	ক ডারলিং ব ক্লিটউড-স্মিথ	১২৮		
প্রদর্শনী খেলা	ক উডফুল ব ওয়াল	৫৫	ক ডারলিং ব ব্ল্যাকি	১০১
নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ব অবশিষ্ট দল	ক ওয়াকার ব শিলভারস	২২	ব এবলিং	৯২

১৯৩৪ (ইংল্যাণ্ডে)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলীয় দল ব ওরস্টার	, হাওয়ার্থ	২০৬		
অস্ট্রেলীয় দল ব লিস্টার	ব গিয়ারী	৬৫		
অস্ট্রেলীয় দল ব কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়	ব ডেভিস	০		
অস্ট্রেলীয় দল ব এম. সি. সি.	ক ও ব ব্রাউন	৫		
অস্ট্রেলীয় দল ব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	এল. বি. ডব্লিউ. ব ডাইসন	৩৭		
অস্ট্রেলীয় দল ব হ্যাম্পশায়ার	ক মিড ব ব্যাক্সিং	০		
অস্ট্রেলীয় দল ব মিডলসেক্স	ক হাম ব পিব্‌লস্‌	১৬০		
অস্ট্রেলীয় দল ব সারে	ক স্কোয়ারস ব গাভার	৭৭		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক হ্যামণ্ড ব গিয়ারী	২৯	ক এম্‌স্‌ ব ফারনেস	২৫
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক ও ব ভেরিটি	৩৬	ক এম্‌স্‌ ব ভেরি	১৩
অস্ট্রেলীয় দল ব নর্দাণ্টস	ক বেকওয়েল ব ম্যাথিউস	৬৫	ব ম্যাথিউস	২৫
অস্ট্রেলীয় দল ব সামারসেট	ক লুকস ব হোয়াইট	১৭		
অস্ট্রেলীয় দল ব সারে	ক ব্রুকস ব হোমস	২৭	নট আ	৬১

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক এম্‌স্ ব হ্যামণ্ড	৩০		
অস্ট্রেলীয় দল ব ডার্বি	ক ইলিয়ট ব টাউন্সএণ্ড	৭১	নট আউট	৬
অস্ট্রেলীয় দল ব ইয়র্কশায়ার	ব লেল্যাণ্ড	১৪০		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব বাওয়েস	৩০৪		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক এম্‌স্ ব বাওয়েস	২৪৪	ব বাওয়েস	৭৭
অস্ট্রেলীয় দল ব এসেক্স	ব পিয়ারস	১৯		
অস্ট্রেলীয় দল ব ইংল্যাণ্ড একাদশ	নট আউট	১৪৯		
অস্ট্রেলীয় দল ব লিভেসন-গাওয়ারের একাদশ	স্টাম্পড ডাকওয়ার্থ ব ভেরিটি	১৩২		
	১৯৩৫-৩৬ (অস্ট্রেলিয়ায়)			
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব এম. সি. সি.	এল. বি. ডব্লিউ. ব সিম্‌স্	১৫	এল. বি. ডব্লিউ. ব পার্কস	৫০
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ক ও ব রোবিনসন	১১৭		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক ট্যালন ব লেভি	২৩৩		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক কুইন ব ব্রম্‌লে	৩৫৭		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক উইয়েথ ব গিলবার্ট	৩১		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ক লিট্‌ল্ ব হাইনেস	০		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব টাসমানিয়া	ক ও ব টাউন্‌লে	৩৬৯		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক লেডওয়ার্ড ব এবলিং	১		

১৯৩৬-৩৭ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলীয় দল ব এম. সি. সি.	ব ওয়ার্দিংটন	৬৩		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক ওয়ার্দিংটন ব ভোসে	৩৮	ক ফ্যাগ ব অ্যালেন	
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক অ্যালেন ব ভোসে	০	ব ভেরিটি	৮২
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক রোবিন্‌স ব ভেরিটি	১৩	ক অ্যালেন ব ভেরিটি	২৭০
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব এম. সি. সি.	ক এম্‌স্‌ ব বারনেট	৩৮		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব অ্যালেন	২৬	ক ও ব হ্যামণ্ড	২১২
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব ফারনেস	১৬৯		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক ও'ব্রায়েন ব গ্রেগারী	১৯২		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	স্টাম্পড ট্যালন ব উইয়েথ	১২৩		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	এল. বি. ডব্লিউ. ব ও'রিলী	২৪	নট আউট	৩৮
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক এবলিং ব ফ্লিটউড-স্মিথ	৩১	ক হ্যাসেট ব ম্যাককরমিক	৮
প্রদর্শনী খেলা	ক ও'রিলী ব গ্রিমেট	২১২	ক ফিংল্টন ব গ্রিমেট	১৩

১৯৩৭-৩৮ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ক ও'ব্রায়েন ব ও'রিলী	৯১	ক চিপারফিল্ড ব ও'রিলী	৬২
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক বেকার ব ডিক্সন	২৪৬	নট আউট	৩৯
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক সিভার্স ব গ্রেগারী	৫৪	ক সিভার্স ব গ্রেগারী	৩৫

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক ট্যালন ব ডিক্সন	১০৭	ক হ্যাকেট ব অ্যালেন	১১৩
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ক ম্যাকক্যাবে ব ও'ব্রায়েন	৪৪	নট আউট	১০৪
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ব ম্যাককরমিক	৩	ক লেডওয়ার্ড ব থর্ন	৮৫
প্রদর্শনী খেলা	ব গ্রিমেট	১৭		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	ক উইলবারফোর্স ব আয়াস	১০১		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউজিল্যাণ্ডের দল	ক টিনডিল ব কাউরি	১১		
১৯৩৮-এর অস্ট্রেলীয় একাদশ ব টাসমানিয়া	ক স্তাঙ্কি ব টমাস	৭৯		
১৯৩৮-এর অস্ট্রেলীয় একাদশ ব টাসমানিয়া	ব জেক্রে	১৪৪		
১৯৩৮-এর অস্ট্রেলীয় একাদশ ব পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	স্টাম্পড লাভলক ব জিম্বুলিস	১০২		

১৯৩৮ (ইংল্যাণ্ডে)

খেলা	প্রথম ইনিংস	
অস্ট্রেলীয় দল ব ওরস্টার	ক মার্টিন ব হাওয়ার্থ	২৫৮
অস্ট্রেলীয় দল ব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়	এল. বি. ডব্লিউ. ব ইভান্স	৫৮
অস্ট্রেলীয় দল ব কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়	ক ম্যান ব ওয়াইল্ড	১৩৭
অস্ট্রেলীয় দল ব এম. সি. সি.	ক রোবিন্স ব স্মিথ	২৭৮
অস্ট্রেলীয় দল ব নর্দাণ্টস	ক জেমস্ ব পার্টরিজ	২
অস্ট্রেলীয় দল ব সারে	ক ব্রুকস ব ওয়াট্‌স্	১৪৩
অস্ট্রেলীয় দল ব হ্যাম্পশায়ার	নট আউট	১৪৫

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলীয় দল ব মিডলসেক্স	ক কম্পটন ব নেভেল	৫	নট আউট	৩০
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ক এম্‌স্ ব সিনফিল্ড	৫১	নট আউট	১৪৪
অস্ট্রেলীয় দল ব বিশিষ্ট দল	ক ভ্যালেন্টাইন ব মায়ার	১০৪		
অস্ট্রেলীয় দল ব ল্যাঙ্কাশায়ার	ক পোলার্ড ব ফিলিপ্সন	১২	নট আউট	১০১
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব ভেরিটি	১৮	নট আউট	১০২
অস্ট্রেলীয় দল ব ইয়র্কশায়ার	স্টাম্পড উড ব স্মেইলস	৫৯	ক বারবার ব স্মেইলস	৪২
অস্ট্রেলীয় দল ব ওয়ারউইকশায়ার	ক উইলমট ব মায়ার	১৩৫		
অস্ট্রেলীয় দল ব নটিংহ্যাম	এল. বি. ডব্লিউ. ব জেপসন	৫৬	ক জেপসন ব মার্শাল	১৪৪
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব বাওয়েস	১০৩	ক ভেরিটি ব রাইট	১৬
অস্ট্রেলীয় দল ব সামারসেট	ব এণ্ডরুজ	২০২		
অস্ট্রেলীয় দল ব গ্ল্যামারগ্যান	স্টাম্পড এইচ. ডেভিস ব ক্লে	১৭		
অস্ট্রেলীয় দল ব কেন্ট	ক টড ব ওয়াট	৬৭		

১৯৩৮-৩৯ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা	প্রথম ইনিংস	
এম. সি. সি. শতবার্ষিকী খেলা	ব ন্যাগেল	১১৮
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ব মার্ফি	১৪৩
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক বেকার ব ক্রাইস্ট	২২৫
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক হ্যাসেট ব সিভার্স	১০৭
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব কুইন্সল্যাণ্ড	ক ক্রাইস্ট ব ট্যালন	১৮৬
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব নিউ সাউথ ওয়েলস	নট আউট	১৩৫
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ক ফ্লিটউড-স্মিথ ব থর্ন	৫

১৯৩৯-৪০ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভিক্টোরিয়া	রান আউট	৭৬	এল. বি. ডব্লিউ. ব ব্লিং	[illegible]
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	নট আউট	২৫১	নট আউট	[illegible]
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ক হ্যানসেন ব এলিস	১৩৮		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভিক্টোরিয়া	ক জনসন ব ফ্লিটউড-স্মিথ	২৬৭		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ক ডিক্সন ব স্ট্যাকপুল	০	ক ট্যালন ব কুক	৯৭
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	এল. বি. ডব্লিউ. ব ও'রিলী	৩৯	ক পরিবর্ত ব পেপার	৪০
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	ক লাভলক ব ম্যাকগিল	৪২	নট আউট	২০৯
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	ক জিম্বুলিস ব আয়ার্স	১৩৫		
অবশিষ্ট অস্ট্রেলীয় দল	ব	নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	ক স্যাগার্স ব ও'রিলী	২৫	ক ম্যাককুল ব চিথাম	২

১৯৪০-৪১ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভিক্টোরিয়া	ক সিভার্স ব ডাডলে	০	ব সিভার্স	৬
প্রতিরক্ষা সাহায্যার্থে খেলা			ক ট্যাম্বলিন ব এলিস	০	ব ও'রিলী	১২

১৯৪৫-৪৬ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	কুইন্সল্যাণ্ড	ক ট্যালন ব ম্যাককুল	৬৮	নট আউট	৫২
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ফৌজী দল	ক কারমোডী ব উইলিয়ামস্‌	১১২		

১৯৪৬-৪৭ (অস্ট্রেলিয়ায় .

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	এম. সি. সি.	ক ও ব স্মিথ	৭৬	ক এডরিচ ব পোলার্ড	৩
অস্ট্রেলীয় একাদশ	ব	এম. সি. সি.	ক পোলার্ড ব কম্পটন	১০৬		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভিক্টোরিয়া	স্টাম্পড বেকার ব জনসন	৪৩	স্টাম্পড বেকার ব ট্রাইব	১১৯
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ব এডরিচ	১৮৭		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	এল. বি. ডব্লিউ. ব ইয়ার্ডলে	২৩৪		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ব ইয়ার্ডলে	৭৯	ক ও ব ইয়ার্ডলে	৪৯
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ব বেডসার	০	নট আউট	৫৬
অস্ট্রেলিয়া	ব	ইংল্যাণ্ড	ব রাইট	১২	ক কম্পটন ব বেডসার	৬৩
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	এম. সি. সি.	ক ল্যাংরিজ ব রাইট	৫		

১৯৪৭-৪৮ (অস্ট্রেলিয়ায়)

খেলা			প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভারতীয় দল	ক সারবাতে ব মাঁকড়	১৫৬	স্টাম্পড সেন ব মাঁকড়	১২
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া	ব	ভিক্টোরিয়া	এল. বি. ডব্লিউ. ব জনসন	১০০		
অস্ট্রেলীয় একাদশ	ব	ভারতীয় দল	ক অমরনাথ ব হাজারে	১৭২	ক সারবাতে ব মাঁকড়	৩৬
অস্ট্রেলিয়া	ব	ভারত	হিট উইকেট ব অমরনাথ	১৮৫		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ভারত	ব হাজারে	১৩		
অস্ট্রেলিয়া	ব	ভারত	এল. বি. ডব্লিউ. ব ফাদকার	১৩২	নট আউট	১২৭

খেল		প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলিয়া	ব ভারত	ব হাজারে	২০১		
অস্ট্রেলিয়া	ব ভারত	আহতাবস্থায় অবসর গ্রহণ	৫৭		
উনিশশো আটচল্লিশের অস্ট্রেলীয় একাদশ	ব পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া	ক আউটব্রিজ ব ও'ডোয়াইয়ার	১১৫		

১৯৪৮ (ইংল্যাণ্ডে)

অস্ট্রেলীয় দল	ব ওরস্টার	ব জ্যাকসন	১০৭		
অস্ট্রেলীয় দল	ব লিস্টার	ক কয়াল ব এদারিংটন	৮১		
অস্ট্রেলীয় দল	ব সারে	ব বেডসার	১৪৬		
অস্ট্রেলীয় দল	ব এসেক্স	ব স্মিথ	১৮৭		
অস্ট্রেলীয় দল	ব এম. সি. সি.	ক এডরিচ ব ডেইটন	৯৮		
অস্ট্রেলীয় দল	ব ল্যাঙ্কাশায়ার	ব হিলটন	১১	স্টাম্পড এডরিচ ব হিলটন	৪৩
অস্ট্রেলীয় দল	ব নটিংহ্যাম	ব উডহেড	৮৬		
অস্ট্রেলীয় দল	ব সাসেক্স	ব কর্নফোর্ড	১০৯		
অস্ট্রেলিয়া	ব ইংল্যাণ্ড	ক হাটন ব বেডসার	১৩৮	ক হাটন ব বেডসার	
অস্ট্রেলীয় দল	ব ইয়র্কশায়ার	ক ইয়ার্ডলে ব ওয়ার্ডল্	৫৪	ক হাটন ব অ্যাসপিন্তাল	৮৬
অস্ট্রেলিয়া	ব ইংল্যাণ্ড	ক হাটন ব বেডসার	৩৮	ক এডরিচ ব বেডসার	৮৯
অস্ট্রেলীয় দল	ব সারে	ক বার্টন ব স্কোয়ার্স	১২৮		

খেলা	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	এল. বি. ডব্লিউ ব পোলার্ড	৭	নট আউট	৩০
অস্ট্রেলীয় দল ব মিডলসেক্স	ক কম্পটন ব হুইটকোম্ব	৬		
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব পোলার্ড	৩৩	নট আউট	১৭৩
অস্ট্রেলীয় দল ব ডার্বি	ব গথার্ড	৬২		
অস্ট্রেলীয় দল ব ওয়ারউইকশায়ার	ব হলিস	৩১	নট আউট	১৩
অস্ট্রেলীয় দল ব ল্যাঙ্কাশায়ার	ক উইলসন ব রবার্টস	২৮	নট আউট	১৩৩
অস্ট্রেলিয়া ব ইংল্যাণ্ড	ব হলিস	০		
অস্ট্রেলীয় দল ব কেন্ট	ক ভ্যালেণ্টাইন ব ক্রাশ	৬৫		
অস্ট্রেলীয় দল ব বিশিষ্ট দল	ক ডনেলি ব ব্রাউন	১৫০		
অস্ট্রেলীয় দল ব দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড	ক ম্যান ব বেইলি	১৪৩		
অস্ট্রেলীয় দল ব লিভেসন-গাওয়ারের একাদশ	ক হাটন ব বেডসার	১৫৩		

১৯৪৮–৪৯ (অস্ট্রেলিয়ায়)

ব্র্যাডম্যান-প্রদর্শনী	ক হার্ভে ব ডুল্যাণ্ড	১২৩	ক স্যাগার্স ব জনস্টন	১০
উডফিল্ড-কিপাক্স প্রদর্শনী	ক মিউলম্যান ব মিলার	৫৩		
দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ব ভিক্টোরিয়া	ব জনস্টন	৩০		

ব্যাটসম্যানের আউট হবার বিভিন্ন প্রকার

বোল্ড	৭৮	বার
ফিল্ডসম্যানের দ্বারা ক্যাচ	১২১	„
কট অ্যাণ্ড বোল্ড	১২	„
উইকেটরক্ষকের দ্বারা আউট	৪০	„
স্টাম্পড আউট	১২	„
রান আউট	৪	„
এল. বি. ডব্লিউ.	২৭	„
হিট উইকেট	১	„
নট আউট	৪৩	„
	৩৩৮	